নানা রঙের দিন

নানা রঙের দিন

সন্তোষকুমার ঘোষ

ক্যালকাটা বুক ক্লাব লিমিটেড

প্রকাশক :
নির্মলকুমার সরকার
ক্যালকাটা বুক ক্লাব লিমিটেড
৮৯, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৭

মুদ্রাকর :
জিতেন্দ্রনাথ বসু
দি প্রিণ্ট ইণ্ডিয়া
৩।১, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪

প্রচ্ছদপট :
মণীন্দ্র মিত্র

ব্লক ও মুদ্রণ :
ফোটোটাইপ সিণ্ডিকেট
১০, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

দাম চার টাকা

স্বধর্মী

নরেন্দ্রনাথ মিত্রকে

'নানা রঙের দিন' মুখ্যত একটি পরিবারের কাহিনী। ঘটনাকাল এই শতকের শেষকুড়ি ও শুরুতিরিশের কয়েক বছর অর্থাৎ জাতীয় আন্দোলনের মধ্যাহ্ন। পরে এই আন্দোলন বিস্তৃততর হয়েছে, আপাত-সফল হয়েছে, আবার অন্যরূপে প্রবেশ করেছে জনজীবনের গভীরে কিন্তু এ-উপন্যাসে সে-অধ্যায় সংযোজনের পরিসর ছিল না।

একটি অবোধ, অর্ধবোধ কিশোরমানসে সমসাময়িক জটিল ঘটনা রাজনৈতিক, পারিবারিক, সামাজিক যে ছাপ রাখে, সেইটুকুকে আশ্রয় করে এই গল্প গড়ে উঠেছে। সর্বত্র এই দৃষ্টিকোণ ঠিক রাখা সম্ভব হয়নি, তবু মূল সুরটি ঠিকই আছে, এবং সেটা প্রধানত হৃদয়াবেগের।

'নানা রঙের দিন' লিখতে শুরু করি বছর পাঁচেক আগে। অধুনালুপ্ত 'কালান্তর' পত্রিকা সম্পাদকের তাড়ায়। শেষ হল প্রকাশকের তাড়নায়। এতদিন পরে লিখতে গিয়ে দেখি অনেক চরিত্র স্পষ্ট মনে নেই, ঘটনার খেই কোথাও কোথাও হারিয়ে গেছে। কিছু কিছু অসঙ্গতিও হয়ত আছে, বিশেষ সাল তারিখের; সে জন্যে লজ্জিত।

দিল্লী
মহালয়া ১৩৫৩

সন্তোষকুমার ঘোষ

এক

খুব ছোটবেলা, যখন দিদির হাত ধরে সাণ্ডে স্কুলে যেতো, সেটাকে বলা যায় চেতনার প্রত্যুষ। সব কথা ভাল মনে নেই। কাঁটাতারঘেরা কম্পাউণ্ড, চোরকাঁটাছাওয়া পায়ে-চলা রাস্তার শেষে লাল ইটেগাঁথা টালির ছাতওয়ালা গীর্জা। পাতাবাহারের সারি সুরকিঢালা পথের পাশে, গীর্জার ধারে পাদ্রী সাহেবের কুঠিও মনে পড়ে; রবিবার রবিবার মেমসাহেবের প্রীতিস্নিগ্ধ কণ্ঠের সঙ্গে সুর মিলিয়ে গান করা।

বাংলা কথাগুলো মেমসাহেবের মুখে অদ্ভুত শোনাত। খ্রীষ্টমাহাত্ম্যপূর্ণ গানগুলো, সুরও সব ইংরিজি। গানের শেষে পড়া হত, রাখালরাজা, প্রশ্নোত্তর-মালা, সুসমাচার। 'ঈশ্বর জগৎকে এমন প্রেম করিলেন যে তাঁর একজাত পুত্রকে প্রদান করিলেন।' সবার শেষে প্রার্থনা। ঈশ্বর, তুমি আমাদের গৃহ দিয়েছ, তুমি পরম কারুণিক, আপন পুত্রকে পাঠিয়ে আমাদের পাপের ভার লাঘব করেছ, তোমাকে ধন্যবাদ। আমেন।

প্রার্থনার সময় চোখ বুঁজে থাকার একটা রীতি ছিল, কিন্তু শুভাশীষের সেটা প্রায়ই ভুল হ'ত। বাইরে, ঝাউগাছের চূড়ায়, যখন সকালের মিঠে রোদ লেগেছে, গীর্জের দরজার মাথায় নীল-সবুজ কাঁচের ঝিকিমিকি, তখন একটু চেয়ে নিলে ক্ষতি কী। আমেনের কাছাকাছি এলে তবে শুভাশীষ চোখ বুঁজেছে কেউ টের পায়নি।

প্রার্থনার শেষে গান, যীশু বিনে কেহ নাই এ সংসারে। এ মহা পাপের ভার কে উদ্ধার করে।

সাড়ে স্কুলের পর বাড়ি। ছুটির দিন, পুকুরে নেমে ঘণ্টাখানেক ডুবোনো। কিন্তু দিদির সঙ্গে নাইতে যেতে ভয় করে। শুভাশীষ তখনো সাঁতার শেখেনি। দিদি শিখেছে। শিখেছে বলে ওর যেমন বড়াই তেমনি দুষ্টুমি বুদ্ধি। মাঝে মাঝে করেছে কি, সাঁতার শেখানোর ছুতো করে শুভাশীষকে চুবিয়ে নাজেহাল করেছে। শুভাশীষ যত চেঁচায়, দিদিটা হাসে তত। বাড়ী গিয়ে নালিশ করলে দিদি পর্যাপ্ত মার খায় বটে, কিন্তু তাতে অপমানের প্রতিশোধ হয় না।

দুপুর বেলা মা ওকে কাছে ঘুমুতে ডেকেছেন, দিদি পাড়ার সমবয়সিনীদের সঙ্গে পুতুল খেলছে। সেটা নিছক প্রমীলারাজ্য। শুভাশীষের প্রবেশ ছিল না। শুভাশীষ চুপি চুপি কখন বেরিয়ে পড়েছে পাড়ার আর পাঁচ জন ছেলের সঙ্গে, সারা দুপুর হল্লা করে সন্ধ্যার পর বাড়ী।

সন্ধ্যার পরটা ভারি বিশ্রী লাগত। চারধার অন্ধকার। দূরে দূরে শেয়ালের ডাক। ঝিঁ ঝিঁ পোকার একঘেয়ে কণ্ঠসাধনা সুরু হল। বর্ষাকালে শোনা যেত ব্যাঙের ঐক্যতান। চারদিক কেমন মৃত, স্তিমিত, নিরানন্দ। পড়ার ঘরে নিবু নিবু হারিকেনটার সমুখে বসে ম্রিয়মান গলায় দ্বিতীয় ভাগের পাতায় শানানো 'ফলা' গুলোকে আয়ত্তে আনতে আনতে মনটা অন্যমনস্ক হয়ে যেত। চোখ দুটো কখন জানলা গলে মিশন কমপাউণ্ড পেরিয়ে পৌঁছে যেত পাদ্রী সাহেবের কুঠিতে। সেখানে পেট্রোমাক্স আলো জ্বলছে। জোন্‌স সাহেব, মেমসাহেব, পীটার, মার্গারেট, মেরি। ওরা এখন কী করছে। খাচ্ছে? সাহেবেরা কি রাত্রে খায়? খায় যদি, কী খায়। অদ্ভুত, অসংলগ্ন সব চিন্তা এসেছে মনে।

মাঝে মাঝে চিন্তার সব সূত্র ছিঁড়ে গিয়ে দূরাগত এঞ্জিনের হুইসিল কানে এসেছে। সাড়ে সাতটায় প্যাসেঞ্জার গাড়ীটা এল। কলকাতা থেকে। শুভাশীষদের কেউ আসে না?

আবার দু' লাইন পড়ল। দ্বিতীয় ভাগ ভারি শক্ত ঠেকছে। রান্না ঘরে মাসীমা রাঁধছেন, খাবার ডাক এল বলে। আজ আবার ইলিশমাছ।

এই খোকা ঘুমুচ্ছিস ! চল খাবি।

দাদুর ডাকে ঘুম ভেঙে গেল। এক পাতে বসে দু'জনে খাবে। শুভাশীষ মাছের কাঁটা বেছে খেতে জানে না। দিদিটাও অঙ্ক কষতে কষতে ঘুমিয়েছে। ওর ঘুম সহজে ভাঙে না। খেতে বসে ঢুলবে। ঠিক মার খাবে।

বাড়ীর সামনেই মিশন কম্পাউণ্ড ; নেটিব ক্রিশ্চানদের কলোনি। তারপর কাঁচা রাস্তা ধরে দু'মিনিটের রাস্তা পেরিয়ে হাইস্কুল। সেখানে রাস্তার বাঁক। তারপর রেল লাইনের সমান্তর রাস্তা ধরে মিনিট তিনেক এগিয়ে, রেল ষ্টেসন।

ষ্টেসনটাকে ভারি আশ্চর্য লাগে শুভাশীষের। পাথরবাঁধানো উঁচু প্লাটফর্মটার নীচে জোড়া জোড়া লাইন। ওভার ব্রীজের নীচ দিয়ে এসে দাঁড়ায় হুস হুস গাড়ী। মুহূর্তে কুলির চীৎকারে, যাত্রীর ব্যস্ততায়, গার্ডের নিশান আন্দোলনে ইঞ্জিনের হুইসেল ঝিমিয়ে-পড়া প্লাটফরমটা যেন বেঁচে ওঠে। আবার গাড়ী চলে যেতেই একে একে প্লাটফরমটা খালি হতে সুরু হয়, মাত্র দু' একজন পায়চারি করার জন্যে তখনো থাকে। লাইনগুলোর গতিপথ তেমনি অলস, নিস্তেজ। যারা পান বিড়ি নিয়ে এসেছিল যারা খবরের কাগজ বিক্রি করছিল, তারা মুহূর্তে সব কোথায় মিলিয়ে গেছে।

স্টেশনের যেদিকে শুভাশীষদের বাড়ী তার উল্টো দিকে শহর ; ওদিকে পাকা বাড়ী বেশি। উকিল পাড়া, ডাকঘর, কাচারী, আদালত।

একলা ওদিকে যেতে বারণ। রেললাইন পেরুনো মানা। যদি অবিশ্যি কোন দিন ফুটবল খেলা থাকে তবে পাড়ার চেনা বড়ো কারুর সঙ্গে কাচারীর মাঠে খেলা দেখতে যেতে পারে। দুই ইস্কুলের খেলা হলে আর কথা নেই, ছুটি হতে না হতে ছেলেরা মাঠে গিয়ে জুটবে। যারা ছোট, যারা খেলে না, তারা টীমের জার্সি বইছে, ফুটবল পাম্প করছে, লেবু, বরফ জল ইত্যাদি বিতরণ করছে; গর্ব কত্তো। এদেরি মধ্যে যারা অপেক্ষাকৃত বড়ো তারা লাইনসম্যান হবার জন্যে উমেদারি করছে। বাকি সবার উৎসাহিত চীৎকারে মাঠ মাৎ। শুভাশীষও সেই দলের একজন। সারাক্ষণ উচ্চৈঃস্বরে চেঁচানো। খেলাশেষে, জিতলে পরে আরো কিছুক্ষণ মাতামাতি। হারলে, মাথা নীচু করে বাড়ি ফেরা।

এর পর স্মৃতিটা কতকটা ঝাপসা হয়ে গেছে। দাদুর সঙ্গে বাজারে গিয়ে কবে সেই ম্যাজিক লণ্ঠন দেখেছিল মনে নেই। ষ্টেশনের বাইরে বাজার, বাজারের মধ্যে কালীবাড়ী। সেই কালীবাড়ীতে একদিন সন্ধ্যায় দাদুর সঙ্গে বেড়িয়ে ফেরবার পথে দেখল সাদা একটা পর্দা টাঙানো। শোনা গেল ম্যাজিক লণ্ঠন হবে। ম্যাজিক লণ্ঠন ? সে আবার কী। দেখাই যাক। পর্দার গায়ে আলো পড়েছে। ছড়ি হাতে এক ভদ্রলোক সবাইকে ছবির মর্ম বোঝাচ্ছেন। বিষয় বস্তুটা, এখন শুভাশীষ বুঝতে পারছে, ছিল ভারতের দুর্দশা ও তার কারণ। একটার পর একটা স্লাইড দিয়ে ভদ্রলোক ইংরাজ রাজত্বের গোড়াপত্তনের ইতিহাস ব্যাখ্যা করে শোনাচ্ছিলেন। ঢাকার তাঁতিদের আঙুল কেটে ফেলার ছবি দেখতে দেখতে শুভাশীষের চোখে জল এসেছিল, মনে আছে।

বাড়ী ফেরবার পথে দাদুর কাছে আরো অনেক কথা শোনা গেল। সেই প্রথম শুভাশীষ জানল, মানচিত্রের যে ছবিটাকে ভারতবর্ষ বলে

জেনেছে, সেটা স্বাধীন নয়। প্রভু বহুদূর-দ্বীপবাসী ইংরেজ, আমরা যাদের বলি সাহেব। সব কথা সেই সাত বছর বয়সে বোঝা সম্ভব নয়। যে-টুকু বুঝল তাতেই শুভাশীষের চোখ দুটো জ্বল জ্বল করতে লাগল। স্বদেশী মন্ত্রে সেই প্রথম দীক্ষা।

পরের দিন চুপি চুপি আবার সন্ধ্যার দিকে কালীবাড়ী গিয়েছিল। কিন্তু আগের দিনের সেই ভদ্রলোককে দেখা গেল না। তিনি কে, কোথা থেকে কেন এসেছিলেন, সবটাই একটা রহস্যের মতো হয়ে রইল।

শুভাশীষদের বাড়ীর সামনেই মিউনিসিপ্যাল সড়ক; ষ্টেশন থেকে বেঁকে গ্রামের দিকে চলে গেছে। কতদূরে, কেউ জানে না। অন্তত শুভাশীষদের সমবয়সীরা কেউ না। ঐ পথে গ্রামান্তর থেকে তরিতরকারী, মাছ, দুধ নিয়ে হাটুরেরা আসে। তাদের ভীড় বাড়ে হাটবারে। ঐ পথেও খানকটা এগিয়ে গেছে শুভাশীষ। কিছুটা যেতে না যেতেই পথটার কৌলীন্য লুপ্ত। নেমে যেতে যেতে পথটা মাঠের সমতলে মিশে আসছে। এবড়ো খেবড়ো মাটির সরু একটা রেখা মাঠ পার হয়ে দূরে যে গাছের সারি তার সঙ্গে মিলে গেছে। ততদূর গেলে দেখা যায় পথটার আর অস্তিত্বই প্রায় নেই। দু'ধার থেকে বাঁশঝাড় যেন টুঁটি টিপে ধরেছে। ঝরাপাতার পুরু আস্তরণ পড়েছে পথের ওপর। চলতে গেলেই মর্মর ওঠে। বাঁশ ঝাড়ের পর আমবন অশত্থ-নারকেল-খেজুর গাছের ঘন সন্নিবেশের মধ্যে কেমন একটা ভূতুড়ে শব্দ ওঠে। কোথায় গেছে এপথ? নদীতে। হাটুরেরা বলে বড় গাঙ! সেই গাঙ নৌকায় পাড়ি দিয়ে এসেছে ওরা। সেই গাঙের পার নেই। সেখানে ঢেউ ওঠে পাহাড় প্রমাণ। শুভাশীষের শখ হয় একবার নদীর পাড় অবধি দেখে

আসে। কিন্তু দল জোটে না। সাহসেও কুলোয় না। বাঁশবন অবধি গিয়েই ফিরে আসে।

পাড়ায় নতুন বাড়ী তৈরি হলে কী যে ফুর্তি হত তখন। প্রথম শুরু হত মাটি কাটা। হিন্দুস্থানী মজুরগুলো ঝুড়ি ঝুড়ি মাটি ফেলছে। তাতে ঘরের ভিৎ তৈরি হচ্ছে। শুধু ভিৎই না। পাশাপাশি পুকুরও তৈরি হচ্ছে একটা। খানিকটা গভীর হতেই ঝলকে ঝলকে জল উঠে আসে পাতাল থেকে। সেই নতুন জলে নাইলে জ্বর আসে, কিন্তু নাইতে কত আনন্দ।

চক্রবর্তীদের বাড়ী তৈরি হওয়া তো শুভাশীষের স্পষ্ট মনে আছে। মাটি কাটা হল। মেজে হ'ল সিমেন্টের; চার ভিটেয় চার খানা ঘর উঠল, বড় ঘরখানা টিনের। বাড়ী তৈরি হল, কিন্তু কারা আসবে এ বাড়ীতে? সেই বাড়ির আশে পাশে ঘুরে বেড়িয়েছে কতদিন। কেউ তো এল না। আস্তে আস্তে মাটির দাওয়া আবার খসে পড়েছে। চাটাইয়ের বেড়ায় ঘুণ ধরেছে, টিনের চাল ঝুর ঝুর করে ঝরেছে। কারা তৈরি করল এবাড়ি। করলই যদি, এল না কেন?

এ রহস্যের উত্তর পাওয়া গেল পাড়ার এক মাষ্টার মশায়ের কাছে। মাষ্টার মশাইয়েরই এক আত্মীয়ের বাড়ি ওটা। থাকে কাছাকাছি কী একটা গ্রামে। সম্পন্ন গৃহস্থ, বুড়ির টাকা অনেক। ছোট ছেলে এখানে কালেক্টরীতে কী একটা কাজ পেয়েছিল বলে এখানে বাড়ী তুলেছিল। সেই ছেলেটি হঠাৎ মারা গেছে। ওদের আর এখন এখানে আসবার দরকার নেই।

এল কিন্তু ওরা মাস দু'য়েক পর। ঘরদোর আবার সারানো হ'ল। গোরুর গাড়ি থেকে জিনিষপত্র নামল। দু'দিন পরে এক দুপুরে মা

আলাপ করতে গেলেন। শুভাশীষও সঙ্গে গেল।

কী আলাপ হ'ল সব কথা বুঝল না শুভাশীষ। খালি দেখল বাড়ীর মালিক যিনি, সেই বুড়ি চোখ মুছছেন, মাও সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করছেন। ভারি অদ্ভুত। তখনকার দিনে মেয়েদের মধ্যে এমন সহজে আন্তরিক আলাপ হয়ে যেত। বুড়ির বড় ছেলে বেঁচে আছে। তার ছেলেদের লেখাপড়া করবার বয়স। গ্রামে পড়ে থাকলে তো চলে না, তাই চলে আসতে হয়েছে। এখানে ওরা ইস্কুলে পড়বে। সেই ছেলেদের দিকে তাকিয়ে শুভাশীষ কিন্তু আলাপ করতে সাহস পেল না। বয়সেও ওরা বড়, মাথাতেও ঢ্যাঙা। মনে হয় সতেরো-আঠারো বছর বয়স ওদের। এত বড় ছেলেরা পড়বে ইস্কুলে?

একটু পরে একটা বাটায় করে সাজা পান নিয়ে যে ঘরে ঢুকলো, তার দিকে তাকিয়ে শুভাশীষ আর চোখ ফেরাতে পারলে না। খুব অল্পবয়সী বউ। টানা টানা চোখ দুটি। মাথায় অল্প ঘোমটা। ফর্সা টুকটুকে মুখখানা, কিন্তু সে মুখে এতটুকু হাসি নেই। সুডোল হাতদুটি খালি।

মা জিজ্ঞাসা করলেন, এই বুঝি?

বুড়ি বললে, হ্যাঁ, ওই কপাল পুড়িয়েছে। এই বয়সে এই সাজ চোখে দেখতে পারিনে। আমি তো কাশী চলে যেতুম, কিন্তু ঐ হতভাগীর জন্যেই মরণ। এই কাঁচা বয়সে ওকে কোথায় রেখে যাই বলুন—

কিন্তু মা জিজ্ঞাসা করলেন, কেন বাপের বাড়ী কেউ নেই?

কেউ না। বাপ মাকে আগেই খেয়েছে। একটা ভাই কলকাতা না কোথায় চাকরি করে, সে খোঁজও নেয় না।

পানের বাটা নামিয়ে দিয়ে বৌটি দরজার পাশে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে ছিল। হঠাৎ শুভাশীষ দেখল বৌটি ওর দিদিকে চোখের

ইশারায় ডাকছে। দিদি উঠলো। শুভাশীষও পেছন পেছন উঠে গেল।

পশ্চিমের ভিটের ঘরে ঢুকে বৌটি ওদের দুজনকে একটা তক্তপোষে বসতে বলল। তারপর মাথার ঘোমটাটা অকস্মাৎ দিল খসিয়ে। বলল, এখানে তো কেউ আর দেখছে না। একটু সহজ হয়ে বসা যাক, কী বলো। তোমার নামটি কি ভাই?

দিদি বললে, চারু। আর এই আমার ভাই শুভাশীষ।

বৌটি বললে, বাঃ দিব্যি নাম। আমাকে তোমরা ডেকো সরমাদি' বলে।

পিঠের ওপর রাশীকৃত চুল ভেঙে পড়েছিল, সেগুলো মাথার ওপর স্তূপ করে রাখতে রাখতে সরমাদি বললেন, ভাবছি এগুলো ছোট করে কেটে ফেলব।

কেটে ফেলবেন! ওমা, কেন?

সরমাদি একটু হাসলেন। সেই বিষণ্ণ, করুণ ভঙ্গিটুকু এখনো মনে আছে শুভাশীষের। বললেন, বিধবার বড়ো চুল রাখতে নেই।

টাইফয়েডে সব চুল উঠে গিয়েছিল চারুর। তারপর আর ভালো করে হয়নি। সরমার দীঘল চুলগুলির দিকে সে সতৃষ্ণ চোখে চেয়ে ছিল।

সরমাদি চারুকে বললেন, এখানে এসে তোমাদের সঙ্গেই প্রথম আলাপ হ'ল। তোমরাই আমার প্রথম বন্ধু। সময় কাটতে চায়না। এখানে মাঝে মাঝে আসবে, কেমন?

সরমাদি কথাটা বলছিলেন চারুর দিকে তাকিয়ে। শুভাশীষের কেমন যেন হিংসে হয়েছিল। সরমাদি তাকে একটা কথাও বলছেন না। কেন।

বাসায় ফেরবার পথে মা বললেন, ছুঁড়িটার জন্যে সত্যি ভারি দুঃখু হয়। সতেরো বছর বয়স। পুরোপুরি একটা বছরও স্বামীর ঘর করতে পারেনি। এরি মধ্যে সাধ আহ্লাদ সব শেষ।

সরমাদি দিদির চেয়ে কত বড়ো মা ?

চারু ? চারুর চেয়ে ও প্রায় বছর তিনেকের বড়ো হবে। চারুর বয়স তো এই সবে চোদ্দ।

সবে ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরেছে চারু। ইস্কুল ছেড়ে বাড়িতে পড়ছে। অর্থাৎ কিছুই পড়ছে না, কেবল লুকিয়ে নভেল পড়ছে।

সে দিন সমস্ত বিকাল শুভাশীষ সরমাদির কথা ভুলতে পারলনা। ফিরে ফিরে মনে পড়তে লাগল সেই করুণ পেড়ে ধুতি আর খালি হাত দু'টির কথা।

দুই

এর পর ক'দিন পরীক্ষার তাড়ায় শুভাশীষ সব ভুলে ছিল। পরীক্ষা এর পরেও অনেক দিয়েছে, কিন্তু প্রথম বারের সেই থ্রিল আর কখনো আসবে না। দুরু দুরু বুকে পরীক্ষকের সমুখে গিয়ে দাঁড়ানো। মৌখিক পরীক্ষা কিনা সব, কথার চট পট জবাব দেওয়া চাই। একটু তোৎলামি করেছ কি নম্বর কাটা গেছে। শুভাশীষের ভাগ্য ভাল,—ইংরিজী, বাংলা, আর ইতিহাসে উঁচু নম্বরই পেলে। সুবিধে হ'ল না অঙ্কে। আর ভুগোলে। ও না পারত মানচিত্র আঁকতে, না পারত অঙ্কিত মানচিত্রে পাহাড়, নদী, শহর ইত্যাদি খুঁজে বার করতে।

কথা ছিল এবার পরীক্ষার পর মিশনারি ইস্কুল ছেড়ে হাইস্কুলে ভর্তি হবে। আরো একটা ব্যাপারে সে সিদ্ধান্তটা কিছু এগিয়ে গেল।

পরীক্ষার পর দুপুর বেলাটা কাটত মিশনারিদের দেওয়া খৃষ্টীয় উপদেশমূলক বই পড়েই। একদিন হাইস্কুলের এ্যাসিষ্টান্ট হেড্ মাষ্টার যতীশ বাবু বেড়াতে এলেন।

কী বই পড়ছ, দেখি।

শুভাশীষ দেখালে, দশটি অনুজ্ঞা।

দাছুর দিকে তাকিয়ে মাষ্টারমশাই বললেন, নাতিকে একেবারে খৃষ্টান করে তুলছেন দেখি মশাই। খালি সুসমাচারই পড়ে। পড়িয়েছেন ওকে রামায়ণ, মহাভারত? শুনিয়েছেন আর্যদের গৌরব কাহিনী? তারপর অকস্মাৎ ঘুরে শুভাশীষের দিকে তাকিয়ে বললেন, দশটি অনুজ্ঞা তো পড়ছ। কিন্তু দশাবতারের নাম বলতে পারবে?

বলা বাহুল্য, শুভাশীষ পারল না। যতীশবাবু তখন একখানি কাগজে কয়েকটি শ্লোক লিখে দিলেন; আর দশটি নাম। মীন কূর্ম ইত্যাদি। শ্লোকটির মানে কিছু বোঝা গেল না, কিন্তু ভারি মিষ্টি লাগল!

প্রলয় পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং—

প্রথম ছিল জল, চারিদিকে ধূ ধূ, থৈ থৈ জল। তখন ভগবান এসেছিলেন মীনরূপে। তারপর যখন অল্প অল্প মাটি দেখা দিল, তখন কূর্ম। বরাহ, নৃসিংহ, বামন ইত্যাদি সব ক'টি অবতারের মর্ম সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিলেন; সেই সঙ্গে প্রহ্লাদ, বলি প্রভৃতির কাহিনীও শুনতে হ'ল।

যাবার সময় যতীশবাবু বলে গেলেন, হিন্দুর ছেলে হয়ে তুমি রামায়ণ মহাভারত জানো না, অথচ বেথলেহামের রাখালশিশু সম্বন্ধে সব জানো? ওকে আর মিশনারি ইস্কুলে যেতে দেবেন না। এবারে আমাদের ইস্কুলে দিয়ে দিন। হিন্দুর ছেলে খাঁটি হিন্দু হয়ে মানুষ হোক।

পরে শুভাশীষ জেনেছিল, যতীশবাবুর স্বধর্মে নিষ্ঠা যত, পরধর্ম সম্বন্ধে অসহিষ্ণুতাও তত। দাছুর কিন্তু তাকে খাঁটী হিন্দু করে তোলবার তত আগ্রহ ছিল না, যত ছিল তাকে খাঁটি মানুষ করে তোলবার। উনিশ শতকের শেষ যুগের লোক তিনি। যৌবনে কলকাতা গিয়ে ব্রাহ্মধর্মের

প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। সমাজেও নিয়মিত যাতায়াত করতেন যদিও শেষ পর্যন্ত হিন্দুই থেকে গিয়েছিলেন। হয়ত যথেষ্ট সাহসের অভাবে, হয়ত আপন মনে তিনি হিন্দুত্বের সঙ্গে ব্রহ্মবাদের একটা সহজ মীমাংসা সূত্র উদ্ভাবন করেছিলেন। হিন্দুধর্মের বহিরঙ্গের প্রতি তাঁর যেমন কোন আকর্ষণ ছিল না, তেমনি ছিল না একশ্রেণীর ব্রাহ্মদের অত্যুগ্রাসিক কৃত্রিমতার প্রতি কোন শ্রদ্ধা। এক কথায় তিনি পণ্ডিত, ধর্মযাজক, পাদ্রী সবার সঙ্গেই সমান সৌহার্দ্যের সঙ্গে মিশতেন। আহারাদিতে কোন প্রকার সংস্কার মানতেন না। বিদ্যাসাগরের প্রতি যেমন শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, রামমোহনের প্রতিও তেমনি নাস্তিক ছিলেন না। কিন্তু বাড়িতে মেয়েরা পূজার্চনা করলে বাধাও দিতেন না, বরং সানন্দে যোগ দিতেন। আসলে, ধর্মের উপচারাংশ তাঁর জীবনের একটা অত্যন্ত গৌণ-স্থান অধিকার করেছিল। তিনি অধর্মী ছিলেন না, কিন্তু উদার ছিলেন।

যাই হোক, শুভাশীষের মিশনারি স্কুলে যাওয়া বন্ধ হল। পাঠ্য-পুস্তকের মধ্যে নির্দিষ্ট হল, কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত। আর সকালে মুখস্ত করতে হত গীতা।

কৃত্তিবাস যেন এক নিঃশ্বাসে,শেষ হ'য়ে গেল। রামায়ণে একটানা একটা ঘটনার প্রবাহ আছে, রামের জন্ম থেকে সীতার পাতাল প্রবেশ অবধি, মহাভারতে সেটা পেল না। তবু ওরি মধ্যে অর্জুনের লক্ষ্যভেদ, দ্যূতসভা আর কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ মনে গেঁথে গেল।

সব ভুলে কেবল নেশার মত বই পড়ে যেতে লাগল। রামায়ণ মহাভারত শেষ হ'ল, তৃষ্ণা মিটল না। আরো বই চাই। সেকালের সব বীরশ্রেষ্ঠরা নতুন বন্ধু শুভাশীষের। রোজ দুপুরে, সকালে সন্ধ্যায় বন্ধ ঘরে তাদের সঙ্গে আলাপ। ততদিনে গ্রীষ্মের সোনাগলানো আকাশে আষাঢ়ের তামাটে ছোপ লেগেছে। মিশন কম্পাউণ্ডের কাঁচা আমগুলো

কখে যে ঝাড়ে পড়ে গেছে, টের পায়নি। কুলপী বরফও সে বছর আর খাওয়া হ'ল না।

বই বন্ধ করে বাইরে এসে শুভাশীষ আকাশের রঙ দেখে অবাক হয়ে গেল। বহুদিন পরে একা একা বেরিয়ে পড়ল পথে। এলোমেলো উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে অনেকক্ষণ ঘুরেও যখন সমবয়সী কারুর দেখা পাওয়া গেল না, তখন মনটা অকারণেই একটু খারাপ হয়ে গেল। ঘুরতে ঘুরতে চক্রবর্তীদের বাসার পিছনের বাগানে কখন এসে পড়েছে টের পায়নি। আর এসেই যখন পড়েছে তখন গোটাকতক জাম পেড়ে খেতে ক্ষতি নেই। পায়ের কাছ থেকে একটা ঢিল কুড়িয়ে নিয়ে শুভাশীষ তাক করে মারলো উঁচু একটা ডালের দিকে। ঝুর ঝুর করে গোটা কতক জাম পড়বার শব্দ হল, তার সঙ্গে আর একটা শব্দ—উঃ।

শুভাশীষ সেই দিকেই দৌড়ে গিয়েছিল। গাছের ওদিকটায় গুঁড়িটাতে হেলান দিয়ে,.... আরে এযে সরমাদি।

সরমাদি এক হাতে আঁচলটাকে কপালের কাছে চেপে ধরেছেন, পায়ের কাছে কলসীটা নামানো। আরেক হাতে, শুভাশীষ বিশ্বাস করতে পারছিল না....এক টুকরো ভাঙা মাছ।

একে ঝোপ, তাতে অন্ধকার, দূর থেকে শুভাশীষ ভাবতেই পারেনি এখানে কেউ থাকতে পারে, এই অসময়ে। সরমাদি পুকুর ঘাটে যাচ্ছিলেন বোঝাই যাচ্ছে, কিন্তু পুকুরঘাটের পথও তো এটা নয়।

খানিকক্ষণ বিমূঢ়, অপরাধীর মতো দাঁড়িয়ে রইল শুভাশীষ। পায়ের কাছে ছড়ানো জামগুলোও কুড়িয়ে নিতে ভুলে গেল।

খুব লেগেছে, সরমাদি ?

বেশি নয়। তুমি যাও।

আঁচলটা ছেড়ে দিয়ে মুখোমুখি দাঁড়ালেন সরমাদি। চোখের

কাছটার একটু ফোলা ফোলা। হাতের মাছের টুকরোর দিকে সরমাদির বুঝি এতক্ষণ চোখ পড়ল। একটু যেন অপ্রতিভ হলেন তিনি। ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।—তুমি যাও।

—আপনি মাছ খাচ্ছিলেন সরমাদি? চোখ দু'টো বড়ো বড়ো করে শুভাশীষ প্রশ্নটা করেছিল, মনে আছে।

একেবারে সঙ্কুচিত হয়ে পড়লেন সরমাদি, অতোটুকু ছেলে যে শুভাশীষ, তার সামনে। দীর্ঘ চুলের কয়েক গাছি যে কপালের ওপর এসে পড়েছিল, সেখানে কয়েক ফোঁটা ঘাম জমে উঠেছে সেটা আধো-অন্ধকারেও শুভাশীষ অনুমান করতে পারল। দীর্ঘপল্লবচ্ছায়ায় যে চোখের তারা দু'টি ছিল স্তিমিত তারা যেন অকস্মাৎ সচকিত হয়ে উঠেছে। এদিক ওদিক তাকিয়ে সরমাদি করলেন কি শুভাশীষের হাত দু'খানা চেপে ধরলেন—কাউকে বলে দিয়োনা ভাই।

আরো কী কী লোভ দেখিয়েছিলেন সরমাদি, সেটা এতদিন পরে আর মনে নেই, কিন্তু সেই মিনতিকাঁপা কণ্ঠস্বরটুকু শুভাশীষ ভুলতে পারেনি।

বিধবাকে মাছ খেতে নেই, সেটুকু জানা ছিল। বাড়িতে মাসিমা মাছ খেতেন না, এমনকি মাছের ছোঁওয়াটুকু পর্যন্ত না। তাঁর জন্যে স্বতন্ত্র রান্না হ'ত আলো চালের ভাত, নিজের হাতে নিজেই তিনি তা ফুটিয়ে নিতেন। ঘি আর আলুভাতে দিয়ে মেখে রোজ চারু আর শুভাশীষকে ডাকতেন।

সরমাদিকে কথা দিয়ে এলো কাউকে বলবে না, কিন্তু সে কথা শুভাশীষ রাখতে পারেনি। বাড়িতে ফিরে পড়তে বসল বটে যথারীতি, মনটা কিন্তু উন্মনাই রইল। ভগ্নাংশের যোগটা মিলল না কিছুতেই। রান্নাঘরে মা আর মাসিমার গল্প করার শব্দ আসছে, আর আসছে ভাজা মাছের গন্ধ। শুভাশীষের কী একটা কথা মনে পড়ল।

—দিদি।

দিদি টেবিলের ধারে বসে ইংরিজি রীডার পড়ছিল। শুভাশীষের সাড়া পেতেই কোঁচড়ে লুকিয়ে ফেলল একটা বই। জোরে জোরে ইংরিজি পড়তে শুরু করল।

—এই দিদি।

—উঁ।

গলা নামিয়ে ফিস ফিস করে শুভাশীষ বলল, একটা কথা শুনবি?

পড়ায় ভারি মনোযোগ দেখা যাচ্ছে এখন চারুর।—বিরক্ত করিস না। দেখছিস না ইংরিজি পড়ছি।

—ইংরিজি পড়ছিস না হাতি। তুই নভেল পড়ছিলি নিশ্চয়।

—বেশ করছিলুম।

ইচ্ছে করলে শুভাশীষ উঠে গিয়ে কেড়ে আনতে পারত বইখানা আজকাল আর দিদি ওর সঙ্গে পারে না। কিন্তু তা হ'লে আর দিদিকে কথাটা বলা হয় না।

—জানিস, সরমাদি মাছ খায়? আজ আমি দেখেছি।

কিন্তু চারুকে সে রকম উত্তেজিত হতে দেখা গেলনা, যতটা শুভাশীষ আশা করেছিল।

ঠোঁট উল্টে চারু বললে, জানি।

—জানিস?

রোজ ছুপুরে ওবাড়ি যাই যে। তুই তখন থাকিস ইস্কুলে। বাড়ি থেকে মুড়ি নিয়ে যাই, কাঁচা লঙ্কা, তেল, নুন, পেঁয়াজ। দরজায় খিল দিয়ে খাই। সরমাদি ভালবাসে। পেঁয়াজ খেতেও ওর বারণ কিনা।

[illegible] মত হাপুস [illegible]। বিধবাদের সব কিছুতেই বারণ। গয়না পরতে, শাড়ি পরতে, মাছমাংস পেঁয়াজ খেতে। এমন কি, একটু থেমে চারু রহস্যময় গলায় বললে, ভালবাসতেও বারণ।

ভালবাসতেও বারণ। কথাটা কেমন যেন অদ্ভুত, খাপছাড়া লাগল কানে। —আমাকে ভালবাসতেও বারণ? দিদি, আমাকে?

হেসে ফেলল চারু।—দূর পাগল, সে ভালবাসা নয়। আরেক রকমের ভালবাসা।

নভেল পড়ে পড়ে কত রকমারি ভালবাসার কথাই যে চারু জেনেছে। আরেক রকমের ভালবাসা, চারু বললে, তুই বুঝবি না।

—তুই বুঝিস? বোকার মত জিজ্ঞাসা করলে শুভাশীষ।

—সব বুঝি। মিটি মিটি হেসে জবাব দিলে চারু।

চোদ্দ বছর বয়স, সব বোঝে চারু। আজানু-উন্মুক্ত ফ্রক পরে সেদিন অবধি চঞ্চল হয়ে ঘুরে বেড়াতো যে, সে এখন অনভ্যস্ত শাড়ি পরেছে। চলা ফেরায় এসেছে মন্থরতা। পায়ের গোড়ালিটুকুও একটু বেরিয়ে পড়ে যদি, চারু এখন সযত্নে ঢেকে দেয়। খালি, চোখ ছ'টো ভারি চঞ্চল। কাজের ফাঁকে ফাঁকে জানালার পাশে এসে দাঁড়ায়। বিনুনীটাকে সংবরণ করেছে খোঁপায়। গান এখনো গায় বটে, কিন্তু সে গুণ গুণ করে, আর কারণে অকারণে আয়নার সম্মুখে এসে চুলে চিরুণী বুলোয়।

এত অন্তরঙ্গ ছিল শুভাশীষ চারুর, কিন্তু তার কাছ থেকেও দিদি যেন ক্রমশঃ সরে যাচ্ছে। আজকাল শুভাশীষকে সব কথা বলে না। পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে তাস পেটে দুপুরে; ওদেরি সঙ্গে ফিস ফিস করে কি সব হাসাহাসি, গল্প করে। সেখানে শুভাশীষ গেলেই ধমক খায়—পুঁচকে ছোঁড়া, তুই এসব কথা কি শুনছিস রে!

—আচ্ছা মা, বিধবাকে ভালবাসতে নেই?

মা কি একটা সেলাই করছিলেন, তাঁর হাত বন্ধ হয়ে গেল। বড় মাসিমাও বিধবা, তিনি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রইলেন। ছোট মাসিমা সকাল বেলা শ্বশুর বাড়ি থেকে এসেছিলেন, তিনি গড়িয়ে পড়লেন হাসতে হাসতে।

—ও দিদি, তোমার ছেলের কথার জবাব দাও।

মার মুখভঙ্গি কঠিন হয়ে উঠেছিল, শুভাশীষের মনে আছে ; ঠাস করে একটা চড় কসিয়ে দিয়েছিলেন ওর গালে।

—কার কাছে শিখেছিস এসব কথা, বল।

—আবার কার কাছে, মাসিমা বললেন, চারুর। ও তো এখন দিনরাত ঐ সবই পড়ছে কিনা। বঙ্কিম গ্রন্থাবলী তো চার দিনে শেষ করলে। কৃষ্ণকান্তের উইল পড়ছে দেখলাম সেদিন।

—আহা, পড়ুক, ছোট মাসিমা বললেন, আর দু'দিন বাদে বিয়ে হবে, সব জেনে শুনে নিক বরং।

তাই বলে ভাইটার মাথা খাবে? মা বিরক্ত গলায় বললেন, যাতো চারুকে ডেকে নিয়ে আয় তো। বোধ হয় চক্রবর্তীদের ওখানে আড্ডা দচ্ছে।

ছুটে বেরিয়ে পড়ল শুভাশীষ। সমস্ত আকাশটা রোদ্দুর ঝলসানো, গলানো ধাতুর মত তাপ চুইয়ে চুইয়ে পড়ছে, গা দিয়ে, ফোঁটা ফোঁটা ঘামে। চক্রবর্তীদের বাসায় যখন পৌঁছল, তখন শুভাশীষ হাঁপাচ্ছে। ওদের গরুটা ঝিমুচ্ছে গোয়ালঘরে। বুড়ি শুয়ে শুয়ে নাক ডাকাচ্ছে। আর কোথাও কেউ নেই। সরমাদির ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। বাইরের শেকলটা ঠক ঠক করছে হাওয়ায়। ভেতর থেকে অল্প অল্প হাসির শব্দ শোনা গেল। দরজার ওপর হাত দিয়ে শুভাশীষ শব্দ করল দু'বার।

ভেতর থেকে পুরুষের গলায় ভারি শব্দ এল—কে?

—আমি। কোনোক্রমে শুভাশীষ বলতে পারল, দিদি আছে?

—কেউ নেই, ভাগ্।

গলাটা শুভাশীষ চিনতে পারল, নির্মলের। সরমাদির জ্যাঠার ছেলের। চলে আসছিল শুভাশীষ, ভেতর থেকে আবার খিল খিল শব্দ শোনা গেল, আর সেই শব্দে নির্ভুল ভাবে মেশানো আছে চারুর হাসি।

ঘুরে এলো শুভাশীষ বাড়ীর যে ধারটায় আবর্জনা পড়ত, সেই দিক দিয়ে। এদিকে একটা জানালা আছে, সে জানত। জানালাটা আধ ভেজান। কবজার কাছে চোখ রাখলে ভেতরের সবটা দেখা যায়। উঁকি দিয়ে শুভাশীষ দেখল, তক্তপোষের উপর পাটি বিছানো। চারু, নির্মল, সরমাদি আর বোর্ডিংয়ের উপেনদা। উপেনদা ফার্স্ট ক্লাশের ছাত্র, ইয়া লম্বা চওড়া চেহারা, গোঁফও রেখেছেন একটু একটু। বয়স বাইশ তেইশের কম মনে হয়না, ইস্কুলের পক্ষে কিছু বেমানান আজ ক'বছর ধরে ফার্স্ট ক্লাশেই পড়ছেন উপেনদা। টেস্ট পরীক্ষা নিয়মিত দিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু ম্যাট্রিক না। বোধ হয় টীমের হাফব্যাক্ এর চেয়ে ভালো হবে না বলে মাষ্টার মশায়েরা ওকে ছাড়তে চাইছেন না।

কিন্তু এ বাড়ীতে কেন উপেনদা? বোধ হয় নির্মল ডেকে এনেছে। পাটির ওপর তাস ছড়ানো। স্পষ্টই বোঝা যায় ওরা খেলছে। কিন্তু আধশোয়া সরমাদির মাথাটা কেন এলিয়ে আছে উপেনদার কাঁধে আর নির্মলটাই বা কেন এত ঘেঁসে বসবে চারুর কাছে?

বাইরের চড়া রোদ্দুরে মাথাটা ঝাঁঝাঁ করছে শুভাশীষের, মুখটা লাল হয়ে উঠেছে, গলাটা শুকনো।

চেঁচিয়ে একবার বললে, দিদি, মা তোমাকে এক্ষুনি বাড়িতে ডাকছে, না গেলে ভীষণ মারবে।

বলেই শুভাশীষ সেখান থেকে ছুট দিল।

বাড়ীতে সবাই শুভাশীষকে ভালবাসে বটে কিন্তু ছোট মাসিমার মত বুঝি কেউ না। এই তো সেদিন বিয়ে হল মাসিমার, এখনও পাঁচ বছর পুরো হয়নি। বিয়ের কথা ভাল মনে নেই শুভাশীষের, অস্পষ্ট

তাকে কেবল মনে পড়ে, দরজার পাশে কলাগাছ, মঙ্গল ঘট, রাশি রাশি মেটে গেলাস, আর হৈ চৈ। কাছাকাছি বিয়ে হয়েছে মাসিমার। এখান থেকে জেলা সদরের দিকে যেতে মাত্র গোটা দুই ষ্টেশনের পরে, কি একটা গ্রাম। মেশোমশাইকে মনে নেই শুভাশীষের। শুনেছে তিনি রেলে চাকরি করেন। খিদিরপুরে। বি, এন, আর অফিসে। দেশে আসেন কদাচিৎ। বিয়ের পর আর আসেননি শ্বশুর বাড়ীতে।

সব সময়েই হাসি-হাসি মুখখানা ছোট মাসির; একেবারে ছেলেমানুষের মত।

মা বলেন, পাগল। ছেলেপুলে হয়নি, তাই। হলে শুধরে যেত।

যে ক'দিন ছিল ছোটমাসি, কেবল পুতুল খেলেই কাটালো। চারু অনেকদিন পুতুল খেলা ছেড়ে দিয়েছিল। সেগুলো ছিল ঘরের কোনে, ধুলো বালির মধ্যে, অযত্নে। ছোটমাসি সেগুলোকে আবার ঝেড়ে পুঁছে নিল, প্রাণ প্রতিষ্ঠাও করল নতুন করে। যে সব পুতুলের বিয়ে হয়নি, ছোটমাসি না এলে যারা আইবুড়োই থেকে যেত চিরকাল, তাদের আবার ঘটা করে বিয়ে হল। দশ বারো টাকা খরচও হয়ে গেল ছোটমাসির।

মা, বড়মাসিমা আর দাদু, কিছু বলতেন না, খালি হাসতেন। ছোটমাসি সম্বন্ধে সবার মনে একটা স্নিগ্ধ, সিক্ত দুর্বলতা তো ছিলই, একটু বেদনা বোধও বুঝি ছিল। পাঁচ বছর বিয়ে হয়েছে মেয়েটার, এখনও কোলে একটা পায়নি, সে একটু পুতুল নিয়ে নাচানাচি করবে বৈকি। একটু ছেলেমানুষি। তা হোক।

মা মাসিমাদের আলাপে শুভাশীষ বুঝেছে যেখানে ছোটমাসির বিয়ে হয়েছে, সে জায়গাটা সুবিধের নয়। অতি দজ্জাল শাশুড়ি ছোটমাসির, তেমনি বজ্জাত আছে এক ননদ।

কতদিন শুভাশীষ দেখেছে, অতো যে হাসিখুসি ছোটমাসি,

শ্বশুরবাড়ির প্রসঙ্গে তার মুখের সব দীপ্তি যেন নিবে যেতো। মা আর বড়োমাসির কাছে বসে ছোটমাসি চোখ মুছছে, এদৃশ্য তার কথায় দেখা।

—রণেন কিছু বলে না? মা হয়ত জিজ্ঞাসা করেছেন।

—কী আবার বলবে। ওখানে থাকে না তো। দু'দিনের জন্যে আসে। মা আর বোনের মুখে ঝাল খেয়ে আমাকে বকে।

—শুধু বকে? অত্যন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মার, মর্মভেদী প্রশ্ন।

নিরুত্তর সুরমার মুখের দিকে তাকিয়ে বোঝা গেছে, শুধু বকে না, মারেও। সমস্ত হাতভর্তি কালো কালো দাগ ছোটমাসির। সেমিজটা একটু ঢিলে করে মাকে আর বড়মাসিকে দেখালে সে, দাগ সারা পিঠেও।

বড়মাসিমার দেওর নিরঞ্জনকাকা কলকাতায় এম,-এ, পড়েন। চোখে চশমা, ঈষৎ ময়লা, স্বাস্থ্যবান পেশল চেহারা. চেহারাটা স্পষ্ট মনে আছে শুভাশাষের। চশমার নিচে চোখ দু'টি সর্বদাই তাঁর কৌতুকে নাচতো। মার কাছে আবদার করে, বড় মাসীমার সঙ্গে ঠাট্টা ইয়ার্কি করে সারা বাড়িময় দুপ্‌দাপ দুষ্টুমি করে বেড়িয়ে সমস্ত মুহূর্তগুলো সঞ্জীবিত করে তুলতেন তিনি।

কলকাতা থেকে স্থানীয় কোন টীমের হয়ে খেলতে এসেছিলেন নিরঞ্জন কাকা। খেলাশেষে পরের দিন চলে যাবার কথা। কিন্তু মা দাদু আর বড় মাসিমার নির্বন্ধাতিশয্যে রয়ে গেলেন।

ক্যামেরা নিয়ে বাড়ির সকলের ছবি তুললেন। সকলের একসঙ্গে। খালি ছোট মাসিমার একখানা আলাদা ছবি কখন লুকিয়ে তুলে নিয়েছিলেন। সেটা প্রিন্ট হয়ে এলে তার নিচে নিরঞ্জন কাকা লিখে

দিলেন, "হে বিরহিনী"। বাড়িশুদ্ধ হাসাহাসি পড়ে গেল। খালি ছোট মাসিমা ছুটে পালালেন সেখান থেকে।

সেই হাসাহসি থেমে গেল একদিন। রোজ সকালে উঠে দাছ বেড়াতে বেরুতেন। ফেরবার পথে ডাকঘর হয়ে চিঠি নিয়ে আসতেন। একদিন একখানা চিঠি এনে মার কোলে ফেলে দিয়ে বললেন, পড়ে দেখ।

মা পড়লেন। বড় মাসিমাকে দিলেন। বড় মাসিমা দিলেন ছোট মাসিমাকে। ছোট মাসিমা পড়ে খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইল।

মা দাছুকে জিজ্ঞাসা করলেন, কবে রেখে আসতে চাও, ওকে ?

দাছু বললেন, এক্ষুনি। যে চিঠি লিখেছে ওরা তারপর ওকে আর একমুহূর্ত'ও এখানে রাখা চলে না।

বড় মাসিমা বললেন, ছি-ছি-ছি। কী ছোটলোক ওরা। ছ'দিন মেয়েটা এসে হাড় ক'খানা জুড়িয়েছিল, তাও সইলো না।

নিরঞ্জনকাকা বললেন, পাঠাবে না বৌদি। আবার ছেলের বিয়ে দেবে ভয় দেখিয়েছে তো। দিক না বিয়ে। বিয়ের আসর গিয়ে লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে আসব না।

দাছু বললেন, না আজই যাক। সাড়ে এগারোটায় ট্রেন। ওকে তাড়াতাড়ি তৈরী করে দাও।

ছল ছল চোখে সকলকে প্রণাম করে সুরমা দাছুর সঙ্গে রওনা হয়ে গেল, স্পষ্ট মনে আছে সে কথা। যাবার সময় শুভাশীষকে ধরে একটু আদর করল। হাতে গুঁজে দিল একটা টাকা। নিরঞ্জনের দিকে তাকিয়ে শুধু একটু ম্লান হাসল।

ছোট মাসি চলে যাবার পরও অনেকক্ষণ ধরে রাস্তার ধারে শুভাশীষ দাঁড়িয়েছিল। কী ভাবছিল মনে নেই। হয়ত কিছু ভাবছিল না। খালি ছুর্জ্ঞের একটা কারণে সমস্ত মনটা ভারি হয়ে ছিল। হাতের

মুঠোর ভেতর তখনো ছিল টাকাটা। সেটাকে উদ্দেশ্যহীন ভাবেই খানিক কতক্ষণ নাড়া চাড়া করলে, এপিঠ ওপিঠ উল্টে দেখলে।

নিরঞ্জন কাকা সেদিন বিকেলের গাড়ীতেই রওনা হয়ে গেলেন। মা মাসিমার অনুরোধেও কিছুতেই আর থাকতে রাজি হলেন না। আর একটা দিনও না।

তিন

অনেকখানি জায়গা জুড়ে মিশন কম্পাউণ্ড। ভেতরে পাকা বাড়ি মোটে দুটি, গীর্জা আর সাহেবের কুঠি। এ-পাশে, ও-পাশে রেলওয়ে লাইন, মাঝখানে সরু খাল। গরমের সময় সেটা শুকনো থাকে, বর্ষার সময় ভরে ওঠে। রেল ষ্টেশন থেকে যে পথটা সোজা চলে এসেছে হাইস্কুলে সেটাই একটু বেঁকে পৌঁচেছে গীর্জার ফটকে। ফটকের ওপর একটা কাঠের ফলকের অর্ধবৃত্ত। সেই ফলকে লেখা আছে ইংরিজি হরফে, "ব্যাপটিষ্ট মিশন।" আড়া আড়ি করে আর একটি কাঠের বোর্ডে বাইবেলের খোদিত বাণী: আমা দিয়া না গেলে কেহ ঈশ্বরের নিকট যাইতে পারিবে না।

গীর্জা আর সাহেবের কুঠির মাঝখানে একটা সিমেন্টগাঁথা চত্বর, যার ভেতরে বাঁধানো একটা ছোট পুকুরের মতো আছে, কতকটা মাটির নিচে বসানো চৌবাচ্চার মতো। চৌবাচ্চাটা, শুভাশীষ বরাবরই দেখছে, খালি। কৃত্রিম উপায়ে এটাকে জলপূর্ণ করবার উপায় আছে। এখানে নাকি আগে ব্যাপটাইজ করা হত।

ব্যাপটাইজ? সে আবার কী। না খৃষ্টীয় মতে শুদ্ধি। আজকাল আর কেউ-বড় খৃষ্টান হয়না। এক সময় হয়েছিল। পাদ্রীরা নতুন এসেছিল

তখন। আশে পাশে অন্ত্যজজাতীয় হিন্দুদের কয়েকটা গ্রাম ছিল। তারা পূজাও করে, শুয়োরও খায়, মদ খেয়ে ঢোল বাজায়। একদিন তারা দলে দলে এই চৌবাচ্চায় অবগাহন করল।

সবাই খৃষ্টান হবে।

বিনিময়ে সাহেবেরা আশ্বাস দিয়েছেন, চাকরির। ওদের লেখাপড়া শেখানো হবে; ইংরিজি কিছু কিছু। তা ছাড়া কারিগরি। সারা দেশময় আছে সাহেবদের কারখানা, সেই সব কারখানায় ছড়ানো চাকরি, তাই পাবে।

গীর্জার কিছুদূরে, কম্পাউণ্ডের ভেতরেই, আরো খানকয়েক টিনের ঘর। দেশীয় খৃষ্টানদের কোয়ার্টার্স। মিশনের মাইনেকরা প্রচারক এরা। হাটবারে হাটবারে বাজারে গিয়ে খৃষ্টমাহাত্ম্য প্রচার করে। টাকা যোগান আসে বিলেত থেকে। এরা নিজেরাও সব এক পুরুষ দু' পুরুষের খৃষ্টান। কেউ হিন্দু, কেউ মুসলমান। চাষবাস করে খেতো, এমন সময় পাদ্রী সাহেবেরা এসে স্বর্গের সিঁড়ি খুলে দিলেন। এরা হুজুগে পড়ে ধর্ম দিল বটে, কিন্তু নাম নয়। খৃষ্টান কলোনিতে আজো বেশির ভাগের নামই নিবারণ বিশ্বাস, কামিনী সরকার কি হজরত আলি মোল্লা। ছেলে মেয়েদের একটা করে বিলিতি নাম আছে বটে, কিন্তু সেগুলো প্রকাশ্যে ব্যবহার্য নয়।

প্রচারকেরা গলায় ক্যাম্বিসের ব্যাগ ঝুলিয়ে বাজারে যান হাটবারে। কাউকে কাউকে বাইরেও যেতে হয়। লোক জমে বটে, কিন্তু খৃষ্টান হতে কাউকে বড়ো দেখা যায় না। সে আকর্ষণ আজকাল আর তেমন নেই। জাত যায়, অথচ চাকরি সব সময়ে জোটে না। প্রার্থনাসংগীতের পর প্রচারকেরা যখন হিন্দুধর্মের কুৎসা সুরু করেন, তখন আস্তে আস্তে লোক সরে যায়। আগে অনেকে চটে যেতো। এখন শুধু মজা পায়। প্রচারক বক্তৃতা শেষে বলেন, আসুন সবাই মিলে এবার প্রার্থনা করি

হে পরম পিতঃ—চোখ বুজে গদগদ কণ্ঠে মুখস্ত বুলি সুরু করেন। অনেক দিন চোখ খুলে দেখতে পান, চারপাশে একটা লোকও নেই। একটু দূরে যে লোকটা অফুরন্ত রতিশক্তির আশ্বাস সম্বলিত হ্যাণ্ডবিল আর টোটকা ওষুধ বিতরণ করছে, ভীড় সেখানে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রচারক বাসার দিকে রওনা হন। আজকাল লোকের ধর্মে মতি নেই। আর এই বিপথগামী পৌত্তলিকদের বিবেকোন্মেষ করা কি সহজ কর্ম। সাহেবেরা তা বোঝে না। একটা লোকও খৃষ্টান হচ্ছেনা দেখে গালাগালি দেয়। বলে, বরখাস্ত করবো। বলে, মিশন উঠিয়ে দেবো।

এই মিশনের প্রধান প্রচারক যিনি তাঁর নাম বিভূতি সমাদ্দার। শুভাশীষদের পরিবারের সঙ্গে এঁদের ঘনিষ্ঠতা কিছু বেশী। ছোটছেলে ননী শুভাশীষের সমবয়সী।

মিশন কম্পাউণ্ডের মধ্যে যেখানে স্পোর্টস হত সেখানে ননী আর শুভাশীষ গল্প করছিল।

—জানিস ছোড়দি ফিরে এসেছে!

ছোড়দি মানে ননীর ছোড়দি। এই তো সেদিন বিয়ে হল লোকো-শেডের ফোরম্যান জনসনের সঙ্গে। জনসন লোকটা আধফিরিঙ্গি।

লোকোশেডের গরমে পোড়া তামাটে রঙ, দৃঢ় চোয়ালের ওপর কপাল পর্যন্ত প্রসারিত দপদপে রগ, অল্প অল্প কালিলাগা বুকখোলা হাফসার্টের নিচে রোমাকীর্ণ বুক; ভুল ইংরিজির সঙ্গে ভাঙা ভাঙা হিন্দী বুলি,—সব মিলে যে রূপটা দাঁড়ায়, তাই হ'ল বার্টি—অর্থাৎ হারবার্ট—জনসন। জনসন আদিতে ছিল ঝাড়খণ্ডের অধিবাসী। ছোটবেলা থেকেই ক্রিশ্চিয়ান অরফ্যানেজে। মিশনারি সাহেবেরা ওকে পছন্দ করতেন। তাঁদের সুপারিশেই জামালপুর ওয়ার্কসপে কাজ শেখার সুযোগ পেয়েছিল; অবশেষে চাকরি।

ব্যক্তিগত চরিত্রের সুখ্যাতি জনসনের কখন ছিল না। নিজে যেমন সে অসুরের মতো খাটত কুলিদের খাটাতও তেমনি। ইঞ্জিনের খুঁটিনাটি কলকব্জা সব জনসনের জানা, ডাক্তারের কাছে যেমন মানবদেহ। কিন্তু তেমন মিশুক ছিলনা। বর্ণ গুণে না হোক ধর্ম গুণে সে হতে পারত ইউরোপীয়ান ইনষ্টিটিউটের মেম্বর। সেখানে অপরাহ্নে টেনিস খেলা চলে, সায়াহ্নে ব্রিজের টেবিল পড়ে। কিন্তু তাতে রুচি ছিল না জনসনের। সারা দিনের পর বাড়ি ফিরে খানসামা বেয়ারাগুলোকে যদৃচ্ছা গালাগাল করত; নিজের হাতে একটা বাগান করেছিল, ঝারি হাতে আপন হাতেই করত জলসেচন। তারপর বাংলোর সামনের দু' ফার্লং লম্বা ঝিলটা বারচারেক পারাপার করে, তবে তার শরীর স্নিগ্ধ হত। শনিবার দুপুরে দেখা যেত রোদ্দুরে বসে হুইল খুলে দিয়ে অসীম ধৈর্য নিয়ে বসে আছে জনসন। পাতলুনের কালির ছোপ ঢেকেছে কাদার প্রলেপে, বুকের রোমচুইয়েপড়া ঘামে জামাটা ভিজে উঠেছে, ভ্রূক্ষেপ নেই। পাশে রাখা চিনিমাখা পাঁউরুটি। মাঝে মাঝে পিঁপড়ে তাড়িয়ে একটু একটু করে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়। মাঝে মাঝে ফ্লাস্কখুলে একটু করে গলা ভেজায়। শেষে, যখন দিন পড়ে আসে, সূর্য দোল দিয়ে চলে আসে পশ্চিমে, অনেক দূরের কন্ট্রোলের কেবিনের পেছন দিয়ে গড়িয়ে পড়ে নিচে তখন জনসন ওঠে। বিকেলের ঝিরঝিরে হাওয়ায় ফাৎনাটা দুলছে, সেটাকে গুটিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। বাংলোর সমুখে কৃষ্ণচূড়ার ডালগুলো হোলিপ্রমত্তের মতো মাথা নাড়ছে। সেই প্রগাঢ় লাল রঙের দিকে তাকিয়ে মনের কোথায় তৃষ্ণা জমে ওঠে। ফ্লাস্ক খুলে অবশিষ্ট চাটুকু চক চক করে নিঃশেষ করে। কিন্তু সে তৃষ্ণা মেটে না চায়ে। ঘরে ফিরে এসে জনসন সেই পানীয় খুলে বসে যা সোডার অনুপানসহ সেব্য। আবার অভাবে শুধুও চলে।

শনিবারে রাত্রের মাত্রাটা স্বাভাবতই কিছু বেপরোয়া হয়। ঘুম

ভাঙে রবিবার সকালে গীর্জার ঘন্টায়। নিয়মিত বিরামের পর থেকে থেকে সেই আওয়াজ হাওয়ার সওয়ার হয়ে বাজে এসে কানে। তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নেয় জনসন। অতি অনিয়মিত জীবনে গীর্জার হাজিরাটাই ওর নিয়মিত। ধর্মের প্রতি বিশেষ কোন আকর্ষণ নেই। হয়ত বাংলার সমতলের এই গীর্জাটির কাছে এলে ওর বন্ধুর ছোটনাগপুরের আরেকটি গীর্জার কথা মনে পড়ে, যেখানে পাদ্রীসাহেবের স্নেহচ্ছায়ায় কেটেছে শৈশব।

কেবল একটি অপবাদ ছিল না জনসনের, নারীসম্পর্কিত। পি ডব্লিউ, ডি অফিসে গোটা দুই মেয়ে টাইপিষ্ট ছিল, আরবান গার্লস স্কুলের টীচার ছিল, চ্যারিটেবল হাসপাতালে নার্স ছিল। এরা সবাই খৃষ্টান। এদের আশে পাশে কখনও ঘুরতে দেখা যায়নি জনসনকে।

সেই জনসন যখন একদিন রবিবার প্রার্থনাসভান্তে প্রচারক কামিনী সরকারের বাসায় গেল, তখন ঈষৎ কানাকানি সুরু হল। বড় মীরা—যার ইংরিজী নাম মেরি—সে কলকাতায় কাজ করে। অতএব দ্বিতীয় মেয়ে রুচিকে লক্ষ্য করেই যে জনসনের প্রেমের চাঁদমারি চলেছে এ বিষয়ে কারুর সংশয় রইল না।

ওদের বাগ্‌দানের কথা ঘোষিত হল দু সপ্তাহের মধ্যে। সহরে সামান্য গুঞ্জন শোনা গেল, সে গুঞ্জন আশাভঙ্গের। বিয়ে হয় যদি হোক না, কিন্তু কানাকানি চলুক কিছুদিন, তারপর না। মজলিসী আলাপের মুখরোচক একটা বিষয়বস্তু ফসকে গেল। খাবার টেবিল থেকে নুনের বাটিটা হঠাৎ যেন উধাও হয়েছে।

সেই বিয়ের কথা মনে আছে শুভাশীষের আগাগোড়া সাদা একটি কাঁপানো পোষাক পরেছিলেন রুচিদি। সেই পোষাক পা অবধি ঢেকেও আরো অনেক খানি জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। পাদ্রী

সাহেব নিজে বিয়ে দিলেন। বিয়ের পর পাশাপাশি বয়কনে চলে গেল।

সেদিন জনসনের পাশে কত ছোট, অসহায় মনে হয়েছিল রুচিদিকে। ওই অসুরোপম লোকটার প্রতিটি পদক্ষেপ দৃপ্ত, নিশ্চিত। তার পাশে রুচিদি। জনসনের বাহু অবলম্বন করেও তাঁর পা পড়েছে অসমান ভাবে। রুচিদি যেন চলতে পারছেন না।

পারলেনও না। জনসন কারুর সঙ্গে মিশত না বলে লোক জানাজানি হতে কিছু দেরি হ'ল। কিন্তু তবু ব্যর্থ বিবাহের ছাপ লেখা রইল রুচিদির শুষ্ক কপোলে আর জনসনের কুঞ্চিত ভ্রূতে; সেটা লোকের সন্ধানী চোখ এড়াল না। ওরা রবিবারে রবিবারে একসঙ্গেই গীর্জায় আসত।

শুভাশীষ ননীকে জিজ্ঞাসা করলে, মারধোর করে বুঝি।

ননী বলল, না। রোজ রাত্রে মদ খায়। খেয়ে গান জুড়ে দেয়।

—দিক না।

—আরো আছে। ননী বলল, ওর একটা ভাঙা পিয়ানো আছে। দিদির ওপর হুকুম হ'ল ঐ গানের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বাজাতে হবে।

—বাজালেই পারেন।

—কর্কশ বিকট গলা, সে গানের না আছে অর্থ না সুর। যার সুরই নেই তার সঙ্গে মেলাবে কী করে। আবার বাজনা একটু ভুল হ'লেই চীৎকার করে গালাগাল দিতে সুরু করে। খানসামা বাবুর্চিগুলো ছুটে আসে। বাইরে দাঁড়িয়ে হাসে। সে গান সুরু হবে রাত দশটায়, চলবে একটা, ছুটো তিনটে অবধি। আর ছু'দিন থাকলে দিদি পাগল হয়ে যেত।

—আর কোন দিন ফিরে যাবেন না রুচিদি?

—উহুঁ। ননী বললে,—শুনছি ডিভোর্স করবে।

—ডিভোর্স কী?

—বিয়ে ছাড়াছাড়ি আর কি। মুসলমানেরা যাকে বলে তালাক।

বিয়ে যে বিচ্ছেদ হতে পারে, এ তথ্য শুভাশীষের অভিজ্ঞতায় ছিল না। বিস্ময়ে চেয়ে রইল।

ননী বলল, তোদের, হিন্দুদের মধ্যে হয় না। আমাদের, খৃষ্টানদের, ওখানেই সুবিধে।

বিবাহবিচ্ছেদ? শুভাশীষের চিন্তার পথ অন্যদিকে ঘুরে গেল। হিন্দুদের মধ্যে হয় না। হয়ত হয়, ননী জানে না। যদি কোন ব্যবস্থা থাকত, তবে শুভাশীষ ছিনিয়ে আনত সুরমাকে। ছোট মাসিকে। এখানেই থেকে যেত ছোটমাসি। রোজ ওকে একটা করে টাকা দিত। আর শ্বশুরবাড়ি যেতে হ'ত না।

শুভাশীষ একবার ভাবল, মাকে জিজ্ঞাসা করবে ছোটমাসির ডিভোর্স হয় কিনা। কিন্তু সাহস হ'ল না। আগে রুচিদিরটাই হয়ে যাক না। পরে হয়ত মার নিজেরই খেয়াল হবে।

রুচিদির কিন্তু ডিভোর্স হ'ল না। কী কী ঘটল ঠিক মনে নেই। ঠিক বোঝেওনি। এইটুকু মনে আছে, দু'জন হস্তক্ষেপ করে মধ্যস্থতা করেছিলেন—পাদ্রীসাহেব আর রুস্তমজি।

রুস্তমজি রেলওয়ে এনজিনীয়র। ওভার ব্রীজ পার হয়ে শহরের দিকে যেতে প্রথমেই তাঁর বাংলো। পার্শি সাহেব। টুকটুকে গায়ের রঙ, সমুন্নত দেহ। চল্লিশ পেরিয়ে চুলে একটু রুপোলি রঙের ছিটে লেগেছে। হাতে ছড়ি আর ঠোঁটে পাইপ লাগিয়ে রুস্তমজি সাহেব যখন রাস্তা

দিয়ে চলতেন তখন সসম্ভ্রমে লোকগুলো দু'পাশে সার দিয়ে দাঁড়াত। খেলা ধুলা, সামাজিকতায় রুস্তমজির উৎসাহ ছিল প্রচুর। রেলওয়ের খানিকটা জমি তিনি স্থানীয় টাউন ক্লাবকে ফুটবল খেলার জন্যে ছেড়ে দিয়েছিলেন। ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউটের সংলগ্ন অভিনয় মঞ্চ তাঁরই উদ্যোগে এবং আনুকূল্যে, তৈরি।

সন্ধ্যার পর রুস্তমজির বাংলোয় বিজলি আলো জ্বলত এ শহরে তা অভিনব এবং সেই প্রথম। নিজের বাড়িতেই একটা ডায়নামো বসিয়েছিলেন। কালীপুজোর দিন ঘটা করে রুস্তমজি বাজি পোড়াতেন, আলোয় আলোয় বাংলোখানাকে স্বপ্নপুরী করে তুলতেন।

পার্শির বাড়িতে কালীপুজো। ব্যাপারটা অসাধারণ সন্দেহ নেই। তার কারণ ছিল। সেই কারণ হাজারি, অর্থাৎ মিসেস রুস্তমজি। বলা বাহুল্য, হাজারির জন্ম উচ্চকুলে নয়। তার মা বাতাসী এক সময় শুভাশীষদের বাড়ি ঝিয়ের কাজ করেছে। কালো কুচকুচে রঙ, কিন্তু বাতাসীর স্বাস্থ্য ছিল পরিপূর্ণ। একদিন সে উধাও হ'ল। এ সব মেয়েদের কীর্তিতে সচরাচর কারুর ভ্রূক্ষেপ হয় না। চিমটি কাটার ব্যথার মত একটু চমকে উঠে মুহূর্তেই ভুলে যায়। বাতাসীকেও লোকে ভুলে গেল।

দু'বছর বাদে বাতাসী যখন ফিরে এল, তখন আর তাকে ভুলে থাকা সম্ভব হ'ল না কারুর। বাতাসীর কোলে তখন হাজারি। ফুটফুটে মেয়ে; সোনালী, ফুর ফুরে চুলগুলো ওর উড়ে উড়ে পিঙ্গল চোখে ছায়া ফেলছে।

শোনা গেল বাতাসী এখান থেকে গিয়েছিল এক চা বাগানে, সেই সুদূর আসামে। চা বাগানের সাহেবরা কুলিদের বেত মারেন এবং বেতন কাটেন বটে, কিন্তু কামিনদের মাঝে মাঝে বখশিশ করেন,—জলজ্যান্ত একটি শিশু। তেমনি একটা শিশু এই হাজারি। হাজারি

কোলে আসবার পর থেকেই বাতাসীর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ল। মাঝে মাঝে জ্বর হতে লাগল। আসামের জ্বর। সেই জ্বর যখন ছাড়ল না তখন সাহেবই তাকে ছাড়লেন। জনশ্রুতি, হাজার টাকা সঙ্গে নিয়ে ফিরে এসেছিল বাতাসী।

এসব শুভাশীষ পরে শুনছে। বাতাসী ফিরে এসে আর কারুর বাড়ি কাজ নিল না। ছোটখাট একখানা ঘর তুলে একাই বাস করতে লাগল।

বাতাসী এখন আর নেই, কিন্তু সেই হাজারিই এখন রুস্তমজির ঘর আলো করেছে। রুস্তমজি রুচিমান। স্ত্রী রত্ন দুষ্কুল থেকে আহরণ করেছেন অসঙ্কোচে। তাকে গৃহিণীর পূর্ণ মর্যাদায় বসিয়েছেন আপন গৃহে। বিয়ে করেছেন কিনা সেবিষয়ে লোকের মতদ্বৈধ আছে। কেউ বলেন একবার হাজারিকে নিয়ে বম্বে গিয়েছিলেন রুস্তমজি। সেখানেই শাস্ত্রমতে তাকে বিয়ে করেছেন। আবার অনেকের সন্দেহ, রুস্তমজি হাজারির সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা সামাজিক কোন লোকাচারে বাঁধেননি। কিন্তু তবু, লৌকিক পরিচয়ে হাজারি মিসেস রুস্তমজি। সাহেবের হাত ধরে সে সর্বত্র যাচ্ছে, ক্লাবে, পার্টিতে, থিয়েটারে। বাতাসী ঝির মেয়ের জন্যে সর্বত্রই সাদর অভ্যর্থনা।

যাই হোক, রুস্তমজি মধ্যস্থতা করলেন। ফোরম্যান জনসনকে ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এসব কী শুনছি। রুচিকে তুমি পরিত্যাগ করতে চাও?

—আমি না স্যার। সেই আমাকে ছেড়ে গেছে।

—তুমি অত্যাচার করতে?

জনসন অস্বীকার করল। ওর একটু গান বাজনার দিকে আসক্তি আছে, স্ত্রী সেটা চায় না। পুওর্ গার্ল, টু ম্যাটার-অব-ফ্যাক্ট টু বি এ্যান আর্টিস্ট্স্ ওয়াইফ।

—আর্টিষ্ট ? রুস্তমজি এবারে হেসে ফেললেন। লোকোশেডের ফোরম্যান আর্টিষ্ট, এর চেয়ে কাবুলিওয়ালারা পৃথিবীতে সেরা প্রেমিক একথা বিশ্বাস করা সহজ। আইভ্‌ সুনার বিলিভ্‌ কাবুলীজ আর দি মোস্ট্‌ চার্মিং লভার্স টু। শোন জনসন, তুমি আর্টিষ্ট ফার্টিষ্ট নও বাপু। তুমি হলে স্রেফ মিস্ত্রি—বয়লার, ফার্নেস নিয়ে তোমার কারবার। লোহা পেটানো হাতে কি পিয়ানো বাজে, কুলি খাটানো গলায় কি ওঠে গান।

জনসন অত্যন্ত আহত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। ডোণ্ট সে সো স্যার। আই লাভ্‌ মিউজিক।

—স্বচ্ছন্দে। রুস্তমজি বললেন, ইউ হ্যাভ এভ্‌রি রাইট্‌ টু। কিন্তু সেটা অপরের ওপর ইনফ্লিক্ট করতে চেয়ো না, এ্যাণ্ড সার্টেনলি নট অন ওয়াইফ। আর, স্থির মর্মস্পর্শী দৃষ্টিতে জনসনের দিকে তাকিয়ে রুস্তমজি বললেন তোমাকে ড্রিঙ্ক করা কমাতে হবে। লেস লভ্‌ ফর এ্যালকোহল, মোর ফর ইয়োর ওয়াইফ। তোমার পিয়ানোটাও বেচে দিতে হবে। ওটাকে নিয়েই যত দাম্পত্য কলহের সৃষ্টি। ওটাকে বিদায় দাও। নীলামের ব্যবস্থা আমি করব।

ভয়ার্ত কণ্ঠে জনসন চেঁচিয়ে উঠল,—ইউ কাণ্ট ডু দ্যাট স্যার।

—আই ক্যান, রুস্তমজি আস্তে আস্তে কথাগুলো উচ্চারণ করলেন,—এ্যাণ্ড আই উইল্‌।

টুপিটা তুলে নিয়ে জনসন নিষ্ক্রান্ত হ'ল।

ওদিকে পাদ্রী সাহেব রুচিকে ডেকে স্নেহের সুরে ধমক দিচ্ছেন, ডিভোর্স করতে চাও ? এক বছর না পুরতেই ছাড়তে চাও তাকে, যাকে আমৃত্যু আপনার করবে বলে শপথ নিয়েছিলে,—টিল ডেথ্‌ আস ডু পার্ট ?

শেষ পর্যন্ত রুচি আবার জনসনের বাংলোয় ফিরে এল। পিয়ানোটা

নীলাম হ'ল সস্তায়। সেই টাকাটা সবাই বেরিয়ে যেতে জনসন ছুঁড়ে মারলে রুচির মুখে। টেক ইট উওম্যান। এবারে খুশি?

হাউ ড্রেড্‌ফুল! ভাবলে রুচি।

আর জনসন ভাবলে, ড্রেড্‌ফুল উওম্যান। হ্যাজ নো প্যাশন ফর মিউজিক।

কিন্তু মুখে ওরা কেউ কিছু বললে না। চাকর খানসামা মালিরা ক'দিন উৎকর্ণ হয়ে রইল, সাহেব মেমসা'বের ঝগড়া শোনবার জন্যে। কিন্তু তাদের নিরাশ হতে হ'ল। খাবার টেবিলে বসে ওরা পরস্পরকে খাবার এগিয়ে দিচ্ছে, কেক্ কেটে দিচ্ছে পরস্পরের; এমন কি বিকেলে চাও খাচ্ছে বাগানে বসে একসঙ্গে।

ক'দিন বাদে রুস্তমজি সাহেব একদিন বিকেলে বেড়াতে এলেন। জনসন ছিল না। রুচি অভ্যর্থনা করলে।

ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে রুস্তমজি বললেন, বসব না। ক্লাবে যাচ্ছিলুম। ভাবলুম এই পথটা একটু ঘুরে যাই। তারপর? আপাদমস্তক রুচিকে একবার দেখে নিয়ে বললেন, সব ঠিক আছে? গোলমাল নেই?

মাথা নেড়ে মৃদুকণ্ঠে রুচি বললে, না।

--এই তো চাই। খুসি হয়ে রুস্তমজি নিবে আসা পাইপে আবার অগ্নি সংযোগ করলেন। হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, গান-টান আর করে না তো?

লজ্জিত মুখে হেসে রুচি জানালে, না।

রাস্তায় এসে রুস্তমজি মনের আনন্দে শিষ দিলেন বার দু'য়েক। মনে অপরিসীম আত্মপ্রসাদ। দু'টি চৌড় খাওয়া জীবনকে আবার

জোড়া দিয়েছেন তিনি। ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে রেললাইনের পাশের রাস্তা ধরে এগিয়ে এলেন। পুরনো লেভেল ক্রশিংটার ধারে পরিত্যক্ত একটা গুম্‌টির ঘর ছিল অনেক দিন ধরে। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। ডিস্‌ট্যান্ট সিগনালের সাদা আলোটাকে দূর থেকে মনে হয় আকাশের তারার সহোদর।

রুস্তমজি থম্‌কে দাঁড়ালেন। না তাঁর ভুল হয়নি। সঙ্গীতই তো। ইঞ্জিনের বাঁশী, মালগাড়ীর শান্টিংয়ের শব্দ ছাপিয়েও সেটা শোনা যাচ্ছে। উৎস ওই গুম্‌টিঘরটার ভেতরে, তাতে ভুল নেই। ভুতুড়ে ব্যাপার নয় তো। রুস্তমজি পা টিপে এগিয়ে গেলেন। দরজাটা বাইরে থেকে অল্প একটু ঠেলতেই খুলে গেল। ভেতরে কোন খিল ছিল না।

এতখানি বিস্ময়ের জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না রুস্তমজি। সেই চার ফুট বাই ছ' ফুট অপরিসর ঘরখানা জুড়ে মস্ত একটা পিয়ানো। আর তার সমুখে বসে যে লোকটা একাগ্রচিত্তে সেটা বাজিয়ে চলেছে, তার হাতে কালি, মুখে কালি, ঘামে চটচটে হয়ে সেই কালি গড়াচ্ছে চোয়াল চুইয়ে।

—জনসন। রুস্তমজি তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ডাকলেন। বিরক্তিতে কপালের সব ক'টি রেখা তাঁর কুঞ্চিত হয়ে উঠল।

জনসন চমকে উঠলো একবার। তারপর আস্তে আস্তে আসন ছেড়ে উঠে বাইরে এল। কালিমাখা হাতখানাই বাড়িয়ে দিল রুস্তমজির দিকে।

রুস্তমজি হাতটা সরিয়ে নিলেন।

—পিয়ানো পেলে কোথায়?

পিয়ানোটা, জনসন বললে, সে ফিরে নিয়েছে আবার, নীলামে যে নিয়েছিল, তার কাছ থেকেই ডবল দামে। ওটাকে ছাড়া থাকতে পারব না আর, আর্টিষ্ট মানুষ। এবারে তো এখানে রেখেছি।

নির্জন জায়গা। বাড়িতে রাখলে স্ত্রী যখন ডিস্টারবড্ বোধ করেন।

দুরারোগ্য ব্যাধি, রুস্তমজি ভাবলেন। কঠিন স্বরে বললেন, জানো তুমি চুক্তিভঙ্গ করেছ, ব্রীচ্ অব কনট্রাক্ট। তা ছাড়া এটা রেলওয়ে প্রপার্টি;—দিস ইজ ট্রেস্পাস টু।

ইচ্ছে করলে রুস্তমজি অনেক কিছু করতে পারতেন। জনসনকে খারাপ কোন জায়গায় বদলি, কিম্বা আরো কোন কঠোর বিভাগীয় শাস্তি। কিন্তু কেমন যেন মমতা হ'ল। লাইনের একটা পাথর পড়েছিল পথে, জুতোর এক ধাক্কায় সেটাকে পগার পার করলেন। তারপর আস্তে আস্তে চলে এলেন।

সেই সময় একবার ননীর সঙ্গে রুচিদির বাসায় বেড়াতে গিয়েছিল শুভাশীষ। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে, অন্ধকার বাংলো। বাইরের গেটটা খুলতেই একটা কুকুর এল তাড়া করে।

—জিমি, জিমি—অন্ধকার বারন্দা থেকে চীৎকার করে কে যেন কুকুরটাকে ভৎ'সনা করল। কুকুরটা সামনে এসে সন্দিগ্ধ চোখে আগন্তুকদের চরিত্র যাচাই করছে, এমন সময় সেই মঠের অধিকারিনী নিজেই এলেন।

রুচিদি!

ননী আর শুভাশীষের দিকে তাকিয়ে বললেন, ওঃ তোমরা! এসো। কুকুরটাকে আদেশ করলেন,—যা-ও।

অন্ধকার বারন্দা পেরিয়ে ওরা বসবার ঘরে এল। সে-ঘরের দেওয়ালে মিটি মিটি একটা আলো জ্বলছিল। সেই আলোর ছায়ায় বিপরীত দিকের দেয়ালে, শুভাশীষ দেখতে পেল, ওর মাথাটা শতগুণ স্ফীত হয়ে দানবীয় আকৃতি নিয়েছে।

এদিক ওদিক তাকিয়ে শুভাশীষ বললে, সাহেব নেই।

—এ সময়ে কখনো থাকে না তো। আসবে সেই রাত বারোটায়। একটু থেমে রুচিদি বললেন,—কিম্বা একটায়। কিম্বা দু'টোয়। কিম্বা—

—ততক্ষণ একা থাকেন আপনি?

রুচিদি অল্প একটু হাসলেন মাত্র। কোন জবাব দিলেন না।

খানিক পরে বললেন, ঠিক একা নয়। বই পড়ি, বাইবেল।

—বাইবেল?

—হ্যাঁ। ইজনট্‌ এ ও'ণ্ডাফুল বুক? ছোটবেলা থেকে শুভাশীষ শুনে এসেছে, বাইবেল হোলি। বাইবেল যে ইণ্টারেষ্টিং বা ওয়াণ্ডারফুল, একথা শুনলে এই প্রথম।

রুচিদি বললেন, তা' ছাড়া আমার আরো সাথী আছে। আই নেভা ফীল লোনলী। ওই আলমারিটার মধ্যে আমার সাথীদের লুকিয়ে রেখেছি।

নিষ্প্রভ আলোয় রুচিদির চোখ দু'টো ঈষৎ ঘোলাটে দেখাচ্ছে। অল্প অল্প হাত কাঁপছেও যেন মনে হ'ল। উঁচু আলমারি, স্বচ্ছন্দে ওর মধ্যে দু'জনকে পুরে রাখা যায়।

শুভাশীষ ঘেমে উঠল। রহস্য করছেন না তো রুচিদি? বোধ হয় না। আলমারির মধ্যে দম বন্ধ হয়ে ওরা মরে যাবে না তো?

রুচিদি হাসলেন। এবার একটু শব্দ করে। খিল খিল করে সেই হাসি ছড়িয়ে পড়ল স্তব্ধ হাওয়ায়, শিলিংয়ে, স্কাইলাইটে। দেয়ালে ক্রুশবিদ্ধ যীশুর ছবিটা একটু কেঁপে উঠল যেন।

—ওরা মরে না। রুচিদি হাসি থামিয়ে অদ্ভুত গলায় বললেন, বরং আমাকে জীবন দেয়।

ননীর হাত ধরে দ্রুত বেরিয়ে এসেছিল মনে আছে। রাস্তায় এসে ননী বলল, ভয় পেয়েছিলি? দিদি আজ মদ খেয়েছে।

—মদ?

অদ্ভুত বোকা আর ভারি সরল এই ননী। সব কথা বলে দেয়।

হ্যাঁ। ক'দিন ধরেই খাচ্ছে। আমি টের পেয়েছি। আমি আসতেই আরেক দিন আলমারিটাতে সব লুকিয়ে ফেলেছিল।

ওভার ব্রীজটার নিচ দিয়ে সাতটার প্যাসেঞ্জারটা ছিটকে বেরিয়ে গেল; তক্তাগুলো কাঁপছে থর থর করে। কালো কালো ধোঁয়ায় নিঃশ্বাস এল বন্ধ হয়ে। কয়লার গুঁড়ো ছড়িয়ে পড়ল জামায়, চুলে প্যান্টে। হুইসিলের আওয়াজ নিষ্ঠুর একটা ছুরির মতো স্তব্ধতার কলজে ছিঁড়ে দ্বিখণ্ডিত করে দিয়ে গেল।

রেলিংটা ধরে শুভাশীষ একটু সাম্‌লে নিলে। বাইবেল আর মদ! ধর্মপ্রচারকের মেয়ে রুচিদি নিঃসঙ্গতা লাঘব করবার উপকরণ আবিষ্কার করেছেন মন্দ নয়।

দাদুর সঙ্গে ফিরছিল পোষ্ট-অফিস থেকে। দিন পোনের পরের কথা। দেখল, অনেক লোক ছুটছে পূব দিকের ক্যাবিনটার দিকে। কী ব্যাপার, না মানুষ চাপা পড়েছে একটা।

রেলে চাপা পড়া নতুন ব্যাপার কিছু নয়। প্রায়ই গরু, ছাগল ইত্যাদি কাটা পড়ে, মাঝে মাঝে মানুষও। এবারে কে চাপা পড়ল? আবার কে, লোকোশেডের ফোরম্যান বাটি জনসন। নাবিক যেমন মরে সমুদ্রে, সৈনিক যুদ্ধে, রেলকর্মচারী জনসন তেমনি প্রাণ দিয়েছে লাইনের তলায়।

মাঝ রাতে পুরনো গুমটি ঘরে পিয়ানো বাজিয়ে বুঝি ফিরছিল। শেষ রাত্রের পার্শেল এক্সপ্রেসটা সঙ্গীত সাধনার ওপর নিষ্ঠুর, অতর্কিত একটা যতি টেনে দিয়েছে।

থেঁথ্‌লানো ধড়টা ছিল রক্তাক্ত দু'টো স্লিপারের মাঝ খানে, পাথরের শরশয্যায়। মাথাটা ছিটকে পড়েছে টেলিগ্রাফ পোষ্টটার গায়ে। যার গায়ে শাদা রঙে কলকাতা থেকে দূরত্বের নির্দেশ আছে: ১৪০।১৯।

রুস্তমজি এলেন। এলেন রেলওয়ে হাসপাতালের ডাক্তার, আর-জি-আর-পি তকমা আঁটা সিপাই। ট্রলিতে করে জনসনের দেহটা নিয়ে যাওয়া হ'ল মড়াকাটা ঘরে, সেই গীর্জা পেরিয়ে ওয়েই ক্যাবিনটার ধারে, পাটক্ষেতের ধারে।

তারপর বাংলোয় ফিরিয়ে আনা হ'ল সেই দেহ। পাদ্রী সাহেব শেষ কৃত্য করলেন। নতুন কফিনটা মিস্ত্রীরা ইতিমধ্যেই তৈরি করেছিল। দাঁড়িয়ে থেকে সব দেখলেন রুচিদি। সাদা মুখখানা, ভাবলেশ-শূন্য, রেখাহীন। পদব্রজে শবানুগমন করলেন সকলে।

সব চুকে যেতে আবার মিশনে রুচিদি ফিরে এলেন। শাদা পোষাক পরে একদিন জনসনের হাত ধরে মিশন থেকে বেরিয়েছিলেন, আজ ফিরলেন কালো পোষাক পরে। রুচিদি বিধবা।

চোখে এতটুকু জল নেই রুচিদির, কিম্বা আচার ব্যবহারে কোন বৈলক্ষণ্য। নিজে যে বিবাহ একদিন বিচ্ছেদ করতে চেয়েছিলেন, আজ ঈশ্বরই তা ঘটিয়ে দিলেন। টিল ডেথ্‌ ডু আস পার্ট। বৈধব্যকে স্বাভাবিক ভাবেই গ্রহণ করলেন রুচিদি। যে আড়ষ্টতা অস্বাচ্ছন্দ্য এসেছিল আস্তে আস্তে তা যেন কেটে যাচ্ছে।

একটু একটু করে মরে যাচ্ছিলেন, বৈধব্যের ভেতর দিয়ে আবার যেন সঞ্জীবিত হয়ে উঠলেন।

ছোটমাসি বিধবা হয় না? এই চিন্তাটা বার বার আসছিল শুভাশীষের মনে, বার বার সে সঙ্কুচিত হয়ে কথাটা ভুলে থাকতে চেষ্টা করছিল। ছোটমাসির বিয়েও তো সুখের হয়নি। বিধবা হয়ে কেমন দেখাবে ছোট-মাসিকে, রুচিদির মতো নয়, কেননা রুচিদি সাদা কাপড় পরেন না। বড় মাসিমার মতো? কিন্তু বড়ো মাসিমা বয়সে অনেক বড় যে। তবে কার মতো, শুভাশীষ ভাবতে লাগল; শেষে সিদ্ধান্ত করল, বিধবা হলে ছোটমাসিকে হয়ত সরমাদির মতো দেখাবে।

চার

সেই যে চুপি চুপি চলে এসেছিল চক্রবর্তীদের বাড়ি থেকে জ্যৈষ্ঠের দুপুরে, তারপর কিছুদিন আর শুভাশীষ ওমুখো হয়নি। আরো আশ্চর্য, বাড়িতে একটি কথাও বলেনি। চারুও ওর পেছন পেছন এসেছিল। পা টিপে টিপে বাড়ি ঢুকেছিল, কাঁদো-কাঁদো মুখে দাঁড়িয়েছিল মার সমুখে।

মা চারুকে আর কোন প্রশ্ন করেন নি। সোজা উঠে এসে একটা চড় বসিয়েছিলেন। একে তো রোদ্দুরে-ছুটে-আসা মুখখানা টকটকে চারুর, মার খেয়ে তাতে নতুন কোন দাগ পড়ল না। খালি চোখ দু'টো একবার ছল ছল করে উঠল।

চারু জানত না, শুভাশীষ কতটা জেনেছে, বাড়িতেই বা বলেছে কতখানি। শুভাশীষ প্রথম যখন বললে কিছুই বলেনি, বিশ্বাস করলে না।

শুভাশীষ দিব্যি করলে। তোকে ছুঁয়ে বলছি দিদি, কিছু বলিনি।

—বল মাইরি?

শুভাশীষ বললে, মাইরি। যদিও জানত কথাটা খারাপ। বলা বারণ।

চারু কতকটা নিশ্চিন্ত হ'ল। তবু কিছুদিন চোখে চোখে রাখলে শুভাশীষকে। সন্দেহ ঘুচল না। কে জানে কতটা দেখেছে ছেলেটা। ওকে হাতে রাখা ভালো।

হাতে রাখার বিশেষ কোন উপায় জানা নেই চারুর। তবু মা যদি মোয়াটা দেন, আধখানা রেখে দেয় শুভাশীষের জন্যে। একটা রুমালে ফুল তুলে দিলে শুভাশীষকে।

দুপুর বেলা হতেই কিন্তু চারু আবার উসখুস করতে লাগল। অকারণেই শাড়িটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরে, চুলগুলো ঠিক করে নেয়, মনে হয় বেরুবে বুঝি। কিন্তু চারু উঠানে গিয়ে বসে মার পাশে। কুলের আচার একটু দেখে বলে, এখানে ছায়া পড়েছে। এগুলো রোদ্দুরে দিয়ে আসব মা?

মা বলেন, দে। তা হলে তো বাঁচি।

রোদ্দুরে দিয়ে এসে আবার মার পাশে এসে বসে চারু। মার মনটা একটু প্রসন্ন হয়ে ওঠে। আহা, দেখতে দেখতে বড়ো হয়ে উঠেছে মেয়েটা মাচার লাউয়ের লতার মত। দু'দিন বাদে হয়ত শ্বশুরবাড়ি যাবে। আস্তে আস্তে চারুকে মা কাছে টেনে নেন। আয় তোর মাথার উকুন বেছে দিই।

—আমার মাথায় উকুন নেই মা।

—কে বলে নেই। ঈষ, তোর মাথায় কী ময়লা চারু। এত

যে সাবান মাখিস সে কি কেবল মুখে, গলায়, ঘাড়ে? মাথায় একটু সাবান দিতে পারিসনে?

স্পর্শসুখে চারুর চোখ দু'টো বুজে এসেছিল। আধো আধো গলায় বললে, মা।

—কী রে।

—একটু যাব মা, সরমাদির ওখানে? একটা নতুন সেলাই শিখে আসব?

মা এবার আর বারণ করতে পারলেন না। যাবি? যা। শুভাশীষকে সঙ্গে নিয়ে কিন্তু।

দরজা ভেজিয়ে সরমাদি মেজের আঁচল বিছিয়ে ঘুমুচ্ছিলেন। কী মসৃন, ধবধবে পিঠ সরমাদির। অসতর্ক উন্মুক্ত পা দু'টি সাদা' দু'টি কৌমুদীর মত। উঠে বসে চোখ রগড়াতে রগড়াতে সরমাদি বললেন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। টুকটুকে ঠোঁট দু'টিতে হেসে হেসে বললেন, কী দেখছ ভাই, অবাক হয়ে? পান খেয়েছি? আজ শাশুড়ী বুড়ি জ্বর হয়ে ওঘরে পড়ে আছে। তাই একটা সেজে খেলুম। বিকেলে পা ধুয়ে ওঘরে যাব। তুমি একটা পান খাবে ভাই?

—আমি পান খাই না। শুভাশীষ বললে।

—খাওনা, পান খেতে দোষ কী। খুব ভালো মশলা দিয়েছি। জৈত্রী, জায়ফল—নে চারু একটা খা। বলতে বলতে সরমাদি আর কোন বারণ শুনলেন না, শুভাশীষকে কাছে টেনে নিলেন, বাঁ হাতে ওর চিবুকটা তুলে ধরে ডান হাতে একটা পান মুখে গুঁজে দিলেন।

শুভাশীষের মাথা ঘুরছিল। কতক্ষণ বিবশ হয়ে সরমাদি'র কবোষ্ণ বুকে মাথা রেখে বেহুঁশ হয়েছিল, ঠিক নেই। সমস্ত শরীরটা কাঠের মত কঠিন, নিঃস্পন্দ। থর থর হাত দু'টো সরমাকে আঁকড়ে আছে।

উচ্চচ্চ নাগালাতীত ডালে পরিপক্ক ফলের দিকে ঘাড় তুলে লোকে যেমন অসহায় দৃষ্টিতে তাকায়, তেমনি ভাবে সরমার পরমাশ্চর্য মুখের দিকে তাকিয়ে শুভাশীষ বললে, আমার মাথা ঘুরছে সরমাদি।

মাথা ঘুরছে? তোমার পানে জর্দা তো দিইনি? তারপর আশ্বাস-স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন, পান এই প্রথম খেলে নয়? প্রথম খেলে মাথা একটু ঘোরে। তুমি বরং ওঘরে গিয়ে মাদুরটায় একটু শোও, কেমন?

ভাঁড়ার ঘরের তক্তপোষের ওপর কতক্ষণ ঘুমিয়েছিল মনে নেই বিকেলে রোদ ঘরে এসে পড়তে ঘুম ভাঙল। আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে সরমাদির বন্ধ ঘরের দরজায় করাঘাত করে ডাকলে, দিদি।

দরজা খুলে দিলেন সরমাদি।

—চারুতো চলে গেছে ভাই?

—চলে গেছে? আমাকে না ডেকেই?

—তুমি ঘুমুচ্ছিলে, তাই আর বিরক্ত করেনি।

কিন্তু এ কি বেশ, সরমাদির! প্রগাঢ় রঙিন একটা শাড়ী পরণে, ঘোমটাটা সাপের ফণার মত। দু' হাতের কনুই অবধি চুড়িতে ঢেকে ফেলেছেন। কানে দুল, কপোল অবধি গড়িয়ে পড়া দু' ফোঁটা রক্তের মত, তাতে সরু, দীর্ঘ দুটি রক্তিম পাথর বসানো।

—এস, ভেতরে এস।

মন্ত্রমুগ্ধের মত শুভাশীষ ঘরে ঢুকল। সরমাদি আবার দরজাটা বন্ধ করলেন।

—আমাকে কেমন দেখাচ্ছে ভাই? এটা আমার বিয়ের সময়কার

সাজ। খুব কি বুড়ি হয়ে পড়েছি আমি ? তুমিই বল, আমার কি সাধ আহ্লাদ এখনি ফুরিয়ে যাবার কথা। চারুর চেয়ে কতইবা বড় আমি।

—আমি আবার বিয়ে করব। ধীর অকম্পিত, সরমাদির সেই স্পষ্ট উচ্চারণ ভঙ্গি এখনও কানে বাজে। —কেনই বা করব না। একবার বিয়ে হয়েছিল বলে? বিধবা হয়েছি বলে? কিন্তু কে বলে আমি বিধবা। আমার চোখের দিকে তাকিয়ে দেখ আমি এখনও কুমারী।

পায়ের কাছে স্তূপীকৃত নরুণ পেড়ে ধুতি আর সাদা সেমিজটার দিকে ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে সরমাদি বললেন, ওগুলো আমার খোলস। আজ নিজের বেশে বেরিয়ে এসেছি।

থর থর করে কাঁপছে শুভাশীষ, কাঁপছে সরমাও। আজ কী খেয়াল হয়েছে সরমার, অবোধ একটি কিশোরের কাছে ওর এত দিনের সঞ্চিত জ্বালা উজাড় করে দিতে চাইছে। চাটাইয়ের বেড়া ঘেরা এই শ্বশুরালয়কে মনে হচ্ছে পিঞ্জর। কারা এরা, কী সম্পর্ক এদের সঙ্গে তার। এবাড়ির ছেলে বিমলের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল? সদর সেরেস্তার কেরাণী, স্বাস্থ্যহীন সেই ক্ষীণকায় লোকটির মুখখানাও সরমার ভালো মনে নেই। মাস কয়েক একই শয্যায় শুয়েছিল বলেই কি চিরকালের মত সরমা তার হয়ে গেছে, মৃত্যুর পরেও? ক্ষণকালের জন্য আছন্ন করে ফেলেছিল, এই যুক্তিতেই রাহুর কায়েমি দাবি চাঁদের ওপর? সরমার জীবন পাত্রে সেই লোকটা একবার চুমুক দিয়েছে, সন্দেহ নেই, কিন্তু কতটুকু পান করেছে সে সরমার এই অনিঃশেষ উচ্ছলতার, প্রাণময়, বিদ্যুন্ময়, ঔজ্জ্বল্য অস্তিত্বের?

সরমা আবার বিয়ে করবে।

বেলা গড়িয়ে এসেছিল। ওঘর থেকে বুড়ির গলা শোনা গেল; চিঁ চিঁ করে ডাকছে। ও বৌমা, একটু জল দিয়ে যা ওগো।

শুভাশীষের সম্মুখেই পায়ের কাছ থেকে নরুণ পেড়ে ধুতিটা কুড়িয়ে নিলে সরমা। তুমি একটু চোখ বোঁজ তো ভাই, আমি আবার খোলস পরব।

বরাবরই চোখ বুঁজে ছিল একথা শুভাশীষ দিব্যি করে বলতে পারবে না। কপালে অল্প অল্প ঘাম দেখা দিল। খসে পড়ল বেনারসী লাল চেলি, সিলকের ব্লাউজ, ফুলতোলা শায়া। চোখ যখন খুললে, তখন আবার মোটা লংক্লথের সেমিজ আর শাদা ধুতি পরে সরমাদি সম্মুখে দেখা দিয়েছেন। জিভ দিয়ে চেটে চেটে তুলে ফেলেছেন ঠোঁটের তাম্বুলরাগ।

খামে বন্ধ একখানা চিঠি ওর হাতে দিলেন সরমাদি। এটা ডাকে দিয়ো ভাই।

চিঠিতে কলকাতার ঠিকানা লেখা। সরমাদি বললেন, দাদাকে লিখেছি। আমি এখান থেকে চলে যাব।

কবে, সরমাদি, কবে?

থানপরা সরমাদিকে এখন বরফের মত ঠাণ্ডা মনে হয়। শান্ত নিস্তেজ গলায় বললেন, যেদিন পারি। যত শীগ্‌গির পারি।

ভেবেছিল, চারুকে জিজ্ঞাসা করবে কখন এল। শুভাশীষকে ফেলে এলই বা কেন।

কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে গলা আটকে এল. কেননা এরই সঙ্গে

জড়ান আছে আজকের বিকালের সেই আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। মাথা তো শুধু পান খেয়েই ঘোরেনি, সরমাদির সেই বিস্ময়কর বেশবদলেও ঘুরেছে।

পরে অনেকবার ভেবেছে, এই সঙ্কোচের কারণ কি। কেন সেদিনের কথা মনে পড়লেই উত্তেজনা আসে, কান দু'টো লাল হয়ে ওঠে। মা মাসিমা দাদু দিদিকে নিয়ে যে জগৎ আছে, যার অনুভূতি স্বতন্ত্র, সেটা বুঝতে পারছে ক্রমে। অন্ধ খোলস ভেঙে বেরিয়ে এসেছে অনুভূতির পাখি। এর পরিচয় মার কাছে আবদারে, দাদুর কাছে আদরে, দিদির কাছে বকুনিতে নয়। এর স্বাক্ষর আছে হৃদস্পন্দনে, স্নায়ুপেশীর আকস্মিক কাঠিন্যে, কপোলের রক্তোচ্ছ্বাসে, বুঝিবা কখন কখন ভিজে চোখের পাতায়।

নিজের কাছেই নিজেকে কেমন সংকুচিত মনে হয়; সবখানি জানে না, একটু খানি জেনে ফেলার অপরাধে অপরাধী মনে হয়।

পরদিন সরমাদিকে বাসায় দেখে শুভাশীষ অবাক হয়ে গেল। কোথা থেকে দুর্বোধ্য একটা লজ্জা এল, ছুটে পালাতে চাইল সেখান থেকে।

কিন্তু মা ডাকলেন। খোকা শোন্। কৃষ্ণ যাত্রা এসেছে মণ্ডপঘর থেকে। সরমা যেতে চাইছে আমাকে নিয়ে। কিন্তু আমার তো যাওয়া হবে না। তুই বরং তোর মাসিমা আর সরমাদিকে নিয়ে যা, কেমন? পারবি না?

পারবে না আবার। শুভাশীষ কি পুরুষমানুষ নয় নাকি। এখনও যে তাকে হাফ-টিকিটে মেয়েদের কামরায় চড়তে হয়, এতেই তার লজ্জা। ইচ্ছে হলে একাই রেলে চড়তে পারে, একাই ঘুরে আসতে পারে কলকাতা।

অনেক খানি জায়গা জুড়ে শামিয়ানা। একটা ধার চিকে আড়াল

করা। ওখানে মেয়েদের আসন। শুভাশীষের ইচ্ছে গিয়েছিল আসরে বসে, ভালো করে দেখে। কিন্তু মাসিমা রাজি হলেন না।

না, তুই এখানে বোস।

ভারি আশ্চর্য ভালো লাগছিল কৃষ্ণ যাত্রা। রাধাকৃষ্ণের কাহিনী অল্প অল্প জানা ছিল। চৈত্র মাসে যে সঙ বেরোয় তাতেও রাধাকৃষ্ণের দল থাকে কিন্তু সে শুধু নাচ, অল্প অল্প গান। রাধা সাজে বটকৃষ্ণ মিস্ত্রীর ছেলেটা, যেমন কালো, তেমনি রোগা ; দু'বাড়ি ঘুরতে না ঘুরতেই সে এলিয়ে পড়ে, মুখের রং গলতে থাকে ঘামে।

তার চেয়ে এই যে দল এসেছে শহর থেকে, এটা অনেক ভালো। এদের রাধার মুখখানা বেশ চল চলে, শ্রীকৃষ্ণ সেজেছে যে ছেলেটা তার গলাটাও মিঠে। একটা গান অনেকক্ষণ ধরে মনের মধ্যে গুণ গুণ করতে লাগল শুভাশীষের ; "আমার উঠিতে কিশোরী, বসিতে কিশোরী, কিশোরী গলার হার........"

মানে ঠিক বোঝা যায় না, কিন্তু তবু জীবন রহস্যের যেটুকু অর্ধ-উন্মোচিত হয়েছে শুভাশীষের কাছে, তার সঙ্গে এই সুরের কোথায় মিল আছে।

কৃষ্ণ মথুরায় যেতে চোখে জল এসেছে, জটিলা কুটিলাকে দেখে মনে পড়েছে ছোটমাসির শাশুড়ি আর ননদের কথা।

ঢুলতে ঢুলতে এরি মধ্যে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল। মাসিমার ঠেলাঠেলিতে উঠে পড়ল।

এই খোকা, ঘুমুচ্ছিস? পালা শেষ হয়ে এল যে।

শুভাশীষ তাকিয়ে দেখলে, এখন চলছে সেই জায়গা যেখানে কৃষ্ণ রাধার পদপল্লব ধরে মানভঞ্জন করছেন।

মাসিমারও চোখে জল। কিন্তু সন্ন্যাসি কোথায়?

মাসিমা আঁচলে চোখ মুছে বললেন, দেখ্ দেখি কোথায়। এই তো খানিক আগে বাইরে যাচ্ছি বলে উঠল। এদিকে বাড়ি যাবার সময়ও তো হয়ে এসেছে।

আস্তে আস্তে শামিয়ানার বাইরে এল শুভাশীষ। বেশ স্নিগ্ধ ফুরফুরে হাওয়া। সেই হাওয়ায় অষ্টমীর চাঁদ কখন নিখোঁজ! আকাশে এখন অগুণতি তারা।

—সরমাদি!

একবার ডাকল শুভাশীষ। মঠের ওধারে অস্পষ্ট আলোয় ঘনিষ্ঠ দুটি ছায়ামূর্তিকে লক্ষ্য করে করে শুভাশীষ এগিয়ে চলল। আসরের গানের দু' একটা পদ ভেসে আসছে। কোন করুণতম মুহূর্ত বুঝি।

সরমাদি! কাছে এসে শুভাশীষ ডাকলে।

ছায়া মূর্তির একটি ফিরে তাকাল।

বুকের ভিতর ঢিব ঢিব করছে শুভাশীষের, কিন্তু চিনতে তার ভুল হয়নি। সরমাদিই। ঘোমটা খসে পড়ছে। একদিন যে চুলগুলো ছোট করে ছাঁটতে চেয়েছিলেন সেগুলো সারাপিঠ ছেয়ে গেছে।

আরেকটি ছায়ামূর্তি হন হন করে মাঠ পেরিয়ে সদর রাস্তা ধরেছে। কিন্তু হাঁটবার ভঙ্গি থেকে মানুষটাকে চিনতে দেরি হয়নি শুভাশীষের। স্কুলের খেলার মাঠেও এমনি পরিচিত ভঙ্গিতেই বল নিয়ে সকলের পাশ কাটিয়ে গোলের দিকে এগিয়ে যান উপেনদা। এমনি এদিক ওদিক তাকানো সন্ত্রস্ত সতর্কতা, এমনি ক্ষিপ্র ব্যস্ততা।

সরমাদিকে একটি প্রশ্নও করল না। সরমাদিও বললেন না একটি কথা। অতি দ্রুত ওঠানামা করছে বুক। অন্ধকারেও চোখ দু'টি দপ দপ করে জ্বলছে সরমাদির।

সরমাদি আবার বিয়ে করবেন বলেছিলেন। সার্থক হবেন। ঘর বাঁধবেন। কিন্তু ঘর বাঁধার বেশ কি এই। এই মহলা ?

চলতে চলতেই খোঁপাটা জড়িয়ে নিলেন সরমাদি। ঘোমটা তুলে দিয়ে আঁচলটা টেনে টুনে নিলেন ভাল করে। আবার সেই শান্ত, বিষণ্ন, সুন্দর শুভ্রতা। সুদূর বিধুর বৈধব্য। স্পর্শাতীত।

গ্রীষ্মের ছুটির পর স্কুল খুলল। অল্প ক'দিন পরেই নামল বর্ষা।

প্রথম বর্ষার সেই বড় বড় ফোঁটাগুলোর কথা ভুলা যায় না। টপ টপ করে জল পড়ছে, প্রায় এক'শ অবধি গোনা যায় ক'ফোঁটা পড়ল। তারপর সমস্ত উঠোনটাই ভিজে উঠল। টিনের চালের ওপর প্রথম টুং টাং শব্দ, ক্রমে সেতারের মত একটানা নিরবচ্ছিন্ন আওয়াজ। শুকনো পাতা দু' চারটে ইতস্ততঃ ওড়ে, দু' একটা ঘরে ঢোকে, বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটায় ভিজে উঠোনে গেঁথে যায় দু'একটা।

রান্নাঘরে মাসিমার চোখ লাল হয়ে উঠেছে। নুয়ে পড়ে উনুনে ফুঁ দিচ্ছেন, ভিজে কাঠ জ্বলে না কিছুতে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে ঝাপসা হয়ে আসা মিশন কম্পাউণ্ডের গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে সুর করে চারু আর শুভাশীষ চাল মেপে দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বৃষ্টিকে হেঁকে আসার আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। মাঝে মাঝে শিল পড়ে, ছাতা মাথায় দিয়ে দু'জনে নেমে পড়বে উঠোনে, কুড়োনোর ধুম পড়ে যাবে। চোদ্দ বছর বয়স হলে কি হয়, এখানে তো কেউ চারুকে দেখছে না।

এমনও হয়, সারা রাত বৃষ্টি থামে না। ঘরের মেজে স্যাঁতসেঁতে হয়ে ওঠে। ব্যাঙের গোঙানিরও বিরাম নেই। মাঝে মাঝে হাওয়ায় জানালার কবাট হয়ত খুলে যায়, শোঁ শোঁ শব্দের কাঁধে চড়ে আসে বৃষ্টির ছাট ; ঝড়ের ঝাপটে টিনের চাল কড় কড় করে ওঠে. খুঁটি কাঁপে

থর থর করে। মাকে জড়িয়ে আছে শুভাশীষ। যদিও হাই স্কুলে পড়ে, এ সময়ে মায়ের কোলে মুখ লুকোতে লজ্জা নেই।

মাসিমা করেন কি, একটা পিঁড়ে ছুড়ে দেন উঠোনে। "পবন ঠাকুর বোস, বোস।"

ওই পিঁড়েয় সুস্থির হয়ে কতক্ষণে বসবেন পবন ঠাকুর, তার জন্তে শুভাশীষ উৎকর্ণ হয়ে থাকে। এক একবার মেঘ গর্জন করে ওঠে, সেই আওয়াজকে শিকারীর মত তাড়া করে আসে বিদ্যুতের ঝলক। সারা ঘরখানা চমকে ওঠে।

মার মুখে হাসি ফোটে। এবার ঝড় থামবে।

মেঘ ডাকলে বুঝি ঝড় হয় না, মা?

মা বলেন না।

মার কোলেই সে রাত্রে ঘুমিয়েছিল। ভোর রাত্রের দিকে অল্প অল্প শীত করছিল; মা টের পেয়ে নক্সা-তোলা কাঁথাটা ওর গায়ে টেনে দিয়েছেন। ঘুম ভেঙে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখল, ঝড় থেমেছে, কিন্তু তখনো টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে।

মিউনিসিপালিটির রাস্তাটার ওপর মিশন কম্পাউণ্ডের বড় গাছটার একটা ডাল ভেঙে পড়েছে।

বাইরে এসে শুভাশীষ অবাক হয়ে গেল। কাল ছিল ধু-ধু মাঠ, আজ সেখানে জল থৈ থৈ করছে। মাঠে পুকুরে সমান হয়ে গেছে। কোথায় ছিল এত জল? বড় গাঙে। কাল রাতে ঝড়ের পাল তুলে নদী বাঁধ ভেঙেছে, চুপি চুপি, কাল রাত্রে যখন সবাই ঘুমিয়ে, তখন এসে পড়েছে শহরের এই কিনারে। সব ডুবে গেছে, খালি এক একটা বাড়ি দ্বীপের মত আছে জেগে।

দাদু ইতিমধ্যেই কখন উঠেছেন। ঘরামি ডেকে বাসা থেকে

মিউনিসিপাল সড়ক অবধি একটা সাঁকো তৈরী করে নিয়েছেন, তার নিচেই এক কোমর জল। এঘর থেকে ওঘর অবধি যাবার জন্তে স্লিপার পাতা হয়েছে।

ঘরের দাওয়ার দু'ফুট মোটে জেগে আছে। সেই পরিসরটুকুতে যদৃচ্ছ বিচরণ করছে কেঁচো, পিঁপড়ে, পোকা মাকড়, শামুক। দু'চারটে ফড়িং তখনো ভেসে থাকা ঘাসের শীষে উড়ছে ফড় ফড় করে। একটা হেলে সাপ তরতর করে সাঁতার দিয়ে চলে গেল ওপারে।

এই হল বর্ষা। এই বর্ষা থাকবে শ্রাবণ অবধি। জল অবশ্য নেমে যাবে শাস্ত দিনেই কিন্তু তখন পুকুর আর ডোবা গুলো থাকবে কানায় কানায় ভর্তি। তারপর সমস্ত ভাদ্র-আশ্বিন মাস সেই জলে পাতা পচবে, আর কচুরি পানা। কার্তিকে শুরু হবে ঘরে ঘরে জ্বর। তখন সাঁকোও নেই, জল নেই, কিন্তু সমস্ত পথ যেতে হবে টাউনের দিকে। সরকারী হাসপাতালে সারা সকাল বসে থেকে পাওয়া যাবে দাতব্য ফিভার মিক্সচার অর্থাৎ চিরতার জল, আর সরকারী কুইনাইন।

শুভাশীষের ইচ্ছে ছিল, সকাল বেলাতেই একবার ডুব দিয়ে আসে। গামছাও হাতে নিয়েছিল কিন্তু মা কোথা থেকে এসে ধরে ফেললেন। খবর্দার নতুন জলে চান করতে পাবে না। চারুটা কাল সারা সন্ধ্যা ভিজেছিল, শেষ রাতে ওর গায়ে হাত দিয়ে দেখি জ্বর এসেছে।

চোখ দু'টো টক টকে লাল চারুর। শুভাশীষ কপালে হাত দিয়ে দেখল, আগুনের মত গরম। চারু ওকে ইঙ্গিতে এক গ্লাস জল দিতে বললে। শুভাশীষের মন খারাপ হয়ে গেল। নাইতে আর ইচ্ছে নেই। একজনে চান করায় কোন আনন্দও নেই।

দাদু বললেন, আজ আর বাজার বসবে না। চাল-ডাল চড়িয়ে দাও খিচুড়ি।

সেদিন ইস্কুলেও যেতে হ'ল না। বড় টিনের ঘরখানার ওয়াসার চুইয়ে জল পড়েছে কাল সারা রাত। আজ মেরামত হচ্ছে। আজ ছুটি।

সকালের দিকে জল একটু ধরেছিল, আবার শুরু হ'ল দুপুরের দিকে। দাদু বললেন, কী দুর্যোগ।

খবরের কাগজ পড়ে জানা গেল পদ্মায় কাল রাত্রে একটা ষ্টীমার ডুবেছে। অধিকাংশ যাত্রীরই কোন খোঁজ নেই।

ষ্টীমার ডুবি এ অঞ্চলে নতুন নয়। প্রতিবছরে এমন দুর্ঘটনা দু'একবার হয়। ক'জন যাত্রী ছিল, ক'জন বাঁচল, তার হিসাব পাওয়া যাবে রেল ষ্টেশনে গেলে। তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে দাদু বেরুলেন। পেঁয়াজের গন্ধে আর খিচুড়ির ধোঁয়ার মনোরম যে আবহাওয়া তৈরি হয়েছিল, তা আর রইল না।

এদিকে চারুর জ্বর আরো বেড়েছে। সারা সকাল বেহুঁসের মত পড়ে ছিল। মা আর মাসিমা পালা করে এতক্ষণ ওকে জলপটি দিয়েছেন, হাওয়া করেছেন। এই এতক্ষণে মা বুঝি দু'টো মুখে দেবার জন্যে উঠলেন। শুভাশীষ বসে রইল দিদির শিয়রে।

খানিকক্ষণ বাদে চারু চোখ মেলে চাইলে। শুভাশীষ ভেবেছিল হয়ত একটু জল খেতে চাইবে, কিম্বা চাইবে মাথাটা একটু টিপে দিতে। কিন্তু চারুর কথা শুনে সে অবাক হয়ে গেল।

আজ খিচুড়ি হয়েছে, নারে? ক্ষীণ কণ্ঠে চারু বললে, আমাকে একটু এনে দিবি, ভাই? এত খেতে ইচ্ছে করছে।

জ্বর হলে শুকিয়ে উপোস দিতে হয়, শুভাশীষের এটুকু জানা ছিল। সে যুক্তি দিয়ে চারুকে লোভের অযৌক্তিকতা বোঝাতে বসল।

চারু কতটুকু বুঝলে, কে জানে। আরক্ত আচ্ছন্ন অদ্ভুত চোখে শুভাশীষের দিকে তাকিয়ে বললে, দিবিনা, কেমন। আচ্ছা আমি ম'লে মনে রাখিস। বলেই চারু যেন আবার ঝিমিয়ে পড়ল।

মরলে? এই জ্বরে কি মানুষ মরে! শুভাশীষের নিশ্চিত কোন ধারণা ছিল না। কিন্তু চারু বলছে মরবে। মরবেই যদি, তবে আর তার সাধ অপূর্ণ থাকে কেন। শুভাশীষের চোখ ছল ছল করে উঠল। শ্লিপারের ওপর দিয়ে পা টিপে টিপে গেল রান্নাঘরে। মা আর মাসিমা বুঝি বাসন ধুতে গেছেন খিড়কিতে। খানিকটা খিচুড়ি, যা অবশিষ্ট ছিল, তুলে নিয়ে এল।

দিদি! এই দিদি!

অনেক কষ্টে চোখ মেলে তাকালে চারু। উঃ।

আঃ এত দেরীও করতে পারে মেয়েটা। শুভাশীষ ঠেলতে লাগল এই নে। খিচুড়ি এনেছি! খেয়ে নে।

অত জ্বরেও সোজা হয়ে উঠে বসল চারু। ওর লাল চোখ দু'টো চক চক করতে লাগল। এনেছিস? দে।

মা আর মাসিমা আসবার আগেই সব শেষ হ'ল। চিহ্নমাত্র রইল না। মা ফিরে এসে দেখলেন, চারু আর শুভাশীষ গল্প করছে।

এখন কেমন আছিস, চারু।

একটু ভাল মা।

কপালে হাত দিয়ে দেখা গেল সত্যিই তাই। মা হাতের দু'চারটে কাজ সারতে ওদিকে চলে গেলেন।

বালিস থেকে মাথা উঁচু করে চারু একটু পরে ফিস ফিস করে বললে এই খোকা।

কী?

একটা কাজ করবি ভাই।

আবার কী কাজ।

একটু ইতস্ততঃ করে চারু বললে, ও বাড়ির নির্মলকে একটু খবর দিবি ?

চমকে উঠল শুভাশীষ। কী সম্পর্ক নির্মলের সঙ্গে দিদির। সে দিন দুপুরে যা দেখে এসেছে, সে সম্বন্ধে একটা কথাও এপর্যন্ত বলেনি দিদিকে। আজ চারু, বিকারের ঘোরে, নিজেই বুঝি উন্মোচন করতে বসেছে নিজের রহস্য।

কিন্তু চারু আর কিছু বললে না। ঝিমিয়ে পড়ল।

বিকেলের দিকে ননী এল ভেলা বেয়ে।

রেল ষ্টেশনে যাবি ? কালকের ষ্টীমার ডুবির লোকগুলোকে ওখানে এনে রেখেছে।

ভেলায় চড়তে ভয় নেই। ভেলা কখন ডোবে না। মিউনিসিপাল সড়কের কালভার্টের নিচে দিয়ে শোঁ শোঁ করে জল আসছে। ইটের গাঁথুনিতে ধাক্কা খেয়ে ছোট ছোট আবর্ত। সাবধানে লগি ঠেলে ননী কালভার্টের নিচে দিয়ে ভেলাটাকে পার করে নিয়ে গেল।

বাজারের মুখটা ছোট ছ অসংখ্য নৌকায় ভরে গেছে। হাটুরেরা আজ আর হেঁটে আসতে পারেনি, এসেছে নায়ে ভরা দিয়ে। কোমরে থলে বেঁধে ফড়েরা ছেঁকে ধরেছে পাট চাষীদের। ডুবে যাওয়া মাঠেরই একধারে বাঁশের ঢেঁকিতে জাল জড়িয়ে জেলেরা ফাঁদ পেতেছে। একে এ অঞ্চলে বলে ভ্যাসাল। সারা রাত ছপ ছপ শব্দ হয়, মাছ পড়ে।

বেশির ভাগই পুঁটি কিম্বা রুই। ইলিশ মাছ এখানে ধরা পড়ে না। ইলিশ মাছের জন্যে যেতে হবে নদীতে, সেই বড় গাঙে।

বেশিক্ষণ ষ্টেশনে বেড়াতে ভালো লাগল না। রক্ত আর বালি মাখা লাস গুলোর জল খাওয়া পেট ফুলে ঢোল হয়ে উঠেছে। সে ধারটাতে তাকান যায় না। সন্ধ্যার প্যাসেঞ্জারটাও এল না।

জল ক্রমেই বাড়ছে। নদী থেকে এসেছে ডেঞ্জার সিগন্যাল। লাইনের অবস্থা খারাপ, রেল কোম্পানী গাড়ির সংখ্যা কমিয়ে দিয়েছে। ষ্টীমার ঘাটের কাছাকাছি কোথায় লাইন ধ্বসে পড়বে, এমন আশংকাও আছে। বিকেলের মেল ষ্টীমারটা ঠেকে আছে কোন চরে। প্লাবনে এরকম হয়। জাহাজের মাল্লারা বুঝতে পারেনা কোথায় কত জল। বাঁওয়ের হিসাব মেলে না।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে গেল।

শোবার আগে দাদু দাওয়ার চারপাশে ছিটিয়ে দিলেন কার্বলিক এসিড। এ সময়ে সাপের বড় ভয়। খাটের পায়া জড়িয়ে বিছানায় ওঠে। তা ছাড়া চার ধার ডুবে যাওয়াতে পোকা মাকড়েরও উপদ্রব বেড়েছে। মা বিছানার ধারগুলো ভালো করে গুঁজলেন।

মোটে তো সন্ধ্যা। এরই মধ্যে সব কেমন নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে দু'একটি লোকের পথ চলায় ছলাৎ ছলাৎ শব্দ ওঠে। একটি ইঞ্জিনেরও বাঁশি শোনা যায় না। পাদ্রী সাহেবের কুঠিতে পেট্রোমাক্স আলোও আজ নেই।

হাওয়ায় তেমন জোর নেই, তবু মাঝে মাঝে জানালাগুলো খট খট করে, মিশন কম্পাউণ্ডের ঝাউ গাছ গুলোয় শোঁ শোঁ শব্দ ওঠে।

আর সেই রাত্রেই বাবা এলেন।

দাদুর ঘুম কিছু পাৎলা। তিনিই প্রথম উঠলেন।

কে ?

আমি। দেবাশীষ।

কানে শোনা কথাও বিশ্বাস হয় না। এই দুর্যোগের রাত্রে কোমর অবধি জল ঠেলে কোথা থেকে এল দেবাশীষ। কম্পিত হাতে দাদু দরজা খুললেন, সবাইকে ঠেলে তুললেন।

সেই সোরগোলে শুভাশীষের ঘুম ভেঙ্গে গেল।

কমিয়ে রাখা হারিকেনটাকে উস্‌কে দেওয়া হয়েছে। মাথায় ঘোমটা দিয়ে মা খাটের এক কোনে সরে বসেছেন। মাসিমা শুকনো একখানা ধুতি আর গামছা নিয়ে হাসিমুখে দাঁড়িয়েছেন।

—তোর বাবা খোকা, প্রণাম কর।

প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতেই প্রগাঢ় একটি আলিঙ্গনের মধ্যে শুভাশীষ ডুবে গেল। দীর্ঘ চুল, অল্প অল্প দাড়ি, বাবা জেল থেকে ছাড়া পেলেন কবে ?

পরশু দিন। ছাড়া পেয়েই এখানে আসছিলেন দেবাশীষ, কিন্তু পথে ষ্টীমার চরে আটক পড়ে। এখানে এসেও বিভ্রাট। এত জল হয়েছে তা কি আর আগে জানতেন।

একে অন্ধকার, ষ্টেশনে কুলি নেই। কোমর অবধি ভরে গেছে কাদায়। খদ্দরের ধুতি, জামা এখানে ওখানে ছেঁড়া। শুভাশীষ অবাক হয়ে বাবার দিকে চেয়ে ছিল।

নিকটতম রক্তের সম্পর্ক তার এই লোকটির সঙ্গে, তবু অপরিচয়ের কী দুস্তর ব্যবধান।

দেবাশীষ সস্নেহে শুভাশীষকে টেনে নিলেন কাছে।

—এত বড় হয়েছে খোকা ? কত ছোট দেখেছিলাম একে।

শুভাশীষ সরেও গেল না, এলিয়েও পড়ল না। বাবার আলিঙ্গনের মধ্যে বন্দী রইল বটে, কিন্তু ওর ভঙ্গিটা আড়ষ্ট। দৃষ্টি সন্দিগ্ধ। দেবাশীষ যতক্ষণ তাঁর শীর্ণ, কঠিন আঙুলগুলো ওর মাথায় বুলিয়ে দিতে থাকলেন, ততক্ষণ সে চুপ করে রইল। দাদু স্মিত হাস্যে উঠে বসেছেন খাটের ওপর। চারু জ্বরে বেহুঁস। মাসিমা এই এত রাত্রে রান্নাঘরে গেছেন ফের উনুন ধরাতে। আর মা? শুভাশীষ লক্ষ্য করল, মা তেমনি নিস্পন্দ ভাবে বসে আছেন তখন থেকে; পাথরের প্রতিমার মত।

পাঁচ

শক্ত করে হাল চেপে বসেছিল শুভাশীষ। দেবাশীষ বাইছিল।

—তোর ভয় করছে খোকা? শক্ত করে ধর। ভয় কী।

ভয় কী! নিজেকেও মনে মনে বোঝায় শুভাশীষ, কিন্তু ভয় ঘোচেনা। মাঠের ওপর পাট ক্ষেতের ফাঁকে ফাঁকে নৌকো চলছে, এখানে স্রোত নেই, জলও অগভীর। তবু মাঝে মাঝে কী হয়, মুঠি শিথিল হয়ে আসে, নৌকোটা পলকে পাক খেয়ে ঘুরে যায়। বাবা, ও বাবা, চেঁচিয়ে ওঠে শুভাশীষ।

ততক্ষণ দেবাশীষ চলে এসেছে গলুইয়ে, একহাতে হাল সামলে, আরেক হাতে ঝাঁকুনি দিচ্ছে ছেলেকে, এত ভীতু তুই খোকা, ছি। এর আগে কখনো নৌকোয় চড়িসনি বুঝি।

অপ্রতিভ শুভাশীষ লজ্জিত মুখে মিটমিট করে বাবার দিকে তাকায়। কাল রাতে দেখা দাড়ি গোঁফের এতটুকু নেই দেবাশীষের মুখে। আজ সকালেই ক্ষৌরি হয়েছে বুঝি। সদ্য কামানো মুখখানা কী মসৃণ,

তামাটে। কাল বোঝা যায়নি, আজ দেখা যাচ্ছে চোয়ালের হাড় দু'টি অসম্ভব উঁচু দেবাশীষের। গায়ে খদ্দরের একটা জামা, ফতুয়া আর পাঞ্জাবির মাঝামাঝি একটা সন্ধি।

কাল রাত্রে হারিকেনের অল্প আলোয় দেবাশীষের চোখ দু'টি অস্বাভাবিক রকমের উজ্জ্বল মনে হয়েছিল, আজ মনে হচ্ছে সেই উজ্জ্বলতাকে কমনীয় করেছে স্নেহ।

আবার হাতটা বাড়িয়ে হালটা ধরে ফেললে শুভাশীষ। বাবা যখন পাশেই, তখন আর ভয় কী। চারধারে একবার তাকাতেই গা আবার ছম ছম করে উঠল। কোন কিছুর চিহ্ন মাত্র নেই; কেবল ওপরের দিকে চাইলে দেখা যায় সারা আকাশে বেপরোয়া ছড়ানো হালকা-গাঢ় মেঘের মধ্যে পশ্চিমে ঢলে-পড়া সূর্যের লুপ্তাবশেষ। ওই সূর্যই দিকের নিশানা, সময়েরও।

—কতদূর এলাম বাবা?

সামনে কতগুলো কচুরিপানা পড়েছিল; সেগুলোকে লগি দিয়ে সরাতে সরাতে দেবাশীষ বললে, কে জানে কতদূর। হিসেব রাখিনি।

ভারি আশ্চর্য লাগছে এই পাড়ি। বিনা প্রয়োজনের খেয়া। মেঘলা আলোয় দেবাশীষের কপালের রেখা আর চিবুকের কুঞ্চন স্পষ্ট হয়ে ধরা দিয়েছে। চোখ দুটির বিষণ্ণতায় অতীতের অনেক দুঃখভোগের চিহ্ন। উজ্জ্বলতার আরো বহু দুঃখভোগের প্রতিশ্রুতি।

দুপুর বেলাকার অভিজ্ঞতা শুভাশীষ কখনো ভুলতে পারবে না। সবাই শুয়েছে, দাদুর পাশে শুভাশীষও ঘুমিয়ে।

—এই খোকা, ওঠ।

ফিস ফিস কথা কানে যায়নি, কিন্তু ঝাঁকানিতে তন্দ্রা ছুটে গিয়েছিল। চোখ মেলে দেখে, বাবা। দেবাশীষ ওকে ডাকছে। —এই খোকা,

চল। মন্ত্রমুগ্ধের মত শুভাশীষ অনুসরণ করেছিল বাবাকে। প্রশ্ন করবার, ফুরসুৎ হয়নি, ভালো করে চোখ মোছার পর্যন্ত না। চারুর শিয়রে পাখা হাতে মা পর্যন্ত ঢলে পড়েছেন। দাদুর নাক ডাকছে।

ঠিক দাওয়ার নিচে ছোট একটা ডিঙ্গি বাঁধা। কোথা থেকে দেবাশীষ সংগ্রহ করে এনেছে কে জানে। পা দিতেই দুলে উঠলো ডিঙ্গি, শুভাশীষ টলে পড়ল।

—নৌকোয় বেশি চড়িসনি বুঝি ? এমনি করে ব'স্; হালটা ধর এমনি করে। বলতে বলতে দেবাশীষ বাঁধন দিলে খুলে।

—কোথায় যাচ্ছি বাবা ?

দেবাশীষের উত্তর পাওয়া গেল না।

শুভাশীষ এক সময়ে লক্ষ্য করলে, দেবাশীষ তার দিকেই চেয়ে আছে। মুখ চোখ লাল হয়ে উঠল। কী দেখছেন বাবা এমন তন্ময় হয়ে।

হয়ত দেবাশীষ ডিঙ্গির গতিতে ওর ভেঙে ভেঙে যাওয়া ছায়ার দিকে চেয়ে মেলাতে চেষ্টা করছিল ওর মুখের সঙ্গে শুভাশীষের। কতখানি মিল আছে দু'জনের। একটু সাদৃশ্য বুঝি পাওয়া যায় নাসিকার খাঁড়ালো গঠনে, চিবুকের ব্যঞ্জনার দৃঢ়তায়। তবু পার্থক্যও ঢের। শুভাশীষের চোখ দু'টিতে আছে ত্রস্ত ভীরুতা,—এটুকু ওর মার। হালটা শক্ত করে চেপে ধরার মধ্যেও অসহায় একটা ভঙ্গি। কত দুর্বল শুভাশীষ, কাঁধ থেকে রোগা হাত দু'টি নেমে এসেছে, পেশির স্ফুরণমাত্র নেই।

তবু ওর সুকুমার মুখখানার দিকে তাকালে চোখ দু'টি আপনা থেকে স্তব্ধ হয়ে যায়, একটা মায়া বুকের ভেতর মোচড় দিয়ে ওঠে। হোক ভীরু, হোক দুর্বল, তবুও বংশের আদি পুরুষের রক্তের যে ধারা বইছে

দেবাশীষের দেহে, তার খানিকটা অংশ পেয়েছে এ-ও।

মাথার ওপর দিয়ে সন্ধ্যার শেষ পাখিটিও অনিশ্চিত নীড়ের দিকে উড়ে চলে গেল।

—বাবা, চলো এবার ফিরি।

—চল্।

বাড়ি ফিরতে দেখা গেল, সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। কোথায় গিয়েছিলে, কেন গিয়েছিলে, আমরা ভেবে মরি, ইত্যাদি।

মৃদু একটু হাসল দেবাশীষ। —এমনি একটু ঘুরে এলাম খোকাকে নিয়ে। ওর দেশ ওকে চিনিয়ে দিলাম একটু।

পরের ডিঙ্গি ধার করে অকারণ সারা দিন নৌকোয় ঘুরে বেড়ানো, এরই নাম কি দেশ চেনা! কী যে অদ্ভুত সব খেয়াল দেবাশীষের!

গামছা দিয়ে পা মুছছিল শুভাশীষ। কোথা থেকে মা এলেন। ওর ভিজে চুলগুলো শক্ত মুঠিতে ধরে পিঠের ওপর কয়েক ঘা বসিয়ে দিলেন

—কেন গিয়েছিলি, কেন গিয়েছিলি হতভাগা!

মার চোখ দু'টো ফোলা-ফোলা, অল্প-অল্প লাল। মা কি এতক্ষণ কেঁদেছেন নাকি।

—কী করব, বাবা ডেকে নিয়ে গেল যে!

ডেকে নিয়ে গেল: ডেকে নিয়ে গেল। আপন মনেই বিড় বিড় করতে লাগলেন মা। দাদু এসে পড়েছিলেন। মা আর কিছু বললেন না।

মুড়ি আর চা খেতে খেতে দাদু আর বাবা গল্প করছিলেন।

—দিনকতক থাকবে তো। দাদু জিজ্ঞাসা করছেন।

—আজ্ঞে হাঁ। দিনকতক বিশ্রাম করব ভাবছি।

—বিশ্রাম? দাদু যেন অবিশ্বাস করলেন। তোমার আবার বিশ্রাম! হয়তো কী এক হুজুগ বাধবে, আবার ছুটবে কার পিছনে।

—হুজুগ বলবেন না। এতবড় একটি জাতির মুক্তিযজ্ঞ—

দাদু যেন একটু অপ্রতিভ হলেন। হুজুগ কথাটা তিনিও ব্যবহার করতে চাননি। অসতর্কভাবে কথাটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। দেশের স্বাধীনতা কামনা কারুর চেয়ে কম নয় তাঁর। যৌবনকালে রঙ্গলালের "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে" পড়ে রীতিমত অনুপ্রেরণা পেয়েছেন। বার বার মুগ্ধকণ্ঠে আবৃত্তি করেছেন হেমচন্দ্রের "ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।" আর নবীন সেনকে তো ব্যক্তিগতভাবেই চিনতেন তিনি। নবীন সেন যখন ডিপুটি, তখন তাঁর অধীনে সেরেস্তায় কাজ করেছেন। সরকারি চাকরি করেও নবীন সেন "পলাশীর যুদ্ধ" সোজাসুজি যে লিখতে পেরেছিলেন এইটেই তাঁর বিস্ময়কর মনে হয়েছিল।

বঙ্গভঙ্গের সেই দিনগুলি। তার আগেও কংগ্রেস ছিল। বিশ বছর ধরে যে কংগ্রেস বড়ো জোর শুধু "Representative Institution" চেয়ে এসেছে; "Self-government" চাইবার সাহস পর্যন্ত হয়নি। কিন্তু সেই অতিসাবধানী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ধীরে ধীরে জমছিল অসন্তোষ। মহারাষ্ট্রে দেখা দিলেন—তিলক, পাঞ্জাবে লাজপত, বাংলায় বিপিন পাল। চরমপন্থার সেই শুরু। ১৯০৫ সালের ৭ই আগস্টে শুরু হ'ল নূতন অধ্যায়, বিদেশী পণ্য বর্জন। আর সকলের মত সেদিন মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় তিনিও মাথায় তুলে নিয়েছিলেন।

চিত্রের মতো মনে ভাসছে একে একে। ১৯০৭ সালের সুরাট; আট সালে তিলকের ছ' বছরের জেল, মান্দালায় নির্বাসন। ১৯১১ সালে দিল্লী দরবার। রাজকীয় ঘোষণার বঙ্গভঙ্গ রদ।

সংগ্রামের দ্বিতীয় অধ্যায়ও তিনি দেখেছেন, প্রথম মহাসমরোত্তর চুক্তিভঙ্গ ও নৈরাশ্যে যার উদ্বোধন। লণ্ডন থেকে লাজপত রায়, জিন্না, লর্ড সিংহ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ভারত-সচিবকে জানালেন, তাঁরা দেশের যাবতীয় সম্পদ সম্রাটের করকমলে উপঢৌকন দিতে স্বেচ্ছায়ও সম্মত। ১৯০৫-১১ সালের সাফ্যলের পর কী নিদারুণ পতন। বেয়াড়া গরু যেন অনেক চরে আবার ফিরে এলো, প্যাক্স ব্রিটানিকার খোঁয়াড়ে।

রাজনৈতিক দিগ্বলয়ে আরেকটি নাম শোনা যাচ্ছে—গান্ধিজী। সবে ফিরেছেন দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে; কিন্তু তিনিও প্রথম ছিলেন ওই আশাবাদীদের দলেই। কিন্তু আশা ভঙ্গ হতেও বেশি দেরি হয়নি।

পাঞ্জাবে গদর আন্দোলনে ফৌজের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিল। একদিকে রাউলাট বিল, দৃঢ়মুষ্টি নিপীড়নের আয়োজন, অপরদিকে জলমেশানো "রিফর্মের" ঘুমপাড়ানি! আর সব ছাপিয়ে দেশময় বিক্ষোভ, হরতাল, খিলাফত, কোথাও বা সহিংস প্রতিরোধ।

অমৃতসরের হত্যাকাণ্ডের পর গান্ধিজী এগিয়ে এলেন। বিশৃঙ্খল জনশক্তিকে নম্র করলেন নূতন মন্ত্রে: অহিংস অসহযোগ—যতদিন না সব অন্যায়ের অবসান ঘটে, স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। আইনসভা বর্জন করো, ছাড়ো বিলাতি শিক্ষার বিদ্যায়তন; সি আর দাশ, মতিলাল ছাড়লেন ইংরাজ-আদালতে ওকালতি। ১৯২১ সালের ৩১ শে ডিসেম্বরের মধ্যে স্বাধীনতা—গান্ধিজীর সেই ভবিষ্যদ্বাণী এখনো মনে আছে।

১৯২১ সাল শেষ হয়ে আসছে; প্রতীক্ষিত দিনটি আর কতোদূর।

নভেম্বরে এলেন প্রিন্স অব ওয়েলস, মাথা নত হ'লনা কারও, কালো পতাকায় আকাশ ছেয়ে গেল। ডিসেম্বর মাস। ত্রিশ হাজার কর্মী কারান্তরালে। গান্ধীজি তখনো বাইরে আছেন,—কংগ্রেসের কর্ণধার। সহস্র সহস্র সৈনিক প্রস্তুত। দাসত্বের শৃঙ্খল ছেঁড়ে বুঝি।

১৯২১ সাল চলে গেল, কিন্তু তাতেও লোক দমলোনা। ফেব্রুয়ারি মাসে চরমপত্র গেল বড়লাটের কাছে। বার্দোলিতে আইন অমান্য শুরু হবে এবার। কিন্তু কোথা থেকে কী হ'ল, চৌরীচৌরা এসে সব দিল বিপর্যস্ত করে। গান্ধীজি আন্দোলন প্রত্যাহার করলেন।

বলা বাহুল্য গান্ধীজির এই সিদ্ধান্ত তিনি প্রসন্ন মনে গ্রহণ করেন নি মনে হয়েছিল এও আরেকটা হিমালয়তুল্য ভুল। দেশবন্ধু-মতিলাল-লাজপত এঁরা তখন জেলে। এঁরাও চটেছিলেন।

সমস্ত আশা ওখানেই ধূলিসাৎ হয়ে গেল। এরপর কী ঘটল সেদিকে আর লক্ষ্য দেবার মতো মানসিক অবস্থা ছিলনা তাঁর। সবই তো শেষ হ'ল। শুধু বড়ো মেয়ের জন্যে মনঃকষ্ট পেতেন মাঝে মাঝে। দেবাশীষ এখনো জেলে। বিভাকে কাছে আনিয়ে রাখলেন। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন, এখনো পেন্সনের টাকা ক'টা ঘরে আসছে। মাঝখানে একবার বুঝি শুনেছিলেন, কংগ্রেস আবার পার্লামেণ্টারী কার্যক্রম মেনে নিয়েছে; স্বরাজ্য পার্টির সঙ্গে করেছে আপোষ। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর একেবারেই ঠাণ্ডা হয়ে গেলেন।

একে একে দেউটি নিবছে। সেই স্বল্পালোক রাজনৈতিক প্রদোষে গান্ধীজিকে খুঁজে পাওয়া গেল না।

বহুক্ষণ স্তব্ধতার পর দাদু বললেন, আবার তো সাইমন কমিশন আসছে। কী দেবে ওরাই জানে।

—কিছুই দেবে না, বললে দেবাশীষ।

—জানি। একজন ভারতীয়কেও ওরা বিশ্বাস করে নেয়নি কমিশনে। কিন্তু এ মিছিমিছি বিক্ষোভ প্রদর্শন করে—

মিছিমিছি নয়। দেবাশীষ বললে। ধীরে ধীরে উচ্চারিত শব্দগুলো: দৃঢ়তার ব্যঞ্জনা। মিছিমিছি নয়। মিছিল বার করে বা কালো পতাকা উড়িয়ে ওদের ফন্দী আমরা বাণচাল করতে পারবো না, মানি। কিন্তু এরও একটা নৈতিক মূল্য আছে। সামগ্রিক প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে সামগ্রিক আত্মপরিচয়।

দাদু কিছুক্ষণ আবার চুপ করে রইলেন।—তুমি তা'হলে কিছুদিন এখন এখানেই থাকছ।

—ইচ্ছে তো।

—দেখ। হাই তুলে দাদু বললেন বিভার শরীর ভেঙে পড়ছে। আর ছেলেমেয়েগুলো, ওরা ছেলেবেলা থেকে শুধু মামা বাড়িই চিনেছে। ওরা তোমাকেও চিনুক।

খেয়ে শুতে এসে নতুন বন্দোবস্ত দেখে শুভাশীষ সেদিন একটু অবাক হ'ল। বড়ো জোড়াখাটখানায় শোবে কেবল সে আর চারু। চারুর আজ জ্বর নেই।

আর দাদু? মাসিমা? মা? বাবা?

দাদু আর মাসিমা শোবেন ছোট ঘরখানায়, মা আর বাবা দাদুর খাটটায়।—চারু বললে। আর এটাতে শুধু তুই আর আমি। লাথি মারিসনি কিন্তু; তোর শোওয়া ভারি খারাপ খোকা।

আনন্দে এগিয়ে এসে শুভাশীষ একেবারে গলা জড়িয়ে ধরল চারুর। সত্যি, দিদি? শুধু তুই আর আমি?

—হ্যাঁরে। ছাড় এবার। অসুখে পড়ে রোগা হয়েছে চারু। হাঁপাচ্ছে।

--কী মজা। কিন্তু দিদি—

উঁ—।

—ভয় করবে না তোর একলা শুতে।

—দূর, পাগল! আর বাবা তো ও খাটে রইলেনই।

শুভাশীষের এতক্ষণে যেন কতকটা আশ্বাস ফিরে এলো। ঠিক বলেছিস। আমারো ভয় করবেনা। এই দিদি, ঘুমুলি?

উঁহু। চারু জড়িত স্বরে জবাব দিল।

—বাবার সঙ্গে তোর আলাপ হয়েছে দিদি?

—আলাপ হবে কিরে! ভারিক্কি গলায় চারু বললে, আমি আরো কতবার দেখছি বাবাকে। জেলে যাবার আগে থেকে।

—বাবা জেলে গিয়েছিলেন কেন রে?

—স্বদেশি করে। দেখিসনি, বাবা শুধুই খদ্দর পরেন।

—খদ্দর পরাই বুঝি স্বদেশি?

দূর বোকা। স্বদেশি মানে ইংরেজকে চলে যেতে বলা।

অনেক দিন আগে কালীবাড়ীতে দেখা ম্যাজিকলণ্ঠনের কথা শুভাশীষের মনে পড়ল। তাঁতিদের আঙুল কেটে নিয়েছিল যারা, তারাই ইংরেজ। আজকাল আর বুঝি আঙুল কাটে না,—যেখানে চোর ডাকাত থাকে' সেই জেলে পুরে দেয়?

রান্নাঘরে দাদু আর বাবা খেতে বসে গল্প করছেন, তার আভা পাওয়া যায়। ফিস ফিস করে চারু বললে, জানিস, আমাদের বাবা মোটেই ভাল লোক নন।

ভাল লোক নন? বিস্ময়ে সোজা হয়ে বসল শুভাশীষ, কোথায় যেন আঘাত লাগল।

চারু বুঝিয়ে দিল। উনি পরের জন্যেই ভেবে ভেবে মরেন, নিজেদের জন্যে কিছু না। আমাদের জমিদারী ছিল, ঘর দোর সব ছিল। সব বিলিয়ে দিয়েছেন। নইলে আমাদের মামাবাড়ি পড়ে থাকতে হয়?

কার কাছে এত জ্ঞান চারু? আবার কার, মার কাছে। মাকে একলা বসে কখনো কাঁদতে দেখিসনি?

রান্নাঘরে দাওয়ায় বসে ওদের কুলকুচির শব্দ শোনা যাচ্ছে। এখনি বাবা এসে ঢুকবেন।

চারু বললে, আয় খোকা, আমরা ঘুমিয়ে পড়ি।

কেন ঘুমটা ভেঙে গিয়েছিল, শুভাশীষ নিজেই জানে না। হয়ত মাঝরাতে চালের ওপর এসে একটা পেঁচা ডেকে উঠেছিল, হয়ত হাওয়ায় জানালার একটা পাল্লা খুলে যেতে চমকে উঠেছিল।

—তুমি কি আমাকে কিছুতেই ক্ষমা করবে না?

আবার কিছুক্ষণ চুপ।

—বেশ, তা হ'লে আমার কিছু বলবার নেই, তুমি যখন কিছু শুনবেই না।

আবার একটু পরে, সেই একই গলা:

—সাধ করে কি দূরে ছিলাম? আমার কি ইচ্ছে করত না একবার আসি, এসে একবার তোমাদের দেখে যাই? ছাড়া না পেলে কী করব, বলো।

আস্তে আস্তে একটুও শব্দ না করে শুভাশীষ পাশ ফিরলো। ধার খুঁজতে গিয়ে মশারির যেখানটা ছিঁড়েছে সেখানে রাখলো চোর চোখ দু'টো।

খাটের ওপর পা ঝুলিয়ে বাবা বসে আছেন, আর শুভাশীষের

দিকটাতে পিছন ফিরে খাটের শিয়র ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছেন মা, বাবার হাতের মুঠোয় তাঁর দু'খানি হাত। মা কি কাঁদছেন।

—ভেবেছিলাম, দু'দিন একটু জুড়িয়ে যাবো। কিন্তু তুমি যখন চাও না, তখন....তখন কালই চলে যাবো।

থর থর করে কেঁপে উঠলো মার শরীরটা, মা বুঝি কথা বলতে চেষ্টা করছেন।

—কথা বলো, কথা বলো বিভা।

এক হাতে মার চিবুক ধরে ঘুরিয়ে নিলেন বাবা। হারিকেনের আলোটা অল্প উস্‌কে দিলেন। এতক্ষণে মার মুখখানা স্পষ্ট দেখা গেল। কাঁদছেন না, কিন্তু কী ভীষণ গম্ভীর অথচ করুণ মার মুখ, জানালার বাইরের থমথমে কালোঢালা আকাশের মতো। এর চেয়ে বুঝি কাঁদলে ভালো ছিল।

আস্তে আস্তে মাকে টেনে বাবা পাশে বসাতে চেষ্টা করলেন। ত্রস্তে হাত ছাড়িয়ে নিলেন মা। ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিলেন এদিককার খাটের দিকে, যেখানে চারু আর শুভাশীষ শুয়েছে।

—ওরা ঘুমিয়েছে। তুমি এসো।

—কী-যে করো। এতক্ষণে প্রথম কথা শোনা গেল মার। লাল টকটকে পাড়ের একটা শাড়ী পরেছেন, এমন যত্ন করে সিঁদুর পরতেও মাকে এর আগে কখনো দেখা যায় নি।

—তুমি তো এখানে থাকবে না, আমাকে ভোলাবার জন্যে শুধু বলছ।

—বিশ্বাস করো, বিভা।

—বিশ্বাস? হাসিও যে কতো তিক্ত হতে পারে, তা দেখা গেল মার ওষ্ঠাধারের ঈষৎ স্ফুরণে। বিশ্বাস না করেই বা উপায় কী। আগেও করেছি, আরো একবার না হয় করব। যদি বলো

বরাবর থাকবে, তবু বিশ্বাস করতে হবে। কিন্তু করেই বা কী শাস্তি আছে। আর, কতটুকুই বা বাকি আমার জীবনে। ষোলয় বিয়ে হয়েছিল, কুড়ির মধ্যে দু'জনকে পেয়েছি। তখন কত সাধ আহ্লাদ ছিল; কিন্তু একসঙ্গে থাকতে পারিনি। তখন তুমি কেবল দূরে দূরে থেকেছ, পালিয়ে পালিয়ে বেরিয়েছ। বছরের পর বছর আমাকে পড়ে থাকতে হয়েছে বাপের বাড়িতে—

—কিন্তু বিভা, এখানে তো তোমার কোন অনাদর—

—বলতে দাও। বিয়ের পরও দিনের পর দিন বাপের বাড়ি পড়ে থাকার কী-যে গ্লানি সে তুমি বুঝবে না। আজ তুমি ফিরে এসেছ, ভাল। চল্লিশ বছর পরমায়ু যার, বত্রিশ বছর বয়সে ঘর বেঁধে তার কী সুখ।

এতক্ষণে কেঁদে ফেলেছেন মা। সব কথা বলতে পারার আনন্দের কান্না। বাবা আস্তে আস্তে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন।

—এতদিন মুখ বুঁজে খেটেছি। উদয়াস্ত পরিশ্রম করেছি এ সংসারের জন্যে। তবু মন ভরতনা, সব কিছুর মধ্যে একটা ফাঁক থেকে যেতো। মনে হোত এ যেন আমার নিজের না—

—কিন্তু তোমার ছেলেমেয়ে তোমার কাছেই ছিল, বিভা। তোমার বাবা ছিলেন।

—বাবা ছিলেন, কিন্তু তাঁকে দেখা শুনা করবার জন্যে শোভা ছিল। আর ছেলেমেয়েরা, ওরা জ্ঞান হয়ে অবধি নিজের ঘর দোর চিনলোনা—

—সব বুঝি। কিন্তু তবু কর্তব্যের ডাক এলে কিছুতেই যে ঘরের কোণে ব'সে থাকতে মন সায় দেয় না।

—আমি জানি। দীর্ঘশ্বাস ফেলে মা বললেন, তুমি তা পারবেনা। ঘরে বসে থাকতে থাকতে তুমি হাঁপিয়ে উঠবে। নিজেকে তখন অপরাধী মনে হবে আমার, আমিও বাঁচবনা। তার চেয়ে, মা ম্লান হেসে বললেন,

এই ভালো। দু'জনে মিলে মরবার কোন অর্থ হয় না। একজন তো বাঁচুক।

—ছি বিভা।

মা নিজেই কখন উঠে বসেছেন বিছানায়। বাবার কাঁধে মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। ঈস, কত রোগা হয়ে গেছ তুমি। হাড় ক'খানা গোনা যায়—

বাবা অল্প একটু হাসলেন। জেলখানাটাকে লোকে শ্বশুর বাড়ি বলে বটে বিভা, কিন্তু আরামের ষ্ট্যাণ্ডার্ড দু'টোর ঠিক এক রকম নয়।

—তুমি শোও, আমি হাওয়া করি।

ঘোমটা খসে পড়েছে মার। যত্ন করে বাঁধা খোঁপার একাংশ দেখা যাচ্ছে। মাকে এর আগে ভালো করে চুল আঁচড়াতে পর্যন্ত দেখা যায়নি।

বাবা হাত বাড়িয়ে একটি একটি করে চুলের গুচ্ছ সরিয়ে দিতে থাকলেন কপাল থেকে।—ঈস্, এত রাগ ছিল, কিন্তু সাজতে ভোলনি দেখছি।

দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেললেন মা।

লজ্জা পেলে মাকেও এমন ছেলেমানুষের মত দেখায়।

—আমি কী করব। শোভা জোর করে খোঁপা বেঁধে দিলে।

শোভা বড়মাসিমার নাম।

—রাগ পড়েছে? বাবার গলা অত্যন্ত নীচে নেমে প্রায় ফিস-ফিসের মতো শোনাচ্ছে।

—পড়েছে। মার গলা ধরা-ধরা।

—তুমি কাঁদছ বিভা, এখনো?

—কাঁদব না?

এক হাতে মার আঁচলটা নিয়ে বাবা চোখ মুছিয়ে দিতে লাগলেন,

আর, সেই সময়ে কী হ'ল শুভাশীষের, এতক্ষণ নিঃশ্বাসটুকু বন্ধ করে ছিল, এবার হঠাৎ কেঁদে উঠল।

ধড়মড় করে উঠে বসলেন বাবা। মা মাটিতে নেমে পড়ে ওর বিছানার কাছে চলে এলেন।

—খোকা ভয় পেয়েছিস?

জবাব দিলোনা শুভাশীষ, দিতে পারলো না। বালিসটা ভিজে গেল, পিঠটা উঠল দুলে দুলে। গালের ওপর মার নুয়ে পড়া ভিজে চোখ দু'টির স্পর্শ পাওয়া যাচ্ছে। ওর পাশ বালিসটা ঠিক করে দিলেন, মশারির পারটা আবার ভালো করে গুঁজে দিলেন।

—কিছু ভয় নেই, ঘুমো। এই তো আমি ওখানেই রয়েছি।

ওর বিছানার ধারে দাঁড়িয়ে আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন মা। তারপর আলো নিবিয়ে শুতে গেলেন।

ভোর হতে তখনো অল্প বাকি, দেবাশীষের ডাকে ঘুম ভাঙলো।

—খোকা ওঠ।

এত ভোরে উঠতে ইচ্ছে ছিলনা শুভাশীষের। দু'একবার এ-পাশ ও-পাশ করলে। কিন্তু উঠতে হল শেষ পর্যন্ত।

ওকে বারান্দায় নিয়ে এলো দেবাশীষ।

—সূর্য ওঠা দেখেছিস কখনো। ওই গাছগুলোর পিছনে, কী টকটকে লাল রঙ ফেটে ফেটে যাচ্ছে দেখ্। আজ আকাশটা পরিষ্কার, সারাদিন রোদ থাকবে দেখিস। রোজ সকালে উঠে কী করিস। সূর্যস্তব পড়বি। সূর্যস্তব জানিস? জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্। নমস্কার কর এই মহাদ্যুতি সূর্যকে।

তারপর? তারপর ব্যায়াম করবি। কী রোগা তুই। দুর্বল শরীর কখনো শক্ত মনের আধার হয়না।

—চলো বাবা, বেড়িয়ে আসি।

—বেড়াবি? খুশি হয়ে দেবাশীষ বললে, চল তবে নৌকোয় করে, কী বলিস। কালকের মতন?

—তাই চলো।

দাওয়া ঘিরে এক ইঞ্চি একটা দাগ। জল কমেছে।

—বাবা!

—কী রে?

—চলো ননীকে ডেকে নিই। বেশি দূরে তো নয়, সামনেই ওদের বাড়ি।

ননীকে সঙ্গে পেলে গল্প করার লোকও হবে, আর বাবার সঙ্গে একলা মুখোমুখি বসে থাকার যে অস্বস্তি, তাও কেটে যাবে। কাল রাত্রে ড়ুকরে একবার কেঁদে উঠেছিল, সে লজ্জাটা কোনমতে ভুলতে পারছে না।

ননী? বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, ননী কে?

—আমার বন্ধু।

বাবা আর কিছু না বলে নৌকোটা ঘুরিয়ে নিলেন ননীদের ঘাটের দিকে।

তখন ননীদের বাড়ীর মুরগি ডেকেছে, কিন্তু বাড়ীর লোক কেউ ওঠেনি। কেবল মিশনের জমাদার তার প্রাত্যহিক কৃত্য সেরে গেছে।

বাবাকে ঘাটে বসতে বলে শুভাশীষ ওদের বাড়ীর বারান্দায় উঠে এলো। সেখানে অপেক্ষা করল কিছুক্ষণ। ভেতর থেকে টুংটুং শব্দ আসছে। শুভাশীষের গা একবার ছমছম করে উঠল। আধ-পাগলা ফিরিঙ্গি জনসনের ভূত এখনো পিয়ানো বাজায় নাকি; পিছনে চেয়ে দেখল, বাবা বসে আছেন। পূব দিকটা আরো ফরসা হয়ে এসেছে। ভয় কী।

সাহস করে কড়া ধরে নাড়লো।

জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে রুচিদি জিজ্ঞাসা করলেন,—কে? ও শুভাশীষ? এসো।

রুচিদি উঠে এসে দরজা খুলে দিলেন। এসো। বাইরের এই ঘরখানা রুচিদির। বিয়ের আগে ভেতরের দিকে থাকতেন। বিধবা হয়ে ফিরে এসে এইটে বেছে নিয়েছেন।

ছোট ঘরটায় ঢুকতেই বড়ো পিয়ানোটা প্রথমে চোখে পড়ে। আওয়াজটা ভৌতিক নয় তবে। পিয়ানোর ডালার ওপর দু'টো মোমবাতি পুড়ে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যাবার চিহ্ন আছে। তৃতীয় একটিও সারা হয়ে এলো।

পিয়ানোটা, শুভাশীষের মনে হ'ল, সে চেনে। এটাকে বহুবার তো দেখেছে জনসনের বাংলোয়। চটা চটা পুরনো বার্ণিস,—এটাকেই না নীলামে বিক্রী করতে জনসনকে বাধ্য করেছিলেন রুচিদি? এই অপয়া জিনিষটি আবার এখানে এলো কোথাথেকে। এটার ওপর কী বিরাগ ছিল রুচিদির, তার সাক্ষ্য আছে ইষ্ট কেবিনটার ধারে জনসনের চাপা চাপা রক্তে কালো-হয়ে-যাওয়া শ্লিপারে।

—প্র্যাকটিশ করছিলুম। রুচিদি অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে হেসে বললেন। এটাকে আমি আবার কিনেছি। কৈফিয়তের স্বরে বললেন, কী করব, একটা কিছু নিয়ে সময় কাটাতে হবে তো।

ডালার ওপর জনসনের একটা ছোট আবক্ষ প্রতিকৃতি। বুকখোলা হাফশার্টের নিচে রোমশ বুক, ঠোঁট দু'টিতে সামান্য একটু হাসি।

শুভাশীষের কেমন মনে হ'ল, এখুনি বুঝি হো-হো করে হেসে উঠবে জনসন, জীবনে যে মেয়েটিকে প্রাণপণ চেষ্টাতেও নিজের খেয়াল খুসি মত চালাতে পারেনি, জীবন দেবার পর তাকে জয় করার উল্লাস ওর পুরু ঠোঁট দুটি ধরে রাখতে পারবে না।

ননীকে আর ডাকা হ'লনা।

আবার সেই জল-থৈ-থৈ মাঠের মধ্যে নৌকা নিয়ে দেবাশীষ জিজ্ঞাসা করল, খোকা, তুই গীতা পড়েছিস ? একাদশ অধ্যায় মুখস্থ বলতে পারিস ?

ছেলেকে সঙ্কোচে মাথা নীচু করতে দেখে দেবাশীষ নিজেই অপ্রতিভ হ'ল। বাস্তবিক, এতটা ওর কাছে আশা করাই অন্যায়। তবুও এই ধূধূজল প্রান্তরে যখন সূর্য ওঠে, ছোট ছোট ঢেউগুলো বৈঠার আঘাতে ভেঙে ভেঙে যায়, আবার ওঠে, তখন কী জানি কেন, নিজেকে আর ধরে রাখা যায় না। বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে পরমাণু হয়ে মিশে যেতে ইচ্ছে হয়। এই ছেলে, এখনো কিশোর, ওর সব ভাষাও যে বোঝে না, তাকে সব কথা বলতে লোভ হয়।

পশ্যামি দেবাংস্তবদেহে

সর্বংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্—

এ হ'ল বিশ্বরূপ দর্শন। বুঝলি ! কী দেখছিস অবাক হয়ে।

তুমি কী চমৎকার পড়তে পারো বাবা।

আরো অনেক কিছু পারি। আজ শুধু অনর্গল কথা বলে যেতে ইচ্ছে করছে দেবাশীষের। দু'টো সুর মনে বাজছে। এই দিক্ খোলা মাঠে টলমল নৌকোয় বসে কেমন মনে হয় সে সকলের, তেমনি এই কিশোরের মুগ্ধ-ভীরু চোখের দিকে তাকালে মনে পড়ে, সে এদেরো। সমস্ত যৌবন সহস্রের মধ্যে ফুরিয়ে দিয়ে এ কোন্ মায়ার জালে জড়িয়ে পড়ছে।

নিজের কাছে নিজেরি অবাক লাগে। বেশ তো ছিল দূরে দূরে, মিছিল, মিটিং আর জেলে যাওয়া নিয়ে, হঠাৎ ফিরে এসে আবার এই সোনার শিকল পরার কী প্রয়োজন ছিল। ধীরে ধীরে যেন নিস্তেজ হয়ে পড়ছে। জড়িয়ে যাচ্ছে নরম অথচ অস্বস্তিকের উর্ণাতন্তুতে।

ঘর বাঁধবে কথা দিয়েছে বিভাকে। কিন্তু নিজের চারধারে দেয়াল

রচনা করে বন্দী হয়ে বাস করতে ভালো লাগেনা দেবাশীষের। ওর ভেতর কোথায় যেন অস্থির একটা সত্তা আছে, যে স্থাণু হয়ে থাকতে পারেনা এক জায়গায় বেশি দিন। সব ছেড়ে ছুড়ে পাগলের মত বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে হয়।

—আচ্ছা বাবা, তুমি দেশকে খুব ভালবাসো ?

ছেলের কথায় চমক লাগল। হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন করল। ওর মনের দুর্বলতা কি চোখে মুখে ফুটে উঠেছে কোথাও, যা শুভাশীষের কাছে ধরা পড়ে গেছে। দেশকে ভালোবাসা। ছেলেমানুষ, ও কি জানে এ দেশই আমাদের নয়। "স্বদেশ স্বদেশ করিস কারে, এ দেশ তোদের নয়। এ যমুনা গঙ্গা নদী, তোদের ইহা হ'ত যদি, পরের পণ্যে গোরা সৈন্যে জাহাজ কেন বয়।"

—খোকা তুই 'বন্দে মাতরম্' গান শুনেছিস ?

শুভাশীষ ঘাড় নাড়লে।

—পড়িসনি ? সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং—? আনন্দমঠে আছে। পড়িস। বঙ্কিমবাবুর বই আনন্দমঠ।

—মা নবেল পড়তে দেয় না বাবা।

—মা পড়তে দেয়না ? তাইতো এক মুহূর্ত কী চিন্তা করল দেবাশীষ। একটা কাজ করতে পারিস না ? লুকিয়ে পড়তে পারিস না ?

—দিদি পড়ে বাবা! মাকে লুকিয়ে নবেল পড়ে। আমি দেখেছি।

—পড়ে নাকি। দেবাশীষ শুধু একটু হাসল। কোন কথা বলল না।

ফিরতে ফিরতে সেদিন দেবাশীষের মনে হয়েছিল, এ এক মন্দ খেলা না। রোজ ছেলেকে নিয়ে নৌকা করে বেরিয়ে পড়া, প্রায় অভিসারের মতন। সবার সম্মুখে যে কথা বলা যায় না, সে কথাই সে এখানে এনে বলে ছেলেকে। এখনো কাঁচা মন ওর, ওকে মনের মত করে তৈরি

করতে পারে যদি, তবেই কাজ ফুরালো! তারপর আবার বুঝি পথের নিমন্ত্রণে বেরিয়ে পড়তে পারবে। প্রতিনিধি তো রইল।

মাঝে মাঝে নিজেরি সন্দেহ হয়, দেশকে ভালোবাসে না। রক্ত-মাংসে গড়া আপনজনকেই যে স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারেনি, সে কি করে পারে দেশ নামে একটা ভাবমাত্রকে ভালবাসতে। আসলে হয়ত ওর মধ্যে যে দুর্নিবার চাঞ্চল্য আছে তারি তাগিদে হয়ত বেরিয়ে পড়েছে লাঞ্ছনাকণ্টকিত পথে; দেশসেবা উপলক্ষ্য মাত্র। দেশের মুক্তির ছলে দেবাশীষ কি নিজেরই মুক্তি খুঁজছে।

দুপুর বেলা খেতে বসে দাদু সেদিন বললেন, মিউনিসিপালিটিতে একটা চাকরি খালি হচ্ছে দেবাশীষ, বলো তো তোমার জন্যে চেষ্টা করি, মাইনে অবিশ্যি বেশি না, আপাততঃ চল্লিশ। আমি বলি, তা হোক না। ঘরের খেয়ে কাজ করবে, আমি আর ক'দিন বলো। তোমাকে একটু প্রতিষ্ঠিত হতে দেখলে শোভাকে নিয়ে আমি হয়ত কাশীটাশী চলেও যেতে পারি।

উৎসুক চোখে দাদু বাবার দিকে চেয়েছিলেন, বাবা কি জবাব দেন তার অপেক্ষায়। বাবা মাথা নীচু করে মুখে গ্রাস তুলছিলেন। কোন কথা বললেন না।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে দাদু আবার বললেন, তোমার কী মত?

মত? বাবা এতক্ষণে যেন শুনতে পেলেন,—

—হ্যাঁ, তা মন্দ হয় না। ঘরের খেয়ে কেরাণীগিরি করা মন্দ কী।

গলায় এতটুকু চাঞ্চল্য নেই, স্পষ্ট বোঝা যায় না, দেবাশীষ পরিহাস করছে কিনা।

—আমি তাহ'লে চেষ্টা করি? কমিশনার দু'চারজনকে বলেই রেখেছি। হয়ে যাবে হয়ত।

—দেখুন। তা বেশ, দেখুন না। দেবাশীষ বললে, তারপর যথারীতি মুখে গ্রাস তুলতে লাগল।

খাওয়ার শেষে দেবাশীষ বারান্দায় এসে একটা বিড়ি ধরালো। তার জন্যে শেকলের ব্যবস্থা হচ্ছে মন্দ না। মেয়েকে দিয়ে বাঁধতে পারেন নি, এবার শ্বশুর ম'শায় চাকরি দিয়ে বাঁধতে চান। সাধারণ মানুষের দুরাশার ওপর অনুকম্পা এলো দেবাশীষের মনে। বিড়িতে আরো জোরে জোরে টান দিতে লাগল।

সামনের দিগন্ত-ধোওয়া অভ্রশুভ্র জলের দিকে তাকিয়ে দেবাশীষ ভাবলে, তা হয় না। এই যাযাবর বৃত্তি আছে তার রক্তে। যৌবনে বাবাও তার এমনি সব ছেড়ে ছুড়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন। তিন চারটে ভাষা আয়ত্ত ছিল তাঁর, ইংরাজি-বাংলা-সংস্কৃত ছাড়া ফার্শী ভাষাটাও ভালো জানতেন। ঢাকায় ভালো চাকরিও করছিলেন। সন্ধ্যা বেলা কমিশনার সাহেবকে শেখাতেন বাংলা। দিব্যি সচ্ছল অবস্থা, হঠাৎ একদিন নিরুদ্দেশ হলেন। তখন দেবাশীষ কত ছোট। প্রায় ছ'বছর কোন খবর পাওয়া যায়নি। তারপর একদিন খবর এলো বাবা আছেন প্রয়াগে! দেবাশীষ সেবার এনট্রান্স পাস করেছে। মাকে নিয়ে গিয়েছিল প্রয়াগে। তখনকার দিনে যাতায়াতের সে কী কষ্ট।

প্রয়াগেই মা মারা গেলেন, মাত্র দু'দিনের কলেরায়। তখনো বাবার খোঁজ পাওয়া যায়নি। খোঁজ পাওয়া গেল যখন দেশে ফিরে আসার সময় হয়েছে। শেষের ক'দিন বাবা ওর সঙ্গেই ছিলেন।

সেই সময়েই কি মনে মনে সংসারের প্রতি একটা বিয়োগ এসেছিল। গঙ্গাতীরে মার চিতাগ্নির সঙ্গে সঙ্গে কিছু দূরে দূরে হিমতুহিন বালিয়াড়ির ওপর সাধুদের জ্বালানো অগ্নিকুণ্ড থেকে নির্গত ধূমে যে মিলিত ঔদাস্যের সৃষ্টি করেছিল, তার নিবৃত্তি আজো হ'ল না।

এই বৈরাগী মন তার উত্তরাধিকারী। একদিন সেও নিশ্চিহ্ন হয়ে

যাবে, কিন্তু এই মন থাকবে তখনো;—কার মধ্যে? হয়তো শুভাশীষের। পুরুষের পর পুরুষ ধরে এই মন বেঁচে থাকবে পোষ-না-মানা শোণিত প্রবাহে, কারণহীন পথচলায়।

একটু শিউরে উঠল দেবাশীষ, আরো জোরে জোরে বিড়িতে টান দিতে লাগল। এই অস্থির অস্বস্তি দূর হোক।

ঘরের ভেতর থেকে টুকরো টুকরো কথা কানে এলো। আমি ওকে বলেছি মা, তুই একটু বলিস। রাজি হতেও পারে।

—বলব, বাবা। কিন্তু রাজি কি হবে?

—বলা যায় না। হতেও পারে। ছেলেটার আর মেয়েটার মুখ চেয়েও যদি —

—আর কিছু বলতে হবে না বাবা। আমি বুঝেছি।

বিচিত্র হাসি ফুটলো দেবাশীষের মুখে। এই ষড়যন্ত্র-কারীরা চায় কী। একেবারে গৃহপালিত স্নেহলালিত জীববিশেষ করে তুলতে চায় তাকে।

সেদিন রাত্রেও আলো নেবানোর পর শুভাশীষ ঘুমোয়নি। অনেকক্ষণ উৎকর্ণ হয়েছিল মা-বাবার আলাপ শোনার জন্যে। এইটুকু বুঝতে তার বাকি নেই আর পাঁচ-জনের মতো ন'ন তার বাবা, আর মার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কও সহজ নয়। কী কঠিন বিরোধ আছে দু'জনের মধ্যে, এক পক্ষের অজস্র অশ্রুপাতে সেটা মাঝে মাঝে নরম হয়ে আসে বটে, কিন্তু নিশ্চিহ্ন হয় না কখনো। সন্ধিক্ষণের পরমুহূর্ত থেকেই আবার বিদ্রোহের বীজ অঙ্কুরিত হতে থাকে।

একটু বুঝি ঝিমিয়ে পড়েছিল, হঠাৎ মার গলা শুনতে পেল: তুমি তাহ'লে এ চাকরি করবে না?

—না। তুমি তো জানো,—বাবার গলাও উত্তেজিত, যে রক্ত মানুষকে মাথা নীচু করে গোলামি করতে শেখায় তা আমার শরীরে নেই।

—কী, তুমি আমার বাবাকে অপমান করলে? জানো, আমার বাবা চাকরি করেছিলেন তাই এখনো দু'মুঠো জুটছে।

—কাউকে অপমান আমি করিনি। কোন কোন বিষয়ে আমার নিজের অক্ষমতার কথাই স্বীকার করেছি। তোমার বাবাও যে কেরাণী ছিলেন, সেটা আমার খেয়াল ছিল না।

—খেয়াল তোমার ছিল। নিশ্চয় ছিল। ইচ্ছে করেই—

—মিছিমিছি ঝগড়া কোরো না বিভা। সহজ কথা সহজভাবে নিতে শেখো।

মার আর জবাব শোনা গেল না। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে দেখে শুভাশীষ একসময় ঘুমিয়ে পড়ল।

শেষ রাতে ঘুম ভেঙ্গে দেখে মা কখন পাশে এসে শুয়েছেন। মাও ঘুমোন নি বুঝি। এক দৃষ্টে চেয়ে আছেন শুভাশীষের মুখের দিকে।

শুভাশীষকে চোখ মেলতে দেখে মা আরো কাছে এসে বললেন,—খোকা, উঠেছিস? তোকে একটা কথা বলব খোকা।

জানালা দিয়ে শেষ রাতের ফিকে একটু জ্যোৎস্না এসে পড়েছে মার মুখে। একটু আগেও মা কেঁদেছেন, বোঝা যায়, কিন্তু চোখ দু'টো এখনো জ্বলছে। ভিজে চোখও তবে জ্বলে!

—তোকে একটা কথা বলব খোকা।

কণ্ঠস্বরের কাঠিন্যে একটু চমকে উঠল শুভাশীষ, উৎসুক চোখে চেয়ে রইলো।

দ্রুতবেগে, প্রায় এক নিঃশ্বাসে, মা বললেন, আমার কাছে প্রতিজ্ঞা কর খোকা, ওঁর কোনও কথা কখনো শুনবি না।

বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে গেল শুভাশীষ। একটু পরে বলল, কোনও কথা না মা?

—কোনো কথা না। কাছে পর্যন্ত যাবি না। বলতে বলতে চোখে আবার জল দেখা দিল মার,—কিন্তু পুকুরের ঘাটে ডুব দেওয়া চাঁদের মতো তখনো মণি দু'টো জ্বলছে—কতো দুঃখে তোকে একথা আমাকে বলতে হচ্ছে, তুই এখন বুঝবিনা, বড়ো হ'য়ে বুঝিস। এইটুকু জেনে রাখ ওর চেয়ে বড়ো শত্রু আমার আর কেউ নেই। সারা জীবন আমাকে শুধু দুঃখই দিয়েছে। তোদের মুখ চেয়ে বেঁচে ছিলাম,—তোকেও ছিনিয়ে নিতেই বুঝি এসেছে। আমাকে ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা কর খোকা, ওর কোন কথা শুনবি না, কাছেও ঘেঁষবিনা?

মার কঠিন আলিঙ্গনের মধ্যে কাঁপছিল শুভাশীষ। মাকে ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করতে হ'ল, কখনো বাবার কোনো কথা শুনবে না, কাছেও ঘেঁষবেনা কখনো।

অনেকক্ষণ স্তব্ধতার পর শুভাশীষ ফিস ফিস করে জিজ্ঞাসা করল, বাবা কোথায় মা।

—কে জানে। দুপুর রাতে নৌকা নিয়ে বেরিয়েছে। তোকেও ডেকেছিল, সাড়া পায়নি।

.

দু'দিন পরে জল একেবারে নেমে গেল। মিউনিসিপাল সড়কের ধারে মরা ঘাস দেখা দিল একটি দু'টি করে। কচুরিপানাগুলো এলো হলুদ হয়ে।

চারুর জ্বরটা আবার বেড়েছে। মাসিমা মাথার কাছে বসে জলপটি দিচ্ছিলেন। বাবা আস্তে আস্তে হাওয়া করছিলেন, দাদু গেছেন ডাক্তার বাড়িতে।

সে দিন বিকেলে সরমাদি এলেন। শুভাশীষই দরজা খুলে দিলে।

ওর দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললেন, কী জল, কী জল।
এ ক'দিন আর বাড়ি থেকে বেরুতে পারি নি। শুনলাম চারুর অসুখ।
এক ঘটি জল এনে দেবে ভাই? পা দু'টো কাদায় ভরে গেছে।

জল এনে দিতে সরমাদি পায়ের কাপড় একটু উঁচু করে ধরলেন, কাদামাখা পাতা দু'টির ওপর শুভ্র পা দুটির একাংশ দেখা গেল। জলের ঘটির জন্যে সরমাদি হাত বাড়িয়েছিলেন, হঠাৎ কী খেয়াল হ'ল শুভাশীষের, বলে উঠল, আপনি থাকুন সরমাদি, আমি জল ঢেলে দিচ্ছি পায়ে।

সরমাদি বেশী আপত্তি করলেন না, কাপড়টা আরো সমান্য একটু তুলে ধরলেন। আর তার পায়ের কাছে জলের ঘটিটাকে নিঃশেষে ঢেলে দিতে দিতে শুভাশীষ কিছুতে বুঝতে পারলো না, কারণে অকারণে আজকাল জিভ্ কেন শুকিয়ে আসে, কাণ দু'টো ঝাঁ ঝাঁ করে।

গামছা দিয়ে সরমাদির পা দু'টো মুছিয়ে দিতেও লোভ হয়েছিল, কিন্তু সরমাদি তা হতে দিলেন না।

ঘরে ঢুকে পড়ে কিন্তু পিছিয়ে যেতে হয়েছিল সরমাদিকে। মাথায় ঘোমটা টেনে পেছন ফিরে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, মাসিমা তাকে ডাকলেন, এসো সরমা। লজ্জা কী। ইনি আমার জামাইবাবু। চারুর বাবা।

সামান্য চেষ্টাতেই সহজ হয়ে যাবার ক্ষমতা সরমাদির অসাধারণ। নিমেষে সংকোচটুকু জয় করে বললেন, তাই নাকি। হাত দুটি যুক্ত করে কপালে ঠেকিয়ে, বললেন, তবে তো আপনি আমারো জামাইবাবু।

চারুর শিয়র ঘেঁষে তক্তপোষের ওপরই বসে পড়লেন।

মা রান্নাঘরে চারুর জন্যে পথ্য তৈরি করছিলেন। শুভাশীষ এসে জিজ্ঞাসা করল, মা?

—কী, রে।

—আচ্ছা মা, বাবা যদি সরমাদির জামাইবাবু হন, তবে আমি কী বলে ডাকব সরমাদিকে? সরমামাসি বলব?

—সরমা এসেছে বুঝি? কেমন অদ্ভুত অপলক চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন মা। তারপর বললেন, তুই সরমাদিই বলবি। পাতানো সম্পর্ক অতো সব ধরে না।

ছয়

মা একবার এসে ধমক দিলেন, তোমরা কী এত বকছ মেয়েটার শিয়রে, তখন থেকে। মেয়েটা আজ ক' হপ্তা থেকে ভুগছে, ওর কানের কাছে এত চেঁচালে—

সরমাদি কুণ্ঠিত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন, তাই তো বেলা গেছে, একেবারে খেয়াল ছিল না? আমি তা হ'লে আজ চলি জামাইবাবু।

বাবা বললেন, আরে, এখুনি যাবে কী বলছ। এখনো যে ভালো করে সব কথা জানাই হ'ল না।

—নাঃ, চারুর অসুখ।

—অসুখ তাতে কী হয়েছে। একলাটি পড়ে আছে, বরং আশে পাশে কেউ কথা কইলে ওর ভালোই লাগবে, কী বলিস চারু?

বিছানার সঙ্গে লেগে যাওয়া শরীরটাকে একবার নাড়তে চেষ্টা করলে চারু। অস্ফুট স্বরে কী বললে বোঝা গেল না, কিন্তু ক্ষীণ হাসি থেকে অনুমান করা গেল দেবাশীষের প্রস্তাবে ওর আপত্তি নেই।

—বোসো সরমা। আরেক কাপ করে চা দাও। চা খাবে তো সরমা?

মা রান্না ঘরে চলে গেলেন। বাবার দিকে মুখ করে সরমার পিঠ ঘেঁসে তক্তপোষের ওপর বসল শুভাশীষ।

—নলখালির মেয়ে তুমি? তোমাদের ওখানে আমি একবার গিয়েছিলাম যে। ফ্লাড রিলিফের কাজ নিয়ে। ফ্লাড হয়েছিল একবার খুব

বড় রকম, মনে নেই? তখন তো তুমি খুব ছোট ছিলে। বয়স কত তোমার?

বয়সের প্রশ্নে সরমাদি একটু কুণ্ঠিত হয়ে পড়লেন। চারু বলে উঠলো, আঠারো, বাবা!

আঠারো! বাবা মনে মনে হিসেব করে বললেন, আমি যখনকার কথা বলছি সে আরো আগে। আমরা তখন কলেজে পড়ি কত বয়স বলো তো আমার?

সরমা স্মিত মুখে চেয়ে রইলো, কোন জবাব দিলনা।

বাবা নিজেই মনে মনে খানিক হিসেব করে বললেন, ছত্রিশ সাইত্রিশ। তোমার বয়সের ডবল।

—আপনি সব দিক থেকেই আমার চেয়ে ঢের বড়। সরমাদি বললেন।

এতক্ষণে বাবা প্রাণ খুলে হো-হো করে হেসে উঠলেন, ঢের বড়? কেন, বার কতক জেল খেটেছি বলে? দেশকর্মী বলেই এতখানি শ্রদ্ধা করো না, সরমা, ভালো করে দেখার সুযোগ পেলে দেখবে আমাদের মধ্যেও অনেক খাদ আছে, অনেক ফাঁকি।

খানিকক্ষণ থেমে বাবা হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, তোমার কত বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল সরমা?

—ষোলয়।

—আর বিধবা হয়েছ সতেরোয়? বাঃ, চমৎকার। এরি মধ্যে সব কিছু চুকে গেছে, সমাজের চোখে তুমি মৃত।

বাবার কণ্ঠস্বরে একটা ঐকান্তিকতা ফুটে উঠল। সরমাদি আস্তে আস্তে শুভাশীষের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে সরমাদি উঠে দাঁড়ালেন। সন্ধ্যে হ'ল, আজ চলি, জামাইবাবু।

—তাইতো, অন্ধকার হয়েছে দেখছি। একলা যেতে পারবে? চল তোমাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।

মা এলেন। বাবা ইতিমধ্যেই গায়ে পাঞ্জাবী চড়িয়েছিলেন। সেদিকে চেয়ে মা বললেন, বেরচ্ছ বুঝি ?

—যাই একটু।

—সাড়ে ছ'টায় যে খুকির জ্বর দেখার কথা আছে।

খুকির জ্বর দেখা? বাবা অসন্তুষ্ট হলেন, বার বার বাধা পেয়ে। নিষ্কৃতি দিলেন সরমাদি। আপনি বাড়িতেই থাকুন, শুভাশীষ বরং আমাকে পৌঁছে দিয়ে আসুক। শুভাশীষের দিকে চেয়ে বললেন, কী ভাই, পারবে না?

পারবে না কি রকম। এত অভিমান হ'ল শুভাশীষের যে জবাবই দিলে না। সে স্কুলের "বি" টিমের লেফ্‌টইনে খেলছে না? সরমাদিকে এর আগে একদিন যাত্রা শুনিয়ে আনেনি?

রাস্তায় নেমে সরমাদি বললেন, আমি একাই যেতে পারবো ভাই। তুমি একটা কাজ করবে। ছুটে বোর্ডিংয়ে গিয়ে এই চিঠিটা দিয়ে আসবে। যার নাম লেখা আছে, তাকেই দেবে। কেই যেন না দেখে। ছুটে চলে যাও, কেমন?

আদর করে শুভা শীষের গালটা একটু টিপে দিলেন সরমাদি, চিবুক ধরে সেই হাতখানা ঠোঁটে ছোঁয়ালেন।

—এবারে যাও, কেমন?

যাবে কি, শুভাশীষ বুঝি ছুটতে শুরু করেছে। অসহ্য সুখ জ্বলছে গালে, চিবুকে। বোর্ডিংয়ের কাছাকাছি এসে টিম টিমে রাস্তার আলোয় চিঠিটার শিরোনামা পড়লে। তারপর কম্পিত হাতে খুললে ভিতরটা।

"সাড়ে ন'টা। উত্তরের দরজা। ভয় নেই। শাশুড়ির শরীর খারাপ। ইতি।"

কড়া ধরে ঠক ঠক করতেই দরজা খুলে গেল।

—কে, রে?

শুভাশীষ চিঠিটা দেখালে।

আয়, ভেতরে আয়।

উপেনদা' দরজাটা ভেজিয়ে দিলেন। ল্যাম্প্‌টা উস্‌কে চিঠিটা পড়লেন। পড়া শেষ হলে মুড়ে চিঠিটায় আগুন ধরালেন, দিলেন বাইরে ছুঁড়ে।

—তুই পড়েছিস এ চিঠি ?

শুভাশীষ অস্বীকার করলে।

—পড়িস নি ? আচ্ছা, যা।

শুভাশীষ চলে আসছিল, উপেনদা আবার ডাকলেন। এই, শোন। এই ঠোঙাটা নে। চানাচুর আছে, খাবি।

চানাচুর চিবুতে চিবুতে শুভাশীষ যখন বাড়ি ফিরলো, তখন ওর মন অনেকটা শান্ত হয়ে এসেছে। উপেনদাকে কি জানি কেন হিংসা হ'চ্ছে না, একটা অসনাক্ত সুখের শরিক মনে হ'চ্ছে।

ঘরে ঢুকতেই দিদির ককানি কানে এল। যন্ত্রণায় এপাশ ওপাশ করছে, ছটফট করছে।

—কে, খোকা ? মাকে ডেকে দিবি ভাই ? বড্ড কষ্ট হচ্ছে !

মা রান্নাঘর থেকে এলেন। কী হ'লরে চারু ?

চারু ককিয়ে ককিয়ে জবাব দিলেন, বড্ড যন্ত্রণা হ'চ্ছে মা, মাথাটা ছিঁড়ে পড়ছে।

আবার জ্বর আসবে বুঝি চারুর। মা কপালে হাত দিয়ে দেখলেন। তারপর জলপটি নিয়ে শিয়রে বসলেন। সেই সঙ্গে চাপা গলায় তর্জন চলল, মাথা ধরবেনা, জ্বর আসবেনা ? জ্বরের দোষ কী ! সারা সন্ধ্যা কানের কাছে চেঁচামেচি, তখন কিছু বলতে পারিসনি ? এখন "মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছে মা !" আমি কী জানি !

খাওয়া দাওয়া শেষ হতে হতে অনেক রাত হ'ল। শেষ ট্রেনের ঘণ্টা বাজলো সাড়ে নটা। তোমরা সব শুয়ে পড়ো, দাদু বললেন।

ঘুমে চোখ ভেঙে আসছিল, কিন্তু সাড়ে ন'টা কথাটা কানে যেতে একটু চমক লাগল। ঠিক এই সময়েই কে চুপি চুপি পা টিপে টিপে সন্তর্পণে গিয়ে দাঁড়িয়েছে একটা বাড়ির উত্তরের দরজায়। টোকা দিয়ে ইঙ্গিত করতেই, সেই দরজা গেছে খুলে। তারপর জ্বরে বেহুঁস শাশুড়ির বারান্দার সুমুখ দিয়ে বোবা পায়ে হেঁটে—সবই এখন বুঝতে পারে শুভাশীষ।

সেই সন্ধ্যার বিবরণ শুভাশীষ জেনেছিল। অনেক অনেক দিন পরে। সরমাদিই বলেছিলেন। তখন কোন সঙ্কোচ ছিলনা সরমাদির, পায়ের নিচে শক্ত মাটি পেয়েছেন, পুরনো দিনের পা-পিছলানোর গল্প বলতে গলা কাঁপেনি।

সরমা বলেছিল, কী নেশায় পেয়েছিল, পাগলের মত হয়ে গিয়েছিলাম। আবার সার্থক হবো, বিয়ে করব। পরপুরুষ মেয়ে মানুষকে বিপথে নেয়না ভাই, পুরোবয়সের মেয়ের কানে কানে মন্ত্র দিয়ে ফুসলায় তার শরীর তার নিজের শরীর। সেদিন কী হয়েছিল শোন।

সরমার বর্ণনায়, সেদিনের ঘটনাটা শুভাশীষের চোখে ছবির মত ভেসে উঠেছিল।

উপেন খিলটা এঁটে দিতে যাচ্ছিল, সরমা ইঙ্গিতে নিষেধ করলে। না, থাক।

—ভেজানো থাকবে? কেউ যদি—

—কেউ আসবে না।

কী একটা কঠিন আদেশের ভঙ্গি আছে সরমার গলায়, অমান্য করা চলে না। ইঙ্গিতে উপেনকে বসতে বলল ওর পাশে।

—ডেকেছ কেন।

দু'হাত দিয়ে সরমাকে বেষ্টন করে উপেন জিজ্ঞাসা করেছিল, কিন্তু সরমা ধীরে ধীরে নিজেকে মুক্ত করে নিলে।

—আজ ক'লকাতার চিঠি পেয়েছি।

—কী চিঠি।

—কী আশা কর। দাদা মত দেননি। বরং আমাকে অকথ্য কটু সম্ভাষণ করে অনেক হিতকথা শুনিয়েছেন। ব্রহ্মচর্যের পবিত্রতা, বৈধব্যের নৈতিক আদর্শ, দেহের অনিত্যতা, ঈশ্বরের মধ্যেই স্বামীকে পাওয়ার উপদেশ। চিঠির শেষের দিকটায় একটা ভয় দেখানো আছে। আমি যেন এসব অসৎ সংকল্প ত্যাগ করি, যে আমাকে বিয়ের লোভ দেখিয়েছে তার সান্নিধ্য বর্জন করি। নইলে তিনি আমার চিঠির নকল পাঠাবেন শাশুড়ির কাছে। ক'লকাতায় তাঁর বাসায় তো আমার স্থান হবেই না, এমন কি এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে।

—হুঁ।

—তুমি এবারে কী করবে উপেন?

—বৌমা, ও বৌমা! ক্ষীণ, কাঁপা গলা শোনা গেল সরমার শাশুড়ির। কার সঙ্গে কথা বলছ?

সরমা উঠে গিয়ে দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়াল। বুড়ি বাতে উঠতে পারেনা, বিছানায় চেঁচাচ্ছে।

—কথা তো বলছি না মা মন্ত্র পড়ছি।

—মন্তোর পড়ছ?

—হ্যাঁ, মা। সেই যে আপনি শোবার আগে যেটা পড়তে হয় বলে মুখস্ত করিয়েছিলেন,—শয়নে পদ্মলাভঞ্চ,—বিবাহে চ প্রজাপতিং। দুঃস্বপ্নে স্মর গোবিন্দং,—সেইটে।

—পড়। পড়। শাশুড়ির রুগ্নকণ্ঠ খুশি শোনাল।

দরজাটা আবার ভালো করে ভেজিয়ে দিয়ে সরমা ফিরে দাঁড়াল।

—তুমি এবার কী করবে ঠিক করলে।

আমি, আমি,—তুমি যা বলবে। এখন এস।

উপেন ফের টানল সরমাকে। সরমা নিজেকে ছাড়িয়ে নিল।

—দেখ, সাহস আছে তোমার? একটা দুঃসাহসিক কিছু করতে হবে।

সাহস? উপেন একবার নিজের সুপুষ্ট পেশির দিকে তাকালে, তারপর সরমার চোখের দিকে ;—আমার সাহস নেই?

—আছে তো? ব্যস। তা হলেই হ'ল। একটা সঙ্কল্প মাথায় এসেছে আমার। আরেকটু ভেবে তোমাকে চিঠিতে জানাব। সেই ভাবে কাজ করতে হবে। পারবে?

—পারবো, উপেন বললে, এবারে আলোটা নিবিয়ে দিই?

—দেব, আমিই নিবিয়ে দেব। সরমা অদ্ভুত গলায় বললে, চল তোমাকে আগে এগিয়ে দিয়ে আসি—

—আমি, আমি কোথায় যাব? উপেন সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলে।

—কেন, বোর্ডিংয়ে।

—বাঃরে, বোর্ডিংয়ের গেট বন্ধ হয়ে যায় নি?

—গেলেই বা।

—আমি কি তবে সারারাত পথে পথে ঘুরব?

—ঘুরলেই বা। বাঃ রে, সরমা ছেলে মানুষের মত খিল খিল করে হেসে উঠল, আমি কী করব। তুমি কী ভেবেছিলে আমি তোমাকে রাতে শোবার নেমন্তন্ন করে এসেছি? ওঠো আর সময় নষ্ট করো না। বুড়ির আবার কান সজাগ।

আলো নিয়ে সরমা বারান্দায় এল। সাবধানে দেখে এস। ফিস ফিস করে বললে।

—বৌমা, কোথায় যাচ্ছ।

—কলতলায়, মা।

—ও। বুড়ি নিশ্চিন্ত হয়ে পাশ ফিরে শু'ল।

খিড়কিতে আলো ধরে সরমা বললে, এই, শোন।

—কী।

—আমাকে একটা জিনিষ দেবে?

—কী? না আগে বলো দেবে। কী জিনিষ বলোই না। না একটা খদ্দরের শাড়ী। ওঃ, এই। উপেন হেসে ফেললে। কখানা চাই, বল না। হঠাৎ এ শখ যে।

—সবাই পরছে। মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়—

—কালই দিয়ে যাব। প্রতিশ্রুতি দিয়ে উপেন একবার ফিরে চাইলে। এমন যে তেজী মেয়ে সরমা, আবদার করে যখন, তখন যেন ছেলে মানুষের মতো হয়ে যায়। এবার আর কোন বাধা উপেন মানলে না, বলিষ্ঠ দু'হাতে টেনে নিলে সরমাকে। কোলে করে টেনে নিলে বুকের ওপর, মুখের কাছে। ঠোঁটের কাছে ঠোঁট এনে বললে, এবার?

সরমা এবারে আর বাধা দিলে না। থর থর দশটা আঙ্গুল সহকারে পুরুষের বলিষ্ঠ পিঠে মিশে গিয়ে আশ্রয় খুঁজল। আলোটা গড়িয়ে গড়িয়ে কখন নিজে থেকেই নিভে গেছে। অসংখ্য তারার নিচে আধবোঁজা কুঁড়ির মত দুটি চোখ ঈষন্মুক্ত থর-থর ওষ্ঠাধরের সতীন হয়েছে।

ঘরে ফেরবার আগে সরমা কলতলায় চোখে মুখে জল দিলে, সারা দেহে আগুনলাগা উত্তেজনায় এখনো কাঁপছে। ঘরে ফিরে জল খেল এক গ্লাস। দরজায় খিল দিয়ে শাড়িটা বদলে নিলে।

উপেন কি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরবে আজ। কী জানি। কিন্তু ষ্টেশনের ওয়েটিং রুম তো আছে। আর কিছু না থাকুক, লোকটার গায়ে তো জোর আছে অসুরের মত। পাঁচীল টপ্‌কাতে পারবে না?

তৃষিতের মত জিভ্‌টা সরমা একবার ঠোঁট দু'টোয় বুলিয়ে নিলে। এখনো জ্বলছে। মাঝে মাঝে শরীরে এমন আগুন জ্বলে কেন, কে বলবে। আর এমন আগুন, ঘটি ঘটি জল ঢাললেও নেবে না।

নিজেকে তো পুড়তে হয়ই, সেইসঙ্গে আরো দু' চারজনকে না পোড়ালে বুঝি স্বস্তি হয় না। মন্ত্র পড়ে যার সঙ্গে বিয়ে হ'ল সে পুড়লো দু'দিনেই। এবারে উপেন এসেছে পাখা উড়িয়ে। আর? আর কে? পর পর সরমার মনে আরো গোটা কয়েক নাম ভেসে উঠলো, কিন্তু একটি নাম মনে পড়তেই মুখে স্মিত একটু হাসি ফুটে উঠল!

গলার সরু হারটার মত মনে ক্ষীণ একটা সঙ্কল্প চিক্ চিক্ করছে। কতদূর গড়ায়, দেখা যাক।

পরম আলস্যভরে একটা হাই তুললে সরমা, দু'টো হাত উঁচু করে আড়মোড়া ভাঙলে। তারপর মট্ মট্ করে হাতের দশটা আঙুল মটকাতে শুরু করলে।

সব শেষে আরেক গ্লাস জল গড়িয়ে খেয়ে সরমা শুয়ে পড়ল। শয়নে পদ্মলাভক্ষ, শ্রীধরং প্রিয় সঙ্গমে। কোথায় প্রিয় সরমার? প্রিয়সঙ্গমই বা কত দূর।

মাথার বালিশটাকে বুকের কাছে টেনে নিতে সরমার আরেকবার উপেনের কথা মনে পড়ল। বেচারা আজ অনেক আশা নিয়ে এসেছিল। কিন্তু সরমা তো তাকে শুধু হাতে বিদায় করেনি, কিছু দক্ষিণাও দিয়েছে। কতখানি দিতে হয়, কতখানি রাখতে হয় হাতে, সে হিসাব সরমার ভালোই জানা আছে।

পাশ ফিরে শুল সরমা। উচ্চাকাঙ্খার অস্বস্তি চেতনায় জড়িয়ে গেছে জালের মত। সে আবার পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। অজন্মার পরেও তো মাঠে ফসল ফলে।

* * *

—তোমার পায়ে পড়ি, খোকাকে বিগড়ে দিয়ো না।

—পা ছাড় বিভা। তুমিই ওকে আমার সঙ্গে কথা বলতে নিষেধ করেছ।

—কিন্তু সে নিষেধ না মানতে শিখিয়েছ তুমিই।

শুভাশীষ বুঝতে পারলে, আজ সকালের ঘটনা নিয়েই মা আর বাবার মধ্যে এই বোঝাপড়া। সকালের দিকে বাবা ওকে ডেকেছিলেন দাসেদের পুকুরে মাছ ধরতে যেতে। শুভাশীষ এদিক ওদিক তাকিয়ে দেবাশীষের কাছে এগিয়ে গিয়ে বলেছিল, তুমি আমার সঙ্গে কথা বলো না, বাবা।

বিস্মিত দেবাশীষ বলেছিল, কেন রে।

কেন? মা মানা করেছে জান না বুঝি! মার আদেশ অমান্য করতে নেই।

হুঁ। এক মুহূর্ত ভ্রূকুঞ্চিত করে কী চিন্তা করেছিল দেবাশীষ। তারপর ছেলেকে চুপি চুপি কী একটা কথা শিখিয়ে দিয়েছিল।

ছুটে গিয়ে শুভাশীষ জিজ্ঞাসা করলে, মা!

—কী, রে।

মার মাথার প্রায় সমান সমান হয়ে পড়েছে শুভাশীষ, কাঁধের ওপর মুখ লুকিয়ে বললে, আমাকে বাবার সঙ্গে কথা বলতে মানা করেছ মা, কিন্তু তুমি বল কেন। অপর লোকে যে উপদেশ দেয়, নিজেও তো তা মানে। তুমি তো বাবার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করনি।

অবাক হয়ে মা কিছুক্ষণ ওর মুখের দিকে চেয়ে ছিলেন। তখন আর কিছু বলেন নি। তারপর বাবার সঙ্গে বোঝা পড়া শুরু করেছেন এতক্ষণ পরে।

—কাল দুপরে কোথাও বেরিও না। কিছুক্ষণ পর মা'র গলা আবার শোনা গেল।—বাবা তোমাকে নিয়ে দু'জন কমিশনারের কাছে যাবেন। মিউনিসিপালিটির সেই চাকরিটার জন্যে।

—ও। বাবার উদাস গলা শোনা গেল। একটু পরে—তোমার বাবা খাঁচা, শেকল এই সবেরও অর্ডার দিয়েছেন নাকি ?—

—জানি না, যাও। চাকরি তুমি করবে না জানি। বাবাও যেমন! এতদিন ধরে দেখছেন তোমায়, এখন চেনেন নি।

—কেই বা চিনেছে বিভা। খুব হালকা একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল বাবার। এখন ঘুমোও। কাল সকালের কথা কাল সকালে।

শুভাশীষ লক্ষ্য করল, এর পরে মা আর কিছু বললেন না। বাবার কাছে ও যখন পড়া দিতো, তখন আড়াল দিয়ে এক আধবার ঘুরে যেতেন। হয়ত চোখে পড়ে যেত দেবাশীষ ছেলেকে কাছে টেনে নিয়ে আবৃত্তি শেখাচ্ছে। পিতাপুত্রের এই অতি ঘনিষ্ঠ যুগ্মমূর্তির দিকে চেয়ে বিভার চোখ দু'টি বুঝিবা একটু জ্বলে উঠেছে, অজানা আশংকায় কেঁপে গেছে বুক, কিন্তু কিছু বলে নি।

দেবাশীষের পড়ানর পদ্ধতিও ছিল অদ্ভুত। ভূগোল পড়াতে পড়াতে এল গ্রেট বৃটেন এ্যাণ্ড আয়র্ল্যাণ্ড। দেবাশীষ হাসল। আয়র্ল্যাণ্ড কেন, বল আলষ্টার।

—আলষ্টার কী বাবা।

শুরু হ'ল আয়র্ল্যাণ্ডের ইতিহাস। ভূগোলের বইয়ের পাতা আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে গেল, কেউ ভ্রূক্ষেপ করলে না,—না ছাত্র, না শিক্ষক।

—খোকা, শুনে যা!

মার কণ্ঠস্বরে চমক ভাঙল। তাকাল দেবাশীষের মুখের দিকে।— যা, শুনে আয়।

হাত ধরে হিড় হিড় করে টেনে মা ওকে দাদুর সমুখে নিয়ে গিয়েছিলেন, মনে আছে।

—এই যে বাবা, তোমার নাতি। আজ সকাল বেলা থেকে কী পড়েছে ওকেই জিজ্ঞাসা কর।

—কী পড়েছ দাদু ?

মা-ই জবাব দিলেন, পড়েছে ওর মাথা আর মুণ্ডু। আমি তো দেখি বইয়ের মত বই বন্ধই থাকে, একজন লেক্চার দেয়, আরেকজন বুঝুক না বুঝুক, ভিজে বেড়ালের মত বসে বসে শোনে।

—কী-কী শিখেছ, শোনাও তো দাদু।

উৎসাহ পেয়ে শুভাশীষ অনর্গল আবৃত্তি করে গেল। এরি মধ্যে তিন চারটে কবিতা দেবাশীষ ওকে মুখস্ত করিয়েছিল: পঞ্চ নদীর তীরে। আর একটা কবিতা যার ভেতর আছে সেই দুই লাইন,—বাঘের বাচ্চারে, বাঘ না করিস্থ যদি, কী শিখানু তারে? সবশেষে বাবার প্রিয় কবিতাটি,

অমর মরণ রক্ত চরণ নাচিছে সগৌরবে,
সময় হয়েছে নিকট, এখন বাঁধন ছিঁড়িতে হবে॥

দাদু মনোযোগ দিয়ে শুনে বললেন, বাঃ, খাসা হয়েছে। বাঁধন ছিঁড়িতে হবে?—মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুই বাধা দি'স্ নি বিভা। তবু এ সব নিয়ে চুপ করে আছে, ভুলে আছে। নইলে, হেসে বললেন, আবার বাঁধন ছিঁড়তে চাইবে। তুই কিছু ভাবিসনি,—দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে দাদু আবার বললেন, ক'টা দিন যেতে দে। ওকে আমি মিউনিসিপালিটির চাকরিতে লাগিয়ে দেবই।

সাত

কী লজ্জা। কী লজ্জা। সরমা যখন বাড়ি ফিরে এল, তখনও মনের গ্লানি কাটেনি! একটা অশুচি আলিঙ্গনের মত শরীর জড়িয়ে

এই খদ্দরের ব্লাউস আর শাড়ি। এর প্রতিটি সুতো ছুঁচ হয়ে যেন ওর প্রতিটি রোমকূপে বিঁধছে। এ লজ্জার শেষ নেই, এ গ্লানির অবধি নেই। জরায়ুতে জারজ শিশু বহনের মত। অনাকাঙ্ক্ষিত, যন্ত্রণাময়।

ঘরে ঢুকেই দরজায় খিল দিলে। পট পট করে ছিঁড়লে ব্লাউসের বোতাম। খসিয়ে দিল শাড়ি, এতক্ষণ শরীরটা সাপের মত পেঁচিয়ে যেটা তাকে দংশন করেছে। কী অশুচি। কী অশুচি। এর চেয়ে নিরাবরণ হওয়া ভালো, এর চেয়ে ওর মিলের তৈরি থান ভালো।

লংক্লথের ব্লাউসে আর বর্ণহীন মিলের থানে তবু ঢের বেশি স্বস্তি। এ মেকি নয়, এর মধ্যে অন্ততঃ ফাঁকি নেই। আর ওগুলো,—ঘৃণাভরে পরিত্যক্ত কাপড়ের স্তূপ পা দিয়ে সরাতে সরাতে ঘরের এক কোণে নিয়ে রেখে সরমা ভাবলে, ওগুলোর প্রতিটি বুনোটে রয়েছে মিথ্যা, একটা নির্লজ্জ প্রবঞ্চনা।

অথচ আজ দুপুরে এগুলো যখন পরে ছিল, কী অহংকারই না ছিল। আয়নার সমুখে দাঁড়িয়ে ব্লাউসের হাতার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছে,—কালো সুতোর বর্ডারটুকু শুভ্র বাহুমূলে মাংসের মধ্যে যেন গেঁথে বসেছে। বার বার পরীক্ষা করেছে কতটুকু ঘোমটা থাকলে ভালো দেখাবে। এই শুভ্র শীমন্তের কতোটুকু থাকবে উন্মুক্ত। ঘোমটা কি মাথার সঙ্গে লেপ্টে থাকবে, নাকি থাকবে ফাঁপানো,—উপচে-পড়া কালো কালো চুলের জোয়ারে শাদা এক টুকরো পালের মত।

পরমুহূর্তেই তিরস্কৃত করেছে নিজেকে। এ তো বিলাসের বহির্বাস নয়। এর রুক্ষতা ত্যাগের প্রতীক; এর শুভ্রতা দেশপ্রেমের। শুধু রূপের আধার নয়, শুধু দেহের আবরণ নয়। আলোয় মেলে ধরলে এর ভেতর দেখা যাবে কত কাটুনীর ঘরে চরকার ক্লান্তিহীন আবর্তনের ছাপ।

কিন্তু কোথায় রইল এই অনুভূতি, চারুদের বাসায় যখন পা দিল? এই অনাড়ম্বর পরিচ্ছদে যাঁর চোখে মহীয়সী হয়ে উঠবে ভেবেছিল, যাঁর চোখ দু'টি থেকে প্রশংসাস্নিগ্ধ শ্রদ্ধা ঝরে পড়বে আশা করেছিল,—আরো সোজাসুজি, নিজের সঙ্গে লুকোচুরি না করে বলা যায়,—যাকে মুগ্ধ করবার জন্যেই এই আয়োজন,—তিনি সরমার এই রূপান্তরকে অভিনন্দিত করলেন কই!

প্রাথমিক সম্ভাষণাদি হ'ল, তারপরেও দু'চার মিনিট কেটে গেল, তখন জামাইবাবু—চারুর বাবা—এমন ভাব দেখালেন না যে সরমার এই বেশ বদল তিনি লক্ষ্য করেছেন।

কিছুক্ষণ অস্থির প্রতীক্ষার পর সরমাই জিজ্ঞাসা করেছিল, আজ খদ্দর পরেছি। কেমন মানিয়েছে জামাইবাবু?

দেবাশীষ এক মুহূর্ত চেয়ে রইল ভ্রূকুঞ্চিত করে। জহুরী যেন সোনা যাচাই করছে। তারপর হেসে উঠল। বেশী জোরে হাসেনি, কিন্তু সরমার মনে হয়েছিল সেই হাসি নিষ্ঠুর শব্দতরঙ্গে শতগুণ হ'য়ে ছড়িয়ে পড়েছিল, খান খান হয়ে অনেকক্ষণ ধরে বেজেছিল কানে।

আর, স্পষ্ট, ধীরে ধীরে উচ্চারিত এই মর্মভেদী কথা ক'টি কানে এসেছিল,—এ কী করেছ সরমা। এ তো খদ্দর নয়!

খদ্দর নয়? সরমার মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল, খদ্দর নয়, তবে কী জামাইবাবু?

—খদ্দরের জাপানী নকল। জোচ্চুরির মাল। এর চেয়ে বিলিতি কাপড় পরে এলেনা কেন সরমা, তাতে অন্ততঃ জোচ্চুরি নেই।

মাথা যেন মাটিতে মিশে যেতে চাইল সরমার। পারলে মুখ লুকোতো। কিন্তু লুকোবে কিসে। আঁচলটাও যে জাপানী খদ্দরের। সোনা ভেবে সারা গা মুড়েছে গিল্টির গয়নায়, এসেছে বাড়ি বয়ে

দেখাতে। ছী ছী। দেবাশীষের দুঃশাসন হাসি যেন এই মেকির নির্মোক খুলে নিচ্ছে একে একে।

মাথা নীচু করে কতক্ষণ বসে থাকার পর চোখ দু'টি বেয়ে জল গড়িয়ে পড়েছিল।

—কাঁদছ সরমা? একটি বিস্মিত মমতাঘন কণ্ঠস্বর কানে এসেছিল, কাঁদবার কী আছে।

আর শুনতে পারেনি সরমা। তিরস্কার তবু সহ্য হয়েছিল কিন্তু এই সহানুভূতি নয়। দ্রুত পায়ে ছুটে এসেছে। পালিয়ে এসেছে এই ঘরে, আপন বিবরে। এখানকার নির্জনতায় জালিয়াতির নির্লজ্জ নাগপাশ থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়েছে। বেঁচেছে হাঁপ ছেড়ে।

তারপর চোখের জল শুকিয়েছে। তাড়াসাড়ি সেরেছে ঘরের কাজ। রুগ্ন শাশুড়ির শিয়রে গিয়ে বসেছে।

—এখন কেমন আছেন মা।

ক্ষীণকণ্ঠে জবাব দিল, একটু ভাল, মা। তুমি কোথায় গিয়েছিলে?

—কালীতলায় মা। মানত করে এলাম।

—কিসের মানত বৌমা?

—আপনার জন্যে। মা কালীকে বলে এলাম আপনি সেরে উঠলে—

—আর আমার সেরে ওঠা। বুড়ি বললে, আমার এখন মরণ হ'লেই মঙ্গল। নির্মল কবে আসবে বৌমা?

—কী জানি মা, চিঠি তো পাইনি।

দিনকতক হ'ল নির্মল ছুটিতে দেশে বেড়াতে গেছে।

—আমার ওষুধপত্তর সব এনে দিচ্ছে কে?

—উপেন ঠাকুরপো।

—উপেন ঠাকুরপো? বুড়ি যেন চোখ বুঁজে চিনতে চেষ্টা করলে।

—সেই যে মা বোর্ডিংয়ের,—নির্মলের বন্ধু।

—অ! উপেন। তা সে আবার তোমার ঠাকুরপো হ'ল কবে? বাইরের লোকের সঙ্গে অত মেশামেশি করতে নেই বৌমা, পাঁচজনে পাঁচ কথা বলবে। কপাল পোড়া তোমার, নইলে—

ঠিক এই সময়ে উপেন এসে দাঁড়ালো দরজার গোড়ায়। সরমা ওকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে টেনে নিয়ে এলো শোবার ঘরে।

এতক্ষণ ভুলে ছিল, হঠাৎ আবার দুপুরের সেই ক্ষতটা জ্বালা করে উঠেছে। যার জন্যে আজ এই অপমান সইতে হয়েছে সরমাকে, সেই লোকটা রয়েছে সমুখেই। এর স্থূলবুদ্ধির সেলামি আজ সরমাকে চুকিয়ে দিতে হয়েছে পুরোপুরি।

চিন্তা করতে করতে মাথায় যেন রক্ত চড়ে গেল সরমার। এই লোকটাকে নখরাঘাতে রুধিরাক্ত করলে বুঝি উত্তেজনার কিছুটা উপশম ঘটে।

কিন্তু তার চেয়েও সূক্ষ্ম প্রতিশোধ আছে। সরমা ঘরের কোনে জড়োকরা জাপানী খদ্দরের জামাকাপড় টেনে মাঝখানে আনলে। তারপর একটিও কথা না বলে হতবুদ্ধি উপেনের চোখের সমুখে তাতে দেশলাইয়ের কাঠি ধরালে।

—তুমি এসব করছ কী। শুষ্ককণ্ঠে উপেন জিজ্ঞাসা করল।

ততক্ষণে আগুন জ্বলে উঠেছে। ধোঁয়ায় ভরেছে সারা ঘর। আর্তকণ্ঠে ওঘর থেকে বুড়ি চেঁচিয়ে ডাকলো, ও বৌমা এত ধোঁয়া কেন। উনুনে কি এত শিগ্‌গির আঁচ দিলে।

—হ্যাঁ, মা।

—রান্নাঘর তো এদিকে, ওদিক থেকে ধোঁয়া আসছে কেন?

—হাওয়ায়, মা। বাতাস বইছে, টের পাননি।

টের পেয়েছে উপেন। বাতাস তো নয়, ঝড়।

কাপড় পুড়তে বেশী সময় লাগল না। খানিক পরে রুদ্ধশ্বাস

ঘরখানায় রইল শুধু তীব্র একটা গন্ধ, আর মেজেয় ছড়ান অঙ্গার। দুটি চোখ ধোঁয়ায় ছলোছলো, আর দু'টি চোখ তখন ধিকিধিকি জ্বলা আগুনের আভায় জ্বলো-জ্বলো।

—এ কী করলে সরমা?

সরমা নীচু হয়ে খানিকটা ছাই তর্জনীর অগ্রভাগে কুড়িয়ে নিল; এঁকে দিল তার ছাপ উপেনের কপালে।

—এ কী।

—তোমার বুদ্ধিহীনতার তিলক। খদ্দর চেয়েছিলাম, এনে দিয়েছ ঝুটো মাল। যাও। মুখের ওপরই দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল উপেনের।

বেত ঝাড়ের পাশে পানা পুকুরের ধারে সারাদিন বাবার সঙ্গে বসে থেকে থেকে শুভাশীষ হাঁপিয়ে উঠছিল। ছিপে মাছ গাঁথছে না একটাও, কিন্তু শামুক মেরে মেরে 'চার' তৈরি করে শুভাশীষ হয়রান হয়ে গেল। তারপর কখন বেলা গড়িয়ে গেছে।

পশ্চিম পাড়ের তৃষিত তালগাছটা প্রথমে জল খেতে নেমেছে ঘাটের কিনারে, তারপর ছায়া দীর্ঘতর করে কাঁপা-কাঁপা জল সাঁতরে চলে গেছে ওপারে, তখন দেবাশীষ উঠেছে।

হুইল হাতে আগে আগে চলেছে দেবাশীষ, শুভাশীষ পিছনে, চুপরি হাতে। চক্রবর্তীদের বাসার সমুখে যখন পৌছল তখন লাল ধুয়ে গিয়ে পশ্চিম আকাশে সীসে রঙ ধরেছে। আর পূবের আকাশে একটি মাত্র তারা।

—ক'টা মাছ পড়ল, জামাইবাবু?

আজ পরণে ধোয়া একখানা মিলের থান সরমার, একেবারে সামনা সামনি এসে পড়েছে।

দেবাশীষ কুণ্ঠিত স্বরে বললে, বেশি না। সরপুঁটি দু' চারটে। সারাটা দিন বৃথা পরিশ্রমে গেল।

—একটু বসে যাবেন জামাইবাবু? আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা ছিল।

বাইরের দাওয়াতেই টুল পেতে বসতে দিলে দেবাশীষকে। শুভাশীষকে এনে দিলে মোড়া। তারপর মাটির ওপর আঁচল বিছিয়ে নিজেও বসল।

—আপনার কাছে ক্ষমা চাওয়া হয়নি, জামাইবাবু।

—ক্ষমা? দেবাশীষ ব্যস্ত, বিব্রত হয়ে পড়ল। কিসের ক্ষমা, ভাই?

—কাল জাল খদ্দর পরে আপনাদের বাসায় গিয়েছিলাম বলে। কিন্তু বিশ্বাস করুন জামাইবাবু, আমি জানতাম না। আসল ভেবেই—

দেবাশীষ সরমার পিঠে একখানা হাত রেখে বললে, আমি তা জানতাম সরমা। তোমাকে সব বুঝিয়ে বলবও ভেবেছিলাম; কিন্তু তুমি সেই সুযোগ দিলে কই। এমন তাড়াতাড়ি চলে এলে—

তারপর দেবাশীষ আরো কিছুক্ষণ বসে গেল। খদ্দর পরতে চায়? তবে চরকা কাটুক না কেন সরমা। জানে না? কিন্তু শিখিয়ে নিতে কতক্ষণ। আজ কিছুদিন থেকেই একটা কথা মনে হচ্ছিল দেবাশীষের। ভালোই হ'ল আজ তার সুযোগ পাওয়া গেল। হাতে বিশেষ কাজ নেই, প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক আন্দোলনের স্রোতও স্তিমিত। কিন্তু গঠনমূলক কাজও ত আছে। তার মধ্যে প্রধানতম হ'ল চরকা। সরমা এবং পাড়ার আরো ক'টি মেয়ে মিলে সূতো কাটতে শুরু করুক। এর মূল্য শুধু অর্থনৈতিক সাফল্যের মানদণ্ডে নিরূপিত হবে না, এর একটা নৈতিক দিকও আছে। সরমা এবং এমনি আরো কত মেয়ে আছে যারা অদৃষ্টবিড়ম্বিত। যাদের বর্তমান ধিক্কৃত, ভবিষ্যৎ শুধু অনিশ্চিত একটা জিজ্ঞাসা চিহ্ন। চরকার মধ্য দিয়ে তারা আত্মবিশ্বাস ফিরে পাবে, কাজে আসবে উৎসাহ। জীবন সম্পর্কে নতুন করে আশ্বাস পাবে। সরমা পারবে না গড়ে তুলতে?

দেবাশীষ চলে যাবার পরও সরমা বহুক্ষণ একটা আনন্দময় অনুভূতিতে

আচ্ছন্ন হয়ে রইল। কুয়াশা কেটে যাবে। নতুন দিনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছেন দেবাশীষবাবু।

ভারি আশ্চর্য এই লোকটি। মোটা খদ্দরের ধুতি হাঁটু আর গোড়ালির মাঝামাঝি এসে থেমে গেছে। অসংস্কৃত মুখ, কোন চেষ্টাকৃত যত্নের ছাপ নেই, না বেশবাসে না কেশবিন্যাসে। কথা বলেন ধীরে ধীরে, কিন্তু জোর দিয়ে। আর মাঝে মাঝে চোখ দুটি অন্ধকারে চুরুটের মত ধক্ ধক্ করে জ্বলে।

সমস্ত অপমানবোধ, নৈরাশ্য কেটে গিয়ে মনটা ক্ষমায় ভরে উঠল সরমার। উপেনের সঙ্গে যে ব্যবহার করেছে তার জন্যে অনুতাপ এল। বাস্তবিক ওর কী দোষ। উপেন তো সরল বিশ্বাসেই কিনেছিল। শাস্তি হয় তো যে মেকি মাল চালিয়েছিল, সেই দোকানীর হওয়া উচিত।

সেদিন অনেক রাত অবধি তেল পুড়িয়ে সরমা উপেনকে চিঠি লিখল। সে চিঠিতে ক্ষমা প্রার্থনা ছিল, অনুনয় ছিল। উপেনকে অবিলম্বে এসে দেখা করতে লিখেছিল সরমা।

আট

দুটি তো মোটে ছাত্রী। সরমা আর চারু। তাও আবার চারু সবে দু'দিন অন্নপথ্য করেছে, এখনও ভালো করে চলাফেরা শুরু করেনি। তবু দেবাশীষের উৎসাহের সীমা নেই। এদের দু'জনকে নিয়ে কাজ শুরু হোক। নিজেই কয়েকটা চরকা এনেছে কোথা থেকে, তকলি আর তুলো। শুভাশীষ যথারীতি দোহার ধরেছে, অর্থাৎ তুলো পেঁজা ইত্যাদি।

দুপুর হ'তেই সরমা চলে আসে। চারু এসে বসে পাশে। শুরু হয় দেবাশীষের অধ্যাপনা। বড় মাসীমাও এসে বসেন মাঝে মাঝে। আর

মা? আসেনও না, বসেনও না, শুধু সামনের বারান্দা দিয়ে ঘোরাফেরা করেন, কখন বা আড়চোখে এদিকে তাকিয়ে বলেন, অত সুতো কাটিসনি চারু, মাথা ঘুরে মরবি। এই তো সেদিন অসুখ থেকে উঠেছিস।

চারুর অবশ্য সে কথায় কান নেই। চরকার গুঞ্জনের সঙ্গে গুণ গুণ গান মেশে। কখন বা হাততালি দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে চারু—কী সরু সুতো হয়েছে বাবা দেখ; আমার সুতো সরমাদির চেয়ে অনেক সরু, না?

দেবাশীষ কোন কথা বলে না। চরকার হাতল ঘোরাতে ঘোরাতে সরমার অন্যমনস্ক ঘোমটাটুকু কখন খসে পড়েছে, সে মাথা নীচু করে মুখ টিপে হাসছিল।

শুভাশীষের কাজ শুধু তুলো পেঁজাই নয়, লাটাই হাতে রকে বসে আছে গুটিয়ে তুলবে বলে, তারপর লাছি করে রাখবে।

—তোমার কতটা হ'ল সরমা? দেবাশীষ জিজ্ঞাসা করল। শুভাশীষ লাটাই তুলে দেখালে, এই এতটা বাবা। অনেকখানি।

দেবাশীষ বললে, আর কী। হ'য়ে তো এল। খদ্দরের শাড়ি পরতে চেয়েছিলে, এবারে নিজের হাতে তৈরি সুতোর কাপড় নিজেই পরতে পাবে। এ কি কম গর্ব।

চারু বলে উঠল, শাড়ি না বাবা, ধুতি। সরমাদি ওর সুতোয় তৈরি প্রথম কাপড় দিয়ে আপনাকে প্রণাম করবে বলেছে।

—তাই নাকি সরমা? দেবাশীষ জিজ্ঞাসা করলে।

জবাব পাওয়া গেল না সরমার। চাকা ঘোরাতে গিয়ে ওর হাতখানা কেঁপে গেল শুধু, মাথাটা চরকার ওপর আরো ঝুঁকে পড়ল। সরমা মুখ লুকোতে চাইছে।

স্মিত মুখে দেবাশীষ আরো জোরে জোরে চরকা ঘোরাতে লাগল। এক নতুন, আশ্চর্য পরীক্ষায় হাত দিয়েছে। পোড়ামাটি দিয়ে মূর্তি

গড়বে। উৎসাহ বেড়ে যায়, চারুকে বলে, আরো দু' চারজন ছাত্রী এনে দে চারু।

চরকাটা ঠেলে দিয়ে সরমা উঠে দাঁড়াল।

—চললে?

—হ্যাঁ। বিকেল হ'ল, যাব না?

—যাবে বইকি। চল এগিয়ে দিয়ে আসি।

ফিরে এসে দেবাশীষ দেখল, বিভা খাবার নিয়ে বসে আছে। এক সঙ্গে দু'খানা লুচি মুখে পুরে দিয়ে দেবাশীষ বললে, শ্বশুর বাড়ীর তুল্য আর কিছু পৃথিবীতে নেই।

বিভা কোন জবাব দিলে না।

খেতে খেতে দেবাশীষ বললে, ভালো কথা, আমার চাকরির কতদূর হ'ল? শ্বশুর ম'শায় আজকাল আর কিছু বলছেন না যে?

—আমি বাবাকে নিষেধ করে দিয়েছি।

দেবাশীষের চিবোনো বন্ধ হয়ে গেল।—নিষেধ করে দিয়েছ? কেন?

—বাবাকে বলে দিয়েছি, যে জন্যে চাকরি, তার আর দরকার নেই।

—সেইটেই তো বুঝতে পারছিনা। হঠাৎ দরকার ফুরিয়ে গেল কেন। আমাকে আর বেঁধে রাখতে চাও না?

কঠিন হাসি খেলে-গেল বিভার মুখে।—চাইবনা কেন,—আমি যখন তোমার স্ত্রী। কিন্তু বাঁধা তো পড়েই গেছ, আর নতুন একটা বাঁধনের দরকার কী।

দেবাশীষ তবু ইঙ্গিতটা বুঝতে পারছে না দেখে বিভা বললে, চাকরি না জুটলেও তুমি এখান থেকে নড়তে চাইবে না, তাকি আর বুঝিনি? এখানে তোমার সুতোকাটা শেখানর ইস্কুল আছে,—মেধাবী ছাত্রী আছে—

কী একটা বিশেষ ভঙ্গি ছিল বিভার কথাগুলোর উচ্চারণে, দেবাশীষের

কাছে কিছু আর অস্পষ্ট রইল না। প্রথমে একবার শাদা হয়ে গেল মুখ, তারপর প্রচণ্ড ক্রোধে রক্তোচ্ছ্বাসে ভরে গেল।

কঠোর প্রয়াসে আত্মসংবরণ করে দেবাশীষ গম্ভীর কণ্ঠে বললে, তোমার কথাটা বুঝেছি বিভা। ছি-ছি-ছি, কী নীচ মন তোমার। সরমা আমার মেয়ের বয়সী, আর তাকে নিয়ে তুমি কিনা—

কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল, দেবাশীষ কিছুক্ষণ কথা বলতে পারল না। আর বিভা সেখান থেকে উঠে গিয়ে একটা খুঁটির আড়ালে দাঁড়িয়ে চোখে আঁচল দিল।

তারও আর কিছু বলবার নেই। দূরে গেলে যে ভুলে থাকে, কাছে এলে কেবলমাত্র তাকে বাদ দিয়ে আর সব কিছু নিয়ে যে মেতে ওঠে, কী করে বিভা সেই লোকটাকে বোঝাবে কত দুঃখে হীন সব সন্দেহ আসে মনে, তিক্ত সব কথা বুক ফেটে মুখ ফুটে বেরোয়। এর চেয়ে দেবাশীষ দূরেই চলে যাকনা কেন, পড়ে থাকুক জেলে; তাতে বিচ্ছেদের বেদনা আছে, কিন্তু অপমান নেই।

সেদিন সন্ধ্যাবেলাকার কথা শুভাশীষের স্পষ্ট মনে আছে। দাদুর কাছে চুপ করে বসেছিল। এমন সময় বাবাও এসে পাশে বসলেন। সামান্য দু' একটা কথার পর বাবা বললেন, আমার চাকরিটার কতদূর হ'ল ?

নিজে থেকে দেবাশীষ চাকরির অনুরোধ করতে এসেছে, দাদু যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। বললেন, মন স্থির করেছ তুমি ?

—করেছি। বাবা বললেন, ভেবে দেখলাম, দিনকতক চাকরিই করি। এই সব ছেলে মেয়ে, এদের প্রতি আমার একটা দায়িত্ব আছে। আপনি সব ঠিক করে ফেলুন।

- ঠিক তো সব করাই আছে। দাদু বললেন, কাল তা হ'লে চল

তোমাকে ভাইস্-চেয়ারম্যানের বাসায় নিয়ে যাই। হয়ত আসছে মাস থেকেই জয়েন করতে হ'তে পারে।

সেখান থেকে ঠুক ঠুক করে দাদু হাজির হলেন একেবারে রান্নাঘরে। বিভা রান্না করছিল, তার প্রায় কানের কাছে মুখ নামিয়ে ফিস ফিস করে বললেন, জামাইয়ের গরজ হয়েছে বিভা। আমার কাছে নিজে থেকে এসে আজ চাকরির কথা বলছিল। তোকে বলেছিলাম না, ওকে আমি চাকরিতে ঢুকিয়ে দেবই?

আর ঠিক সেই সময়ে দেবাশীষ শুভাশীষকে বারান্দায় ডেকে নিয়ে এল।—সরমার বাসায় একবার যেতে পারবি, খোকা?

—কেন, বাবা?

—গিয়ে বলবি, কাল থেকে যেন আর এবাসায় না আসে। সুতো কাটা বন্ধ। অবিশ্যি যদি চায় তো নিজের ঘরে বসে—

—বন্ধ কেন বাবা?

দেবাশীষ এ কেন-র জবাব দিলে না।

ভাইস-চেয়ারম্যানের বাসা থেকে দেবাশীষ ফিরছিল। ব্রজবাবু ভারি খুসি হয়েছেন ওর সঙ্গে আলাপ করে। কাল থেকেই কাজে লেগে যাও হে। এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটারের জন্যে ভেব না। এবার আমরা দলে আটজন আছি। বারোজনের মধ্যে আটজন। কমিটির মিটিংয়ে স্যাংসন করিয়ে নেবই। তুমি খালি মন দিয়ে কাজ করে যাও। একে চাকরি মনে কোর না, এ-ও দেশের কাজ, এতদিন যা করেছ, এও তাই। মিউনিসিপালিটি মানেই তো সেলফ-গবর্ণমেণ্ট। স্বরাজের প্রথম ধাপ। কেমন? তবে আর কী। কাল থেকেই তবে—

স্বরাজ। ফিরে আসতে আসতে দেবাশীষ কথাটা চিন্তা করছিল। এই স্বরাজের কিছু কিছু আভাস সেও পেয়েছে। বাজারে ব্রজবাবুর

দু'খানা দোকান, একটা কাপড়ের, আরেকটা জুতো, আর ষ্টেশনারির। ভাড়াটে বাড়িও শহরে আছে খান দুই। অনেক কিস্তি ট্যাক্স বাকি ফেলে রাখেন ব্রজবাবু। পাছে কোন কথা ওঠে তাই ট্যাক্স কালেক্টারও নিজের পছন্দ মত নিতে চান। দেবাশীষ হবে ট্যাক্স কালেক্টার। এর আগেরবার মিউনিসিপাল কাউন্সিলে যখন ব্রজবাবুর দলের প্রাধান্য ছিল না, তখন এ নিয়ে কথা উঠেছিল। এবার যাতে তার পুনরাবৃত্তি না ঘটে, সেজন্যে ব্রজবাবু সতর্ক হয়েছেন। দেবাশীষকে তিনি চাকরি দিলেন, প্রতিদানও একটা আশা করেন বইকি। যে খাতাপত্রে ওঁর বাকি ট্যাক্সের হিসাব, সেগুলো চাপা থাকবে, এই তিনি আশা করেন। আবার বিরোধী দলের যারা কমিশনার, তাঁদের কয়েকজনের কশো টাকা করে বাকি আছে, তার একটা ফিরিস্তিও দিয়েছেন ব্রজবাবু। কিঙ্কর চৌধুরীর দেড়'শ। নন্দকিশোর বাবুর প্রায় দু'শ। আর কমিশনার হয়েই জগবন্ধু বাবু সেবার যে নিজের বাড়ির সমুখে লাইট আর জলের কল বসিয়েছিলেন, সেটাও দেবাশীষকে জানিয়ে দিয়েছেন।

—আমাদের সামনে এখন কাজ, বুঝলে। ক্ষমতা পেয়ে যারা তার এ্যাবিউস করছে, আমাদের লড়তে হবে তাদের সঙ্গে। যেমন ধর—

বিকেলের ট্রেনটা ষ্টেশনে দাঁড়িয়ে। এই গাড়িতেই কলকাতা থেকে খবরের কাগজ এসেছে। ওভার ব্রিজটা পেরিয়ে প্লাটফর্মে যখন পা দিল, গাড়ি তখন ছেড়ে দিয়েছে। দেবাশীষ একখানা কাগজ কিনলে। প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম খবরের শিরোনামায় চোখ পড়তেই ওর পা দু'টো অসাড় হয়ে গেল। হাত দু'টো থর থর করে কাঁপছে। লাজপত রায় মৃত।

কিছুদিন থেকেই সাইমন কমিশন সম্পর্কিত বিক্ষিপ্ত গোলযোগের খবর এখান থেকে ওখান থেকে আসছিল। কমিশন যেখানেই যায় সেখানেই বিক্ষোভ, সেখানেই কালো পতাকা। এই ধরণের একটা

হাঙ্গামাতেই কিছুদিন আগে পঞ্জাব কেশরী আহত হয়েছিলেন, এ খবরও পেয়েছে। কিন্তু আজকের এই মৃত্যু সংবাদের জন্যে মন প্রস্তুত ছিল না। ষ্টেশনে দাঁড়িয়েই যান্ত্রিক ভাবে খবরটা আদ্যোপান্ত পড়লে। খবরের কাগজটা হাতের কঠিন মুঠির মধ্যে কখন একসময় নিষ্পিষ্ট হয়ে গেছে, চোখের মণি দু'টি কাঁচের মারবেলের মত চক চক করছে।

শুধু পঞ্জাব কেশরীর মৃত্যু সংবাদ নয়, সাইমন কমিশন নিয়ে আর কয়েকটা গোলযোগের খবর আজকের কাগজেই আছে। দেবাশীষের মনে হ'ল এগুলো বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত ঘটনামাত্র নয়। আবার আহ্বান আসছে। কোথায় যেন বিরাট এক প্রস্তুতি চলেছে আসন্ন এক মহাসংগ্রামের। এখানে বসে সে তার অনুমান করতে পারছে না।

নির্জন প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে দেবাশীষ। বহুদূরে অন্ধকারে ডিস্‌ট্যাণ্ট সিগ্‌ন্যালের রক্তচক্ষু। লোকোসেড্ থেকে মাঝে মাঝে ইঞ্জিনের হুইসিলের শব্দ। পায়ের নিচে প্লাটফর্মের লাল কাঁকর।

কে বলবে কাঁকরের রঙ এত লাল কেন।

খবর শুনে শ্বশুর মশায় খুশি, শ্বশুরকন্যাদের তো আনন্দ ধরে না। বলে কী। কাল থেকেই চাকরি? শুভাশীষের বড় মাসিমা বললেন।

—কাল থেকেই।

—এতদিনে জামাইবাবু সংসারী হ'লেন। রাত পোহালেই নতুন মানুষ।

দেবাশীষ অল্প একটু হাসল শুধু। রাতটা পোহাক আগে।

শেষ রাতে কলকাতার গাড়ি। এ গাড়ীতে সাধারণত বেশি প্যাসেঞ্জার থাকে না।

—কলকাতা একখানা।

বুকিং ক্লার্কের বুঝি ঢুলুনি এসেছিল, সোজা হয়ে বসল, অভ্যস্ত বলল, তিন টাকা দু' আনা। শিকেঢাকা কাউণ্টারের অর্ধচন্দ্রাকৃতি ফোকরের ফাঁকে একখানি হাত। পয়সা এগিয়ে দিল; বুকিং ক্লার্ক একেবারে চমকে উঠল যেন। শুধু শঙ্খশুভ্রই নয়, বড় সুগঠন হাতখানা। মণিবন্ধ ঘিরে মাত্র একগাছি রুলি। তাড়াতাড়ি একখানা টিকিট পাঞ্চ করে দিলে।

ট্রেন আসতে এখন আধ ঘণ্টা বাকি। সরমা উত্তেজনায় কাঁপছে। সব সাহস কি এরি মধ্যে ফুরিয়ে গেল। অথচ সব পথটাই যে এখন বাকি।

অনিশ্চিত যাত্রার এইত সবে শুরু। কাল সকালে তুমি যখন ক'লকাতায় বিপুল জনারণ্যে দিশেহারা হয়ে পড়েছ, তখন এখানে তোমার কুলত্যাগের কাহিনী ঢাকে ঢোলে রাষ্ট্র হয়ে গেছে। কুলত্যাগ? কুলত্যাগ বইকি। না হয় একাই চলে এসেছ, কারুর সঙ্গে আস নি, কিন্তু লোকে সেজন্য কিছু সাধুবাদ দেবে না।

প্ল্যাটফরমের নিরালা একটি কোন দেখে সরমা বসল। আগা-গোড়া সাদা চাদর মুড়ি দেওয়া, এখানে তাকে কেউ চিনবে না। টিকিটখানা শক্ত ক'রে আঁচলে বেধে নিলে। গহনার পুঁটুলিটাও হাতে শক্ত করে ধরা আছে।

সাহস তার আছে, কিন্তু তবু সমস্ত দায়িত্ব তার একার, একথা ভাবতেই তার মন কেঁপে উঠে। যদি আজ তার পাশে আর কেউ থাকত—

আর কেউ? আর কে থাকতে পারত পাশে। উপেন? নামটা স্মরণ হতেই সমস্ত শরীরটা ঘৃণায় সঙ্কুচিত হয়ে এল সরমার। ওর দেহ মনের ওপর একদিন ওই ভীরু কাপুরুষটা প্রভাব বিস্তার করেছিল, একথা ভাবতে নিজেরই ওপর ঘৃণা হতে লাগল। ভালোই হয়েছে সময়

থাকতে লোকটা সরে গেছে। নইলে এত সহজে জোট ছাড়ান যেত না। গ্লানির বিষ আকণ্ঠভোজন উঠত।

কিন্তু একি কম অপমান।

সরমা চিঠি লেখার পর সেদিন সন্ধ্যাবেলা উপেন এসেছিল।

—দেখ, আমি ঠিক করেছি, আমরা এখান থেকে চলে যাব দু'জনে মিলে।

দরজা ভেজান। উপেনের কোলে নিজে থেকেই মাথা রেখে সরমা বলেছিল। উপেনের মুখ ধীরে ধীরে অবনত হয়ে এসেছিল, তাতো যাবই।

—প্রথম কলকাতা। সেখানে বিয়ে হবে। তারপর, আর কোথাও। আমার গহনা যা আছে তাতে প্রথম ছ'মাস স্বচ্ছন্দে কেটে যাবে। ততদিন একটা কিছু ব্যবস্থা,—হবে না ?

—তাকি আর হবে না।

—তাহলে এই কথাই ঠিক। আগামী শুক্রবারেই এইট ডাউন।

—শুক্রবারেই ? উপেনকে বিব্রত মনে হয়েছিল, এই শুক্রবারেই ?

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সরমা সম্মতি আদায় করেছিল। পরিকল্পনার ছোট খাট ফাঁক ওরা সেদিনই পূরণ করলে। আয়োজন যেন ত্রুটিহীন হয়।

মনে যেটুকু দ্বিধা ছিল শ্বাশুড়ী জেনে ফেলার পর সেটুকুও আর রইল না। বাতে শয্যাশায়ী বুড়ি যে সেদিন বিছানা ছেড়ে উঠে এসেছে, দরজার আড়াল থেকে দেখেছে সব, তাকি আর সরমা জানে।

উপেন চলে যাবার পর বুড়ির গলা শোনা গেল। যা মুখে এল তাই বলল বুড়ি। কী কালনাগিনীই ঘরে এনেছিল। আসতে না আসতেই খেয়েছে ছেলেটাকে। তাতেও বুঝি আশা মেটেনি। এখন চুণ আর কালি দিচ্ছে কুলে। ও শতেক খোয়ারী, ও হারামজাদি।

থর থর করে কাঁপছে বুড়ি, উঁচু কণ্ঠাস্থি আর তোবড়ান গালের

ভেতর থেকে বিষাক্ত স্রোতের মতো কথার তোড় আসছে। সরমার মনে হ'ল গলা টিপে ধরে বুড়ির। কোটরগত চোখ দুটোকে উপড়ে আনে বাইরে।

পরদিন উপেন এল না। তার পরদিনও না। সন্ধ্যার দিকে শুভাশীষ জানিয়ে গেল সরমা যেন আর স্থতো কাটতে না যায়। আরেকটা আঘাত। সামলে নিয়ে শুভাশীষকে বোর্ডিংয়ে পাঠিয়ে দিল সরমা। শুভাশীষ ফিরে এল। উপেনদা নেই।

—নেই? হাত পা যেন হিম হয়ে এল সরমার। নেই?

—না। বাবার অসুখের খবর পেয়ে দেশে গেছে উপেন। কবে ফিরবে ঠিক নেই।

পায়ের নিচে থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। ও ঘরে শাশুড়ির গলা চলছে, ঢং করে আবার বালি রেখে যাওয়া হয়েছে। ওরে বজ্জাত, তোর মতলব বুঝিনে আমি। নষ্ট চরিত্তিরের মেয়ে মানুষ তুই, তোর হাতের জল খেয়ে কি আমিও নরকে পচবো।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে বুড়ি। হাঁপায়। দম নেয়। আবার স্থরু করে, তুই যে আমাকে মেরে ফেলবার ফিকিরে আছিস, আমি আর জানিনে। বালির সঙ্গে মিশিয়েছিস তো বিষ। এর একটুখানি আগে আমি একটা বেড়ালকে দিয়ে চাখিয়ে নেব, খেতে হয় তারপর খাব।

খানিক পরে আবার: বলি ও সভোনকৃখিঠাকরুণ, কোথায় গেলে। একটুখানি গঙ্গাজল এনে দাও বাছা, বালিতে একটু ছিটিয়ে শুদ্ধ করে নিই। পিণ্ডি যখন গিলতে হবেই! আমার মরণও হয় না।

আজ সকালের ডাকে উপেনের চিঠি এসেছে। সব কিছু অকস্মাৎ স্পষ্ট হয়ে গেছে। হঠাৎ চলে আসার জন্যে উপেন ক্ষমা চেয়েছে। জানিয়ে আসার সময় ছিল না। এখানে এসে আবার বিপত্তি। বাবার অসুখটা একটু কমেছিল, কিন্তু তার স্ত্রী—

স্ত্রী! সরমার হাত থেকে চিঠিটা খসে পড়েছিল। উপেন তবে বিবাহিত! আশ্চর্য, এতদিন এত কথা ভেবেছে, কিন্তু এই সহজ সম্ভাবনার কথাটা মনেই হয়নি। সে যে বিবাহিত, এই কথাটাই চিঠিতে কৌশলে জানাতে চেয়েছে নাকি উপেন।

চিঠির দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে উপেন ওকে ভুলে যেতে লিখেছে। একেবারে শেষে এই ক'টি লাইন।

'যাহাকে ভালবাসি না, তাহাকে লইয়া জীবনটা কাটাইতে হইবে, যাহাকে চাহিয়াছি, তাহাকে নিজের করিতে পারিব না ইহাই আমার অদৃষ্ট লিখন। স্ত্রীকে তো পরিত্যাগ করিতে পারি। কিন্তু তাহা হইলে বাবা আমাকে ত্যাজ্যপুত্র করিবেন এ সম্ভাবনা আছে। সকল দিক ভাবিয়া স্থির করিলাম, তুমি আমাকে ভুলিয়া যাও, কিন্তু ভুল বুঝিও না। যদি জানাও আমাকে ক্ষমা করিতে পারিয়াছ, তবেই তোমার নিকট মুখ দেখাইব; নচেৎ—'

চিঠিটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়েছিল সরমা। দরজা বন্ধ করে চিঠিটা পড়ছিল, দম বন্ধ হয়ে এল। অসহ্য। সমস্ত পরিবেশটাই কণ্ঠরোধ করে ধরেছে যেন। এখানে আর নয়। এই ঘরে সেই লোকটাকে দিনের পর দিন ডেকে এনেছে ভাবতেই অসীম বিতৃষ্ণায় সমস্ত চেতনা ভরে গেল। পালাবে সরমা, একলাই পালাবে। অদৃষ্টে যা থাকুক এখানকার সব কিছু তাকে নিষ্ঠুরভাবে প্রবঞ্চনা করেছে। কী মোহে এখানে পড়ে থেকে শাশুড়ীর গঞ্জনা সহ্য করবে সরমা, কিসের ভরসায়।

আজকের দিন তো কিছু দিলে না। একবার খুঁজেই নেওয়া যাক না কেন, আগামী কালের হাতে তার জন্যে কী রয়েছে।

দেবাশীষ ষ্টেশনে পৌঁছে দেখল, গাড়ি দাঁড়িয়ে। তাড়াতাড়ি টিকিট কিনে যখন প্লাটফর্মে এল তখন সবুজ আলো জ্বলছে সিগন্যালে। রাতের

গাড়ি, দু' একটা কামরায় দরজায় চাবি। হুইসিল দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিলে। দেবাশীষ দু' এক সেকেণ্ড বুঝি হতবুদ্ধি হয়েছিল। যে কোন একটা পা-দানীতে লাফিয়ে উঠবে কিনা ইতস্তত করছে, হঠাৎ একটা দরজা খুলে গেল, এবং শাদা চাদর মুড়ি দেওয়া কে একজন চেনা গলায় বলে উঠল—তাড়াতাড়ি উঠুন, গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে দেখতে পাচ্ছেন না?

ভালো করে কিছু বোঝবার আগেই দেবাশীষ হাতলটা ধরে গাড়িতে উঠে পড়ল। দরজাটা ফের ঘুরিয়ে বন্ধ করে, সুস্থির হয়ে চারধারে তাকাল। প্রায় সবাই ঘুমে ঢলে পড়েছে, যে যতটা পারে জায়গা দখল করে। বাঙ্ক, বেঞ্চ, কোথাও ফাঁক নেই।

যে তাকে দরজা খুলে দিয়েছিল, তার দিকে চোখ পড়তেই দেবাশীষ স্তম্ভিত হয়ে গেল। পা থেকে মাথা অবধি শাদা চাদরে ঢাকা, মুখখানা ঘিরে দীর্ঘ গুণ্ঠন,—তবু চেনা।

দেবাশীষ ইতস্তত করছিল, বিস্ময় এবং আকস্মিকতার ঘোর তখনো ওর ঘোচেনি।

চিনতে পারছেন না, না বিশ্বাস করতে পারছেন না, জামাইবাবু? ঘোমটা খসে পড়তে একখানি সুকুমার মুখ দেখা গেল—'আমি সরমা।'

নয়

আশ্চর্য, অল্প বয়সের কত খুঁটিনাটি মনে আছে শুভাশীষের, কিন্তু হাজার চেষ্টায়ও সে মনে করতে পারেনি, যেদিন সকালে উঠে বাবাকে দেখা গেলনা সেদিন আকাশের রঙ কী ছিল। এটুকু মনে আছে সেদিনও সকালে উঠেছে; মা ওঠবার আগেই, মাসিমা ডেকে দেবার আগেই। উঠে সূর্যস্তব পড়েছে, বাবার শেখান মন্ত্রটা। কিন্তু কিছুতেই মনে পড়ছে না সেদিন সূর্য উঠেছিল কি না। আবছা মতন মনে

আছে, সেদিন কুয়াসা ছিল। শেষ রাত থেকে বুঝি শিশির পড়েছিল পেয়ারা গাছের পাতায়, উঠোনের কোনে গাঁদার কুঁড়িতে, পেঁয়াজের কলির শীষে, আর দাওয়ার কোল ঘেঁষে ভয়ে ভয়ে গজান ঘাসে।

শুভাশীষ পড়লে, সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্তী নারায়ণ, সরসিজাসনসন্নিবিষ্টো, কেয়ূরবান, কনককুণ্ডলবান্,—কিন্তু তখনো আকাশের বোজা চোখ ফুটল না। সমস্ত দিকই কেমন ভিজে, থমথমে।

ফিরে এসে বই খুলে বসল। খানিক পরে চারুও এল। কেউ কোন কথা বলল না, বইয়ের পাতা উল্টে যেতে লাগল। কিছুক্ষ পরেই শুভাশীষ উসখুস করতে শুরু করল। অন্যদিনে এতক্ষণ রান্নাঘরে ডাক পড়ে। কয়লার উনুনে চাপান কেৎলির ঢাকনিটা থর থর করে কাঁপছে কথা-বলতে-চাওয়া দুটি ঠোঁটের মত। সেই উনুনের চারপাশে গোল হয়ে বসবে সকলে। গরম চা-পানের সঙ্গে সঙ্গে হাত পা গরম হয়ে উঠবে।

দিদি! শুভাশীষ এক সময়ে বলে উঠল।

চারু বই থেকে চোখ তুলে তাকাল।

আজ চা হবেনা রে?

জানালা দিয়ে চারু একবার রান্নাঘরের দিকে তাকিয়ে দেখল।—এখনো উনুনে আঁচ দেওয়াই হয়নি।

কে বললে দেওয়া হয়নি। শুভাশীষও উঁকি দিলে। ওই তো চাল দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে।

দূর বোকা। ওকি উনুনের ধোঁয়া। ও হ'ল বাষ্প।

তাই বটে। লজ্জিত শুভাশীষের এতক্ষণে খেয়াল হ'ল। খড়ের চাল, সারারাত শিশিরে ভেজে, দু'চার ফোঁটা টপ্ টপ্ করে ঝরে উঠোনে, কাপড় শুকোবার তারে সার দিয়ে থাকে খানিকটা ছোট ছোট বুদ্বুদের মত। তারপর সকালে সব ধোঁয়া হ'য়ে মিলিয়ে যেতে

সুরু করে। ভিজে উঠোন থেকে ধোঁয়া ওঠে, ধোঁয়া ওঠে পেয়ারা গাছের পাতা আর পেঁয়াজ কলির শীষ থেকে। পুকুর থেকে ওঠে অসংখ্য ধারায়, কখনো সুতোর মতো সরু, কখনো ছড়ান, মসলিনের বনাতের মত। হাঁ করে ভাপ ছাড়লে মুখ থেকেও ধোঁয়া বেরোয়। তেমনি ধোঁয়া নয়। বাষ্প।

তারপর কোন এক সময় বুঝি সূর্যও দেখা দিয়েছিল। কিন্তু বাড়ির আর সব কোথায়। কান পেতেও কারুর সাড়া পাওয়া যায়না কেন। দাদু তো সকালে উঠে পোষ্ট-আফিসে যান জানি, কিন্তু এখনো কি ফেরেন নি। মা কি এখনো ফেরেন নি পুকুরে ডুব দিয়ে। মাসিমা এখনো ঠাকুর ঘরে? আর বাবা—

—বাবা কোথায়, দিদি?

—কী জানি কোথায়, সকাল থেকেই তো দেখছি না।

—বোধহয় চাকরিতে, নারে? আজ থেকেই তো বাবার চাকরি।

—দূর, পাগলা। সকালে আবার কিসের চাকরি।

ঠিক এই সময়ে মাসিমা এসে চারুকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন। আড়ালে ডেকে চারুকে কী বললেন মাসিমা। কী এমন কথা, শুভাশীষকে যা বলা চলে না?

প্রথমে অভিমান হয়েছিল, পরে কিন্তু জয়ী হ'ল কৌতূহল। পা টিপে টিপে উঠে গেল শুভাশীষ। উঠোনের কোনে, তুলসী মঞ্চের পাশে, কাঁঠাল গাছের নিচে দাঁড়িয়ে মাসিমা চারুকে বলছেন—তুমি তো এখন বড় হয়েছ মা, সবই বোঝ। কাউকে কিছু বোলো না, হৈ চৈ কোর না। দিদি সকাল থেকে পুকুর ঘাটে গিয়ে বসে আছে। দিদির পাশা-পাশি থেকো।

ছায়া যেমন সরে যায়, তেমনি নিঃশব্দে সরে এল শুভাশীষ। কী

কথা, জানতেই হবে তাকে। কেন এই চাপা গলা, এই ফিস-ফিস। কী এমন কথা যা চারুও জানতে পেল, পেল না শুধু শুভাশীষ।

দাদু এর মধ্যে একবার বুঝি এসেছিলেন, বাড়ির মধ্যে তাঁর গলার সাড়া একবার পাওয়া গিয়েছিল, আবার কখন বেরিয়ে গেছেন। বাবা? শুভাশীষের সহসা খেয়াল হ'ল, বাবার কাছে জানতে হবে কথাটা। কিন্তু বাবাও সেই যে সকালে কোথায় বেরিয়েছেন, এখনো ফেরার।

পথে বেরিয়ে এদিক ওদিক ঘুরল শুভাশীষ। ইস্কুলের পেছনে, বাজারে, স্টেশনে, এমন কি রেল লাইন ধরে কেবিনঘর অবধি।

ক্লান্ত হয়ে বাড়িতে ফিরে এল যখন, তখনো সব চুপ চাপ। উঁকি দিয়ে দেখল, রান্নাঘরে শিকল তোলা। এত অভিমান হ'ল শুভাশীষের, যে আর কোন কথা বললে না। চুপ করে পড়ার টেবিলের সমুখে চেয়ারে পা ঝুলিয়ে বসে রইল। মাথাটা ঝিম ঝিম করছে, পেট চন চন করছে ক্ষিদেয়।

ঘুম ভাঙতে দেখল মাসিমা পাশে দাঁড়িয়ে। কোন কথা বললেন না, ইঙ্গিতে শুধু রান্নাঘরে যেতে বললেন। বড়ঘরটার ছায়া উঠোন ছেয়ে ফেলেছে, কত বেলা এখন। পোলের ওপর ট্রেন চলার গমগম শব্দ, ওকি সাড়ে তিনটের সাটল প্যাসেঞ্জার।

শুধু আলুভাতে, ফেনা ভাত আর ঘি। মাছ নেই কেন, বলে শুভাশীষ চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল, কিন্তু মাসিমার চোখে চোখ পড়তেই চুপ করে গেল।

মাসিমা বললেন, যা আছে খেয়ে খাও। আজ আর কিছু নেই। আমি কিছু দেখতে পারিনি। চারুই যাহোক দু'টো ফুটিয়েছে। বাবা এখনো বাসায় ফেরেন নি, দিদি এখনো খায়নি।

চারু ভাত দিচ্ছিল, মাসিমা ওঘরে যেতেই শুভাশীষ জিজ্ঞাসা করল, দিদি, কী হয়েছে রে?

—কিছু না, তুই খা এখন।

হাত গুটিয়ে বসল শুভাশীষ —বল, বলতেই হবে তোকে। না বললে খাব না, কিছুতেই না। মা খাননি কেন। দাদু ফেরেন নি কেন—যত প্রশ্ন ছিল, এক নিশ্বাসে করে গেল শুভাশীষ—বাবা কোথায় গেছেন সকাল থেকে।

চারু ইতস্তত করল খানিকক্ষণ, হাতাটা ভাতের হাঁড়ির ওপর কয়েকবার ঠুক ঠুক করল, তারপর ফিস ফিস করে বলল, কাউকে বলিস না, বাবা কাল রাত্তির থেকে পালিয়েছেন।

শুভাশীষের খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, পালিয়েছেন ? কোথায় ? কেন ?

আর কিছু জানে না, চারু। এইটুকু জানে, বর্ষার দুর্যোগে সেই যে মানুষটি খাটো খদ্দরের ধুতি পরে অসংস্কৃত মুখ আর এক হাঁটু কাদা নিয়ে হঠাৎ এসে উঠেছিলেন, হেমন্তের শেষ রাতে তিনি তেমনি আবার হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়েছেন, যে দিন তাঁর চাকরিতে ঢোকবার কথা, ঠিক তার আগের রাত্রে। আর, গলা নামিয়ে চারু বললে, আর সেই সঙ্গে সরমাদিকেও পাওয়া যাচ্ছে না।

পাঁচটা আঙুলের ফাঁক দিয়ে মুখের কাছে তোলা গ্রাস থালায় ছড়িয়ে পড়ল। সেদিন আর শুভাশীষের খাওয়া হয় নি।

আশ্চর্য, এত কথা মনে আছে, শুধু মনে নেই সেদিন আকাশের রঙ সকালে কী ছিল। মাঝে মাঝে এমন সব তুচ্ছ, অথচ অস্বস্তিকর বিস্মৃতিও ঘটে! কত কথাই তো মনে থাকে না, পুকুরের জলে খসে পড়া আংটির মত কত কিছুই তো খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু এত সকালে আকাশের রঙ কী ছিল ভেবে ভেবে মরে কেন শুভাশীষ।

বাবাও নেই, সরমাদিও নেই। আলাদা দুটো মানুষের না থাকা। অথচ দু'য়ে মিলে একটা যৌথ ব্যঞ্জনা আছে, স্বতন্ত্র একটা অর্থ। যেটা

চারুকে ডেকে মাসিমা বুঝিয়েছিলেন, শুভাশীষকে বলেন নি। হয়ত কথাটা শুধু দুরূহ বলেই নয়, লজ্জার বলেও। সে লজ্জার ছাপ আছে মা'র চোখছাপান কান্নায়, দাদুর মাথা নীচু করে খেয়ে যাওয়ায়; মাসিমা আর চারুর ফিস ফিস আলাপে।

বাবার কথা কেউ বলে না। অঙ্কের ভুল ফলের ওপর মাষ্টারমশাই যেমন রূঢ় হাতে পেন্সিল টেনে ঢেঁড়া দেন, তেমনি অলিখিত এমন কি অনুচ্চারিত একটা আদেশ এ বাড়িতে ওই নামটার ওপর একটা নিষ্ঠুর নিষেধের রেখা টেনে দিয়েছে।

মুখে বলে না, কিন্তু বাবার কথা ভাবে সবাই। শুভাশীষও ভাবে। এখন শীতকাল, তবু মাঝে মাঝে অকাল দুর্যোগ নামে। সারারাত কনকনে হাওয়ায় উত্তরের দরজা ঠকঠক কাঁপে। লেপের ভেতর মাথাটা টেনে নেয় শুভাশীষ। দূরে রেল লাইনে দেরি গাড়ির আর্ত হুইসিল বাজে। কান পেতে থাকে শুভাশীষ, এখুনি বুঝি দরজায় টোকা পড়বে, দাদুর ঘুম পাৎলা, সাড়া দেবেন, 'কে'।

'আমি দেবাশীষ', আসবে জবাব।

দরজা খুলে দিতেই বাবা ভেতরে ঢুকে পড়বেন, সারা শরীর জলে ভেজা, না-কামানো দাড়িতে মুখে একটা কঠোর রুক্ষতা। বসবেন সামনের ওই চেয়ারটায়। তাড়াতাড়ি উস্কে দেওয়া হবে হারিকেনের আলো। বাবা বলবেন, কী কুয়াসা, কী কুয়াসা। ষ্টীমার আট ঘণ্টা চড়ায় আটকে ছিল। মাসিমা শুকনো ধুতি আর গামছা নিয়ে পাশে এসে দাঁড়াবেন।

মা? মাথায় ঘোমটা টেনে কখন উঠে তক্তপোষটার দূরতম কোনে গিয়ে বসেছেন মা। কিন্তু অস্পষ্ট আলোতেও তাঁর চোখমুখের অস্বাভাবিক দীপ্তিটুকু বোঝা যাচ্ছে। সে কি খুশিতে, সে কি কান্নায়। সে কি অক্ষম অথচ নিষ্ঠুর কোনো প্রতিহিংসায়।

অপরাধীর মত মাথা নীচু করে বসে থাকবেন বাবা। বলবার কোন কথা কেউ অনেকক্ষণ খুঁজে পাবে না। শুভাশীষ কি উঠে আসবে, নাকি লেপের ভেতর আরো নিশ্চিহ্ন হয়ে মিশে যাবে।

বাবা যে কোন অপরাধ করেছেন তাতে আর কোন সন্দেহ নেই শুভাশীষের। মার কাছে অপরাধ, এ পরিবারের সকলের কাছে অপরাধ, বুঝিবা পৃথিবীর সব মানুষের কাছে।

হঠাৎ যেন বুঝতে পেরেছে শুভাশীষ, বাবা আর কখন আসবেন না, এ বাড়িতে ফেরবার পথে চিরদিনের মত কাঁটা দিয়েই তিনি ফেরারী হয়েছেন।

চোখের পাতা ভিজে উঠল শুভাশীষের, কিন্তু সেদিনকার মতো ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল না। যে কাঁদায় লাভ নেই, সে-কান্না চোখের পাতাতেই শুকিয়ে ফেলার কৌশল সে এরি মধ্যে কবে শিখে নিয়েছে।

এখন সাহস বেড়েছে শুভাশীষের, যে মাঠে বাবা ওকে নৌকো করে নিয়ে গিয়েছিলেন, সেখানে সে একলাই এখন ঘুরে আসতে পারে। মাঠে এখন জল নেই, শুকনো ডাঙায় নল খাগড়া গজিয়েছে। এখন আর চার ধারে ধূ-ধূ শূন্যতা নেই, চার ধারে তাকালে এ মাঠের সীমা কোথায়, তাও চোখে পড়ে। ওই তো রেল লাইনের রাস্তা অত্যুচ্চ নাসিকার মত এবড়ো-খেবড়ো মাঠের ভাঙা চোয়ালের ওপর দিয়ে সিধে উঠে গেছে। গীর্জার চূড়াটাও এখান থেকে স্পষ্ট দেখা যায়। এখানে নৌকো থামিয়ে বাবা একদিন বিশ্বরূপ দর্শনের শ্লোক আবৃত্তি করে শুনিয়েছিলেন, কিন্তু আজ সেই শ্লোক ক'টি কিছুতেই মনে আনতে পারল না শুভাশীষ।

·

সব চেয়ে অসহ্য লাগে ক্লাশের ছেলেরা যখন মুখ টিপে হাসাহাসি করে। জমিদারনন্দন নীরদ আর ফাষ্ট বয় বিশ্বনাথ, সব একজোট।

এমন কি, গলায় সোনার হার ঝোলান যে বনোয়ারি সাহা, দিনকতক যে শুভাশীষের দলে ভিড়তে চেষ্টা করেছিল, সেও ওদের দলে মিশে গিয়ে ছড়া কাটছে।

প্রথম প্রথম শুভাশীষ চেষ্টা করেছে ওদের কথায় কান না দিতে। বার্ষিক পরীক্ষা সামনে, ক্লাশে এসেও বইয়ের ওপর মুখ গুজে থাকত। আশে পাশের আর পিছনের বেঞ্চি থেকে তাকে লক্ষ্য করেই যে সব টিটকিরি চলেছে, সেদিকে কান দিত না।

কিন্তু কান না দিলেও কান লাল হয়ে উঠতে পারে। একদিন ক্লাশে এসে দেখল ঠিক ওর বসবার ডেসকে কে যেন ছুরি দিয়ে নিপুণ হাতে দুটি নাম খোদাই করে রেখেছে : দেবাশীষ+সরমা।

এতকাল সরলের অঙ্কে যে চিহ্নের ব্যবহার দেখেছে, আজ দু'টি মানুষের নামের মাঝখানে সেই চিহ্নটিই এমন একটা কদর্য ব্যঞ্জনা নিয়ে এলো যে মাথা নু'য়ে পড়ল। কার কীর্তি, জানতে আর বাকি নেই। বনোয়ারি ছাড়া এমন নিপুণ কাঠখোদাই আর কার হাতে সম্ভব।

বই দিয়ে নাম দু'টো চাপা দিয়েছিল শুভাশীষ, কিন্তু চিত্রটা যেন মনের মধ্যেও ছাপা হয়ে গেছে। আর, একটু পরেই হেলতে দুলতে এলো বিশ্বনাথ।

—কী বইরে, এটা? বলতে বলতেই খপ করে তুলে নিলো শুভাশীষের বই। তারপরেই কৌতুকমিশ্রিত বিস্ময়ের সঙ্গে বলে উঠল, ইস, এমন করে বেঞ্চটাকে কে কাটলে? বেনোটা বুঝি। কী লিখেছে দেখি। দেবাশীষ+সরমা।

সঙ্গে সঙ্গে ক্লাশ শুদ্ধ ছেলে ঝুঁকে পড়েছে শুভাশীষের ডেসকের ওপর। দেবাশীষ আর সরমা শব্দ দু'টো একশ দিয়ে গুণকরা সংখ্যার মত হঠাৎ স্ফীত হয়ে পড়েছে। সরমা-দেবাশীষ। দেবাশীষ-সরমা। ফিরছে

মুখে মুখে, সহপাঠিদের বিদ্রূপবক্র ঠোঁটে নড়ছে দু'টো নাম, কৌতুকদীপ্ত চোখে জ্বলছে।

—দেবাশীষ কে ভাই? একজন জিজ্ঞাসা করলে।

—জানিস না, ওর বাবা। সেই যে খদ্দর পরা ভদ্রলোক, দিন কতক এখানে এসেছিলেন। চোখ টিপে দিলে আরেকজন।

—আর সরমা?

—বাঃরে, সরমাই তো আসল, যাকে নিয়ে দেবাশীষবাবু সরে পড়েছেন। মুচকি হেসে জবাব দিয়েছে টেরিডুরস্ত নীরদ।

এতক্ষণ মাথাটা ডেসকের ওপর নুইয়ে দিয়েছিল শুভাশীষ, এবারে আর পারল না। মাথা তুললে। টকটকে লাল চোখে তাকালে একবার যে ছেলেরা তাকে ব্যূহের মতো ঘিরে ধরেছে, তাদের দিকে! দেবাশীষ-সরমা—সরমা—দেবাশীষ। সকলের চোখে চোখে।

শুভাশীষ করলে কি, সামনে যাকে পেল, তাকে জোরে ধাক্কা দিলে। তারপর হঠাৎ লাফ দিয়ে ছুটতে শুরু করলে। ছেলেরাও বুঝি পিছন পিছন ছুটতে আরম্ভ করেছিল, কিন্তু শুভাশীষ ততক্ষণে ডিঙিয়ে গেছে স্কুল কম্পাউণ্ড, রেলওয়ের শুকনো ডিচ, ওয়েস্ট কেবিনের গুমটি, লাসকাটা ঘর।

পশ্চাদ্ধাববান শেষ পদশব্দটুকু মিলিয়ে যেতে শুভাশীষ ফিরে তাকাল। আর কেউ আসছে না, এখানে কেউ নেই। কালভার্টের ধারে বসতেই, জীবনের সমস্ত থামিয়ে দেওয়া কান্না যেন চোখ ভরে নেমে এল। কী এমন করেছেন তার বাবা, যার জন্যে সবাই মিলে এমন হাসাহাসি করবে, টিটকিরি দেবে। সরমাদিকে নিয়ে পালিয়েছেন? কিন্তু শুভাশীষের সমস্ত সত্তা বলে উঠল, এ হতে পারে না, হতে পারে না, তার বাবা কখনো সরমাদিকে নিয়ে পালাননি।

সে নিজে ক্লাশের ছেলেদের চোখে ছোট হয়ে গেছে, সে জন্যে নয়;

—তার বাবাকে সবাই ভুল বুঝেছে, সবাই মিলে অবিচার করছে তাঁর ওপর, এই কথা ভেবেই শুভাশীষের চোখে আর একবার জল এল।

বাবা এখানে থাকতে দিন কতক সবাই খদ্দর পরতে শুরু করেছিল, এবারে আবার ফাইন মিলের ধুতি-শাড়ি শুরু হ'ল।

চারু বলে, ভালোই হ'ল, খদ্দর কী মোটা, গায়ে রাখতে পারতাম না। এবারে একটু হাঁপ ছেড়ে বাঁচা যাবে।

অসুখে ভুগে চারু যেটুকু রোগা হয়েছিল, সেটা এখন সুদে আসলে পুষিয়ে নিচ্ছে, দুপুরে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে। বাড়ি থেকে বেরুন ওর একেবারে বারণ।

আর যাবেই বা কোথায়। সরমাদিদের বাড়ি? তা হ'লে মা-মাসিমা আর আস্ত রাখবেন না। ভারি হুঁসিয়ার হয়ে গেছেন সবাই, সরমাদির ব্যাপারটার পর। ও বাড়ির নির্মলের সঙ্গেও যে চারু মিশত, সেটা মা'র জানা ছিল। স্পষ্ট করে চারুকে ডেকে শাসন করে দিয়েছেন, খবর্দার কোন রকম বেয়াদপি বেহায়াপনা যেন না দেখি।

আর চারুও যেন অত্যন্ত সুশীলা বালিকা হয়ে গেছে। নির্মল দু' একদিন রাস্তায় ঘোরাঘুরি করেছিল, চারুর সঙ্গে চোখাচোখির আশায়। কিন্তু চারু সঙ্গে সঙ্গেই মুখের ওপর জানালাটা বন্ধ করে দিয়েছে।

আস্তে আস্তে সবই আবার স্বাভাবিক হয়ে আসতে লাগল, পুরনো ছবির রঙ যেমন ধীরে ধীরে ফিকে হয়ে আসে, তেমনি একটি লোকের গ্লানিকরভাবে অন্তর্ধান করার স্মৃতিও মিলিয়ে এল।

মাসিমা আবার সংসারের কাজে মন দিয়েছেন। আগেকার মতই ভোরে উঠে উঠোনে গোবরের ছড়া দিচ্ছেন, ঘর মুছছেন, ঢুকছেন রান্না ঘরে। মাছের ঘরের পাট সারা হলে নিজের জন্যে ভাতে ভাত ফুটিয়ে নিচ্ছেন। ঘি আর আলুভাতে দিয়ে বরণের চালের ফেণা ভাত মেখে যখন ডাকেন, চারু, খোকা খাবি আয়, তখন প্রায় বেলা ফুরিয়ে আসে,

ও বেলার কাজের পালা শুরু হয়। উঠোনে শুকোতে দেওয়া কাপড় তুলতে হবে ; তুলসীতলায় জ্বালতে হবে সন্ধ্যাদীপ।

এর আগে মা আর মাসিমা দু'জনে মিলে যেটুকু করতেন, মাসিমাকে এখন একাই সেটুকু করতে হয়। মা আস্তে আস্তে সংসার থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন। নিতান্ত শরীর রক্ষার জন্য যেটুকু না করলে নয়, তাই করেন। বাকি সময় মোটা মোটা পুঁথি পড়েই কাটে। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত।

সকাল-সন্ধ্যা বইয়ের উপর মুখ গুঁজেই কাটে। দাদু কখনো কখনো ধমক দেন, করছিস কি বিভা, চোখ দু'টো একেবারে যাবে যে।

উঠে গিয়ে চোখে একটু জলের ঝাপটা দিয়ে ফিরে এসে মা বলেন, যাবে না বাবা। এসনা, তুমিও একটু শোন।

আমি? দাদু হাসেন একটু। সারাজীবন অধর্ম করে এখন আর ধর্মগ্রন্থ পড়ে তার ওপর চুণকাম করার রুচি নেইরে। গেরুয়া পরেই যেমন সন্ন্যাসী হয় না, কিম্বা খদ্দর পরে স্বদেশী—

মা'র চোখের দিকে চেয়ে দাদু আর কথাটা শেষ করতে পারলেন না। খদ্দরপরা একটি বিশেষ মানুষের ছবি মনে পড়ল, তার কীর্তিও।

কিন্তু তবু মাঝে মাঝে মাকে বেরুতে হয়। সন্ধ্যার পর কালীবাড়িতে আরতি হয়, মা সেখানে যেতে চান। নাটমন্দিরে কথকতা শুনতেও যাওয়া চাই। এপারের ঘর ভেঙেছে, মা বুঝি তাই ওপারের ঘরখানা পাকা করেই তুলতে চান।

মা ভোলেন নি। শুভাশীষ বুঝতে পারে, আর সবাই যতই সহজ হয়ে আসুক না কেন, যতই মুখের রঙ বদলাকনা তাদের, মা বদলাননি একটু-ও। পাথরের মত নিথর মুখে একটি রেখাও নতুন করে পড়েনি, নিজের জীবনের ব্যর্থতার লজ্জায় স্তম্ভিত মুখে। বইয়ের পাতায় পরকালের ঠিকানা খুঁজছেন না মা, আড়াল করেছেন আপনাকে, আপন লজ্জাকে।

মাসিমা দাদুকে মাঝে মাঝে বলেন, তুমি দিদিকে নিয়ে না হয় দিন কতক ঘুরে এস বাবা এদিকে ওদিকে। এখানে ও মরে যাবে।

বিব্রতভাবে পাকা চুলে দাদু হাত বোলান। বিধবা মেয়েকে তীর্থ দর্শন করালে তবু মানে হ'ত। আর তীর্থে গেলেই কি সব ভুলবে বিভা। যার কিছু নেই, সব প্রত্যাশা চুকে গেছে, তাকে ভোলান চলে। কিন্তু যার সব থেকেও কিছু নেই, সে ভোলে কিসে।

সবচেয়ে পরিবর্তন হয়েছে চারুর। পান খেয়ে ঠোঁট টুকটুকে করছে বারে বারে; একটা হঠাৎ-খুশির কুঁড়ি যেন। আগে কুয়োর ধার খোলা ছিল, সেখানেই সবাই চান করতো, আব্রু ছিল না কিছু। এখন সেখানে চান করতে গা-শির-শির লজ্জা চারুর। বাড়ির চার পাশটা যদিও দর্মা আর ক্যানেস্তারার টিন দিয়ে ঘেরা, তবু কে জানে, কোথায় কার চোখ আছে। তাড়াতাড়ি গায়ে কোন মতে ঘটি দুই জল ঢেলে জড়সড় ভিজে কাপড়ে ঘরে ঢোকে।

মাসিমা বলেন, তোর হাতে পায়ে এমন মাটি পড়ল কেন রে, চারু? সাবান মাখিস নে বুঝি?

লাল হয়ে উঠল চারু।—দাদুকে বলে কুয়োর পাড়টা একটু ঘিরে দিতে বলো মাসিমা।

—ঘিরে দিতে? মাসিমার বুঝি অবাক লাগে। কেন রে? বাড়িটা তো ঘেরাই আছে।

ঘেরাই আছে? কী বিবেচনা মাসিমার। 'মিশন কম্পাউণ্ডের জাম গাছটায় উঠলে এ বাড়ির সবটা দেখা যায় না বুঝি!

মাসিমা এবারে আর না হেসে পারেন না।

—তোর কি মাথা একেবারে খারাপ হয়ে গেছে চারু। জাম গাছে উঠবে কে। একি জামের সময়।

তর্ক করে আর পারা যাবে না মাসিমার সঙ্গে। জামের সময় না হলে কি আর জাম গাছে চড়তে নেই নাকি। আর জামের সময়ও কি আর আসবে না।

কি জানি বাপু। আমরাও এ বাড়িতে মানুষ হয়েছি। চান করেছি এখানেই। আমাদের লজ্জা ছিল, বাড়াবাড়ি ছিল না। বাড়ি ঘেরা আছে, আশে পাশেও সব পাড়ার মানুষ, আপন জন—

মাসিমাকে কিছুতেই বোঝাতে পারবে না চারু। কী করে বলবে, আপন মানুষের কাছেও তার লজ্জা! তার লজ্জা বুঝি নিজের কাছেও। নতুন কালের মেয়েদের নতুন ধরণের লজ্জা। মাসিমা বুঝবেন কি করে। তাঁদের সময়ে তাঁরা খোলা পুকুরের ঘাটে স্নান করেছেন। কখন কখন মেয়েদের ঘাটে পুরুষেরাও থাকতো। কিন্তু তারা তো পাড়ার লোক। দাদা, কাকা, মেসো, পিশে। আড়াল থেকে অন্য কেউ দেখে ফেললেও ক্ষতি ছিল না। মুখোমুখি পড়ে গেলে মুখ নীচু করলেই হ'ল, মাথায় কাপড় টানলেই হ'ল। শুধু তাঁদের জোর গলার কথা কেউ শুনতে পায়নি। লজ্জা সম্পর্কে ধারণাই ছিল স্বতন্ত্র।

আর এ কালের মেয়েরা জুতো পরে, সবার সঙ্গে কথা বলে, সামনে বেরোয়, যত লজ্জা তাদের কি শুধু আপন ঘরে, নিরালায় স্নান করবার মুহূর্তটিতে।

শেষ পর্যন্ত কুয়োতলাটা ঘিরতে হ'লও। ন'টা বাজতে-না-বাজতে চারু সেখানে গিয়ে ঢোকে। ভেতর থেকে ছিটকিনি দিয়ে এক ঘণ্টা দু'ঘণ্টা আছে তো আছেই। কত চান করে চারু? মাঝে মাঝে দু' একটি গুণ গুণ গানের কলি ভেসে আসে। মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে ডাকে চারু, ও মাসিমা আমার পিঠে একটু সাবান মেখে দাও। মাসিমাকে শুধু পিঠে সাবান মাখিয়ে দিতে হয় না, ঝামা দিয়ে পা ঘষেও দিতে হয়।

স্নান শেষ করে তৈরি হতেও চারুর কম সময় লাগে না। একেবারে

ফিটফাট হয়ে সে যখন রান্নাঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়ায়, তখন মাসিমার মুখ আগুনের আঁচে টকটকে লাল হয়ে উঠেছে।

—আমি আসব মাসিমা? তোমাকে সাহায্য করব?

খুন্তি হাতে নিয়েই তাড়া দেন মাসিমা। মার খাবি চারু। উনুনের কাছে বসে বসে রঙ কালো হোক তোমার, তারপর বিয়ের সম্বন্ধ খুঁজে হাঁপিয়ে মরি আমরা।

লজ্জা পায় চারু। মুচকি হাসে। ছুটে পালায়।

মা-মাসিমা-দাদুর আলাপে বুঝে নিয়েছে শুভাশীষ যে চারুকে শীগগিরই বিয়ে দেওয়া হবে। বয়স হিসেবে পোনেরো কিছুই নয়, কিন্তু এঁরা ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। সরমা পালিয়েছে দেবাশীষের সঙ্গে, সেই সরমার সঙ্গে চারুও তো মিশত, কে জানে সরমা এ মেয়েটাকেও কিছু শিখিয়ে গেছে কিনা। তার চেয়ে, সময় থাকতেই, বিয়ে দেওয়া হোক, মনটা নরম থাকতে থাকতেই।

দাদুর বিশেষ ইচ্ছে ছিল না এত অল্প বয়সে চারুকে বিয়ে দেবার। কিন্তু জেদ ধরেছেন মা। ওকে আর ঘরে রেখোনা বাবা। বিয়ের চেষ্টা দেখ। নইলে কে জানে, আবার কী সর্বনাশ করে বসবে।

একটি লোক বিশ্বাস ভেঙেছে বলে বিশ্বশুদ্ধ লোককেই বুঝি মা অবিশ্বাস করতে শুরু করেছেন।

দাদু সম্বন্ধ খুঁজছেন, আর চারু চান করে, গান গেয়ে দিন কাটাচ্ছে। উনুনের কাছে ঘেঁষতে দেওয়া হয় না চারুকে, রঙ ময়লা হবে। বাটনাও বাটেনা, হাতে কড়া পড়বে।

এক দিন টিফিনের সময় শুভাশীষ বাসায় ফিরতে ফিরতে সদর রাস্তা থেকেই হারমোনিয়ামের সঙ্গে মেলানো চারুর গলা শুনতে পেয়ে অবাক হয়েছিল। এই ভরা দুপুরে কি গলা সাধছে চারু।

বাইরের ঘরে ঢুকতে গিয়ে পিছিয়ে এল। অপরিচিত তিন চারজন লোক গালে হাত দিয়ে চারুর গান শুনছে। দাদু কৃতার্থ, কাঁচু মাচু মুখে দাঁড়িয়ে আছেন চারুর পিঠের কাছে।

ঘুরে গিয়ে খিড়কির দরজা দিয়ে বাড়িতে ঢুকল শুভাশীষ। মাসিমা তিন চারখানা রেকাবে মিষ্টি সাজাচ্ছিলেন। শুভাশীষের হাতে একটা মিষ্টি তুলে দিয়ে বললেন, এখানে বসে খাও, ওঘরে গিয়ে গোল কোর না। চারুকে দেখতে এসেছে।

দশ

'দেখতে আসা' কথাটা এই প্রথম শুনল শুভাশীষ। দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিয়ে তার নমুনাও দেখল। খাবার পাঠিয়ে দিয়ে মাসিমা দরজার কব্‌জার ফাঁকটুকুতে চোখ রেখে দাঁড়ালেন। শুভাশীষও আছে পাশে। মা অস্থির পায়ে চলা ফেরা করছেন।

আজ সারা দুপুর-ভোর চারুকে বুঝি শুধু সাজিয়েছেন মাসিমা। ভিজে গামছা দিয়ে মাথাটাকে শক্ত করে বেঁধে অল্প অল্প চেপে চেপে দেওয়া, যার নাম পাতা-কাটা। প্রদীপের ওপর সরষের তেলমাখানো কাঁঠালপাতা ধরে তৈরি যে কাজল, তা এখন সূক্ষ্ম রেখায় চারুর চোখের পল্লবে টানা। কপালে খয়েরি টিপ। ঝামা-ঘষা পায়ের পাতা দু'টি এমনিতেই রক্তাভ, তার ওপর মাসিমা বুঝি আবার তার প্রান্ত দিয়ে গাঢ় আলতার রেখা এঁকে দিয়েছেন।

মাথা নীচু করে চারু হারমোনিয়ামের ওপর আলগোছে আঙুল বুলিয়ে যাচ্ছে, চিকণ গলা থেকে গান উঠছে :

> কী সুর বাজে ভাঙা হৃদি মাঝে
> আমি জানি, আমার মন জানে।
> কাহার ছবি,—

গলাও অল্প অল্প কাঁপছে চারুর। মৌখিক পরীক্ষার সময় শুভাশীষ সেবার ঘাবড়ে গিয়ে সামান্য রকম তোৎলামি করেছিল, মনে আছে। জানা প্রশ্নের জবাবও ঠিকমত দিতে পারেনি, সেই জন্যে কিছু কিছু নম্বর কাটা গিয়েছিল। চারুরও নম্বর কাটা যাবে নাকি।

নম্বর কাটা যাওয়া দূরে থাক, আরো খান দুই গান গাইতে হ'ল চারুকে। কাগজে নিজের নাম সই করতে হ'ল দু'রকমে, ইংরিজি আর বাংলা। চোখে নিকেলের চশমা-আঁটা ভদ্রলোক চোখের সমুখে ধরলেন কাগজখানা। বাঃ, দিব্যি লেখা। রাঁধতে জান?

জবাব দিলেন দাদু। রাঁধতে জানে কিনা জিজ্ঞাসা করছেন? এ বাড়িতে রাঁধে তো ওই। ওর মার শরীর খারাপ। সব রান্না জানে দিদি। চচ্চড়ি ডাল-ভাত থেকে মাছ-মাংস অবধি।

বেশ, বেশ। খুশি হ'য়ে অভ্যাগতদের একজন আস্ত একটা সন্দেশ মুখে পুরে দিলেন।

আচ্ছা, এবার এস মা।

অনুমতি পেয়ে চারু উঠে দাঁড়াল, দাদুর ইঙ্গিতে সবাইকে নত হয়ে নমস্কার করল একে একে। তারপর আস্তে আস্তে হেঁটে ভেতরে চলে এল।

ভেতরে এসেই চারুর কিন্তু আবার অন্য রূপ। খোঁপাটাকে খুলে ফেলেছে কখন, দৌড়ে গিয়ে বসে পড়েছে মিষ্টির থালাটার পাশে। কে বলবে এই মেয়েটাই একটু আগে শান্ত হয়ে একঘর লোকের সমুখে পরীক্ষা দিয়েছে।

খেতে খেতে একবার হি হি করে হেসে উঠল চারু। দাদুর কথা শুনেছিলে মাসিমা? আমি নাকি সব রকম রান্না জানি। বলতে বলতে আবার হেসে ফেললে চারু, মিষ্টির থালাটার ওপরই গড়িয়ে পড়ে বুঝি। আমি নাকি সব রকম রান্না জানি। চা-ছাড়া জন্মে আর কিছু রাঁধিই নি

—তা-ও আমার দাদু বলেন, ঠিক মত স্বাদ হয় না, দুধ আছে তো চিনি নেই, চিনি ঠিক আছে তো দুধ কম।

ওঁদের সবাইকে এগিয়ে দিয়ে দাদু ফিরে এসেছিলেন, দাড়িতে হাত বুলিয়ে খালি হাসতে থাকলেন চারুর কথা শুনে।

মা আড়ালে ডেকে নিয়ে গেলেন দাদুকে।

—কী হ'ল বাবা, ওরা কী বললে। পছন্দ হয়েছে?

—পাকা পাকি কিছু বলে গেল না। গিয়ে চিঠি দেবে। বলছিল, বড্ড বয়স কম, ছেলের সঙ্গে মানাবে না।

মা গম্ভীর হয়ে গেলেন। মানাবে না? বয়স কত ছেলের?

—তিরিশের মতন।

—তিরিশ। তিরিশ আর পোনেরো। মা অল্পক্ষণ কী ভাবলেন। তা হোক, তুমি ওদের মত করাও। পোনেরো বছরের মেয়ে তো আর কচি খুকি নয়, ওর বয়সে আমার—

ওর বয়সেই যে চারুকে তিনি পেটে ধরেছেন, এই কথাটা দাদুকে বলতে বলতে মা চুপ করে গেলেন।

সে বিয়ে অবশ্য চারুর হয়নি। চিঠি লিখবেন কথা দিয়ে যাঁরা গিয়েছিলেন, তাঁরা প্রতিশ্রুতিপালনে অযথা বিলম্ব করতে লাগলেন। সুতরাং এরি মধ্যে আরেকটি পাত্রপক্ষ এসে চারুকে দেখে গেল। সেবারে যারা এসেছিলেন, তাঁরা সবাই প্রবীণ, এবারে ছেলে ছোক্‌রারা এল।

এরা না চেয়েছে মেয়ের চলন দেখতে, না খুলেছে চুল। গোড়ালি থেকে শাড়ি তুলে ধরে পায়ের গোছও দেখতে চাওয়ার অসভ্যতাও করেনি। এরা একবারে একটা রসগোল্লা মুখে তোলেনা, ভেঙে ভেঙে একটু একটু খায়; চায়ে চুমুক দিতে দিতে চশমার ফাঁক দিয়ে মিটি মিটি চায়। দাদু এদের কাছেও বুঝি রান্নার সুখ্যাতি সুরু করেছিলেন, কিন্তু এরা তাতে কর্ণপাতও করলে না। হঠাৎ একজন জিজ্ঞাসা করে বসল,

মাংসের চপ বানাতে জানেন ? কাস্টার্ডে কী-কী লাগে বলুন তো। এক ডজন এগ্ স্যাণ্ডুইচ তৈরী করতে ক'টা ডিমের 'পুর' দেবেন আপনি।

কলকাতার হোস্টেলে থাকা সৌখীন ছোক্‌রা সব, রেস্তোরাঁর মেনুটাকেই প্রশ্নপত্র করে মেলে ধরেছে একটি কিশোরীর সামনে।

একটি ছেলে এতক্ষণ শুধু রুমালে ঘাড় মুছছিল, সে বললে, ওসব প্রশ্ন থাক অজিত। বরং গান শোনা যাক।

চারু ইতিমধ্যেই একটু মুষড়ে পড়েছিল, হারমোনিয়ামটা টেনে নিয়ে এমন ক্ষীণ গলায় গাইতে শুরু করলে, যে তার গলা শোনাই গেল না।

পান ওরা খেলে না কেউ। যথারীতি খবর দেবে বলে জানিয়ে গেল। সিগারেট ধরালে জন দুই। তারপর পেছন ফিরে বাড়িটার দিকে ধোঁয়া ছেড়ে চলে গেল।

বোঝা গেল, পছন্দ হয়নি। কাপড় ছাড়তে ছাড়তে চারু শুনতে পেল, দাদু বলছেন, যে ওকে গান গাইতে বলল, সে হ'ল পাত্র নিজে।

মাসিমা বললেন, সে আমি আগেই জানি, ওর রুমালে মুখ মোছার ঘটা দেখে। আগাগোড়া চুপ করে বসেছিল, একটা সিগারেট পর্যন্ত খায়নি। কবে পর্যন্ত চিঠি দেবে বললে ওরা ?

—দেখি, কবে দেয়। পছন্দ হলে তবে তো। আজকালকার ছেলে, ওরা একটু আপ্‌টুডেট মেয়ে চায়।

—কেন, চারু আমাদের সেকেলে নাকি ! ওর মত ইংরিজি হাতের লেখা ক'জনের। ওর মত গলা—

—সে গলা শোনা গেল কই। দাদু সখেদে বললেন।

—বোধ হয় একটু ঘাবড়ে গিয়েছিল।

কাপড় বদলে চারু বেরিয়ে এল। রুমালে ঘাড় মুছছিল যে, সেই তবে ছেলে ? মাথা নীচু করে বসেছিল ? মাসিমার কথায় চারুর হাসি পেল। নীচু মাথা তুলে তুলে ক'বার যে চারুর চোখে চোখে চেয়েছে, হেসেছে

অল্প অল্প, তাতো আর মাসিমা দেখেন নি। চারু যদি ঘাবড়ে গিয়ে থাকে, সে ওই হাসিতে, অসভ্য ছোকরাগুলোর প্রশ্নে বা ইয়াকিতে নয়।

—খেতে দাও, মাসিমা, খিদে পেয়েছে।

সন্দেশের একটা থালা চারুর দিকে ঠেলে দিয়ে মাসিমা বললেন, নে, প্রসাদ খা।

প্রসাদ মানে ?

মানে আবার কী। ওটা চরণের প্লেট। স্বয়ং পাত্রের।

প্লেটটা ঠেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল চারু। খাবোনা বলছি, ঠাট্টা করলে ভালো হবে না।

সঙ্গে সঙ্গে মনটাও যেন খারাপ হয়ে গেল চারুর। চরণ ? অমন ছিমছাম যার চেহারা, তার নাম চরণ ? এত ফুল, এত নদীর নাম থাকতে বেছে বেছে শেষ পর্যন্ত চরণ ?

কিন্তু, চারু আবার ভাবলে, বেটা ছেলে যে। ফুল আর নদীর নামে তো মেয়েদের নাম হয়। থাক তবে চরণই থাক। কাঙালীচরণ তো আর নয়, শুধু চরণ। ইস্কুলের দপ্তরীর নাম ছিল কাঙালীচরণ।

আর, অকস্মাৎ, কী ভেবে চারু খুশি হয়ে উঠলো। এটা তো এতক্ষণ খেয়াল হয়নি। চারু আর চরণ, দু'টোতেই 'চ' রয়েছে যে, আর দু'টোতেই 'র'। এত মিল দু'টো নামে, এ বিয়ে, চারুর মনে হ'ল, অব্যর্থ। আর নামটা এমন কাঠখোট্টাই বা কি। কতো কবিতায় গানেও তো চরণ কথাটা আছে, 'চরণ ধরে বারণ করি, টেনোনা আর চোখের টানে।'

কিন্তু দু' সপ্তাহেও যখন চিঠির জবাব এলো না, তখন চারু একটু মুষড়ে পড়ল। ধীরে ধীরে মতও বদলাতে লাগল। চারুকে পছন্দ হয়নি ? চরণ যার নাম, তার আর কাণ্ডজ্ঞান কতদূর হবে। কেন, অপছন্দের কী আছে চারুকে। বলা যেতো, যদি চারুকে এর আগে কেউ পছন্দ না

করতো। কিন্তু পছন্দ তো করেছিল একজন, সেও আজকালকার ছেলে, তার নাম চরণের চেয়ে ঢের ভালো।

ভাবতে ভাবতে চারুর কান লাল হয়ে উঠলো। নির্মলের সঙ্গে ওর ক'দিনের জন্যে যে সম্পর্ক হ'য়েছিল, সে কথা মনে হতেই শরীরটা যেন আবেশে অবশ হয়ে এল। হিসেব করে দেখলে হয়তো দেখা যাবে, এমন কিছুই ঘটেনি। দুপুরে তাস খেলতে যেতো সরমাদির বাড়ি। কখনো কখনো তাস বাঁটতে বাঁটতে ছোঁয়া ছুঁয়ি হয়ে যেতো নির্মলের সঙ্গে। নির্মল আর উপেনদা একদিকে, আরেক দিকে সরমাদি আর সে নিজে। রঙ্ করার সময় চারু বুকের কাছে টেনে আনতো তাস, আর নির্মলও সঙ্গে সঙ্গে ঝুঁকে পড়ত চুরি করে রঙ দেখার জন্যে। সন্ত্রস্ত হয়ে চারু গায়ের কাপড় টেনে টুনে বসেছে, কিন্তু তাস সামলাতে পারেনি। বুক ঢিপ ঢিপ করতো, আর গালে যে রঙের ছোপ্ লাগতো, সে শুধু রঙ জানাজানি হয়ে যাওয়াতেই নয়!

এই কি ভালোবাসা, যার কথা লেখা আছে গল্পের বইয়ে। চারু প্রথমে বুঝতে পারেনি।

তারপরে একদিন, সরমাদি কী কাজে উঠে পাশের ঘরে গেলেন, উপেনদা গেলেন পেছনে পেছনে, পাটির ওপর তাস ছড়ানো। নির্মল করল কি, মাথা ধরেছে বলে শুয়ে পড়ল চারুর কোল ঘেঁষে, নাকি কোলের ওপরেই? পা দু'টো চারুর ঠক ঠক করে কেঁপেছিল,—ভয় আর লজ্জা তো ছিলই, আরও একটা কিছু ছিল, যার নাম চারু আজও জানে না।

তারপরে আবার সরমাদির পেছনে পেছনে উপেনদা এসেছেন, আবার তাস তুলে নিয়েছে সবাই, কিন্তু খেলা জমেনি।

মোটে তো এই। এর পরেও নির্মলের বার কয়েক মাথা ধরেছে, তাস বাঁটতে গিয়ে ছোঁয়া ছুঁয়িও হয়েছে। কিন্তু এরি মধ্যে শুভাশীষ

একদিন উঁকি দিয়ে কী দেখে ফেলল, কিছুদিন বাদে বাবা এলেন, চারু পড়ল অসুখে। অসুখও সেরে গেল, বাবা আর সরমাদিও নিখোঁজ। কোথায় যেন সুর কেটে গেল।

এখনো সেই তাসখেলার দুপুরগুলো স্মৃতিতে আছে, কিন্তু তাতে উত্তাপ নেই। মাঝে মাঝে ভাবতে ভালো লাগে, শরীর অবসন্ন লাগে, কিন্তু রোমাঞ্চ হয় না। নির্মল মিলিয়ে যাচ্ছে, পুরানো একটা জ্বালাকরা ক্ষতের দাগের মতো। একটা বিপর্যয়ের ভেতর দিয়ে দুটি পরিবার বরাবরের মতো বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। রাস্তা দিয়ে নির্মল এখনো এদিকে তাকাতে তাকাতে যায়, কেউ না থাকলে শীষও দেয়। দিক, চারু জানালা খোলে না।

এর পরে একদিন যাঁরা চারুকে দেখতে এলেন, তাঁরা মহিলা। পানের বাটা ঘিরে বসলেন সকলে, চারুকেও ডেকে নিয়ে আসা হ'ল সেইখানে। চারুকে ওঁরা সাজতে দিলেন না। যেমন ছিল চারু, তেমনি এলো। তাদের দিকে পানের বাটা ঠেলে দিয়ে একজন বললেন, পান সাজো তো মা।

চারু পান সাজে মাথা নীচু করে, আর মাসিমা তার ওপর লক্ষ্য রাখেন। পান অবশ্য চারু সাজতে জানে। কিন্তু আজ হাত দু'টো কাঁপছে মেয়েটার, কি জানি, কতটুকু খয়ের দেবে, কতটা সুপুরি আর কতখানি চূণ।

পান খেয়ে খুশি সকলে। বোঁটায় করে চূণ তুলে জিভে ছোঁয়ালেন।

—গান শুনবেন না? মাসিমা জিজ্ঞাসা করলেন।

পরম আলস্যে হাই তুলে একজন বললেন, ন্‌নাঃ, আমাদের সংসারে ওসবের বেশি চলন নেই তো। দু' একখানা কীর্তন, তা বোষ্টুমীরা সকালে এসে শুনিয়ে যায়।

আরেকজন বললেন, মেয়ে আমাদের দিব্যি পছন্দ হয়েছে। ডাগর

হয়েছে, অথচ বয়স হয়নি, এই তো ভালো। চারুর পিঠ থেকে কাপড় সরিয়ে দিয়ে বললেন, তা হাতে গায়ে বেশ ভারি-ভারিও আছে। এর ওপর খান কয়েক সোনার গহনা পরলে মাকে আমার যা মানাবে। কী-কী গহনা দেবেন আপনারা। হাতের, গলার, কানের—যা যা চলন আছে সব দেবেন তো।

মা কোন জবাব দিলেন না, মাসিমাকে ইশারায় কী বললেন। মাসিমা বললেন, সব কি আর দিতে পারবো, ইচ্ছে থাকলেও সামর্থ্য কই আমাদের। দিদির নিজের যা আছে তাই ভেঙেই দেওয়া হবে—

মা বলে উঠলেন,—বাঃ, আমার বৌয়ের জন্যে রাখব না?

—বৌ? আপনার আবার বৌ কে?

—খোকার বৌ হবে না?

এতক্ষণে বোঝা গেল, মা শুভাশীষের কথা বলছেন। শুভাশীষ চৌকাটের কাছে দাঁড়িয়েছিল, ছুটে গিয়ে বসল পড়ার টেবিলে।

আগন্তুক মহিলাদের একজন বললেন, ওসব কথা থাক, কী কী দেবেন, তাই বলুন।

মাসিমা হুঁশিয়ার লোক, ধরা দিলেন না। আপনাদের কী কী চাই তার ফর্দ দিন? আমরা পরে যা হয় জানাবো।

তাই ঠীক হ'ল শেষ পর্যন্ত। বেলা গড়িয়ে এসেছিল। ওঁরা বিদায় নিলেন।

এমনি আরো কতজন যে দেখে গেল চারুকে তার হিসাব নেই। আসে, পান খায়, মিষ্টি খায়; গান শোনে, হাতের লেখা নেয়। পছন্দ হলে কৌশলে পাওনার কথা তোলে। নগদ কত, যাতায়াতের খরচাই বা কত। বরযাত্রী কতজন। মাতৃপ্রণামীর হিসাব দিন। গহনার কথা তো আছেই।

অনেক রাত অবধি তেল পুড়িয়ে দাদু, মা, আর মাসিমা হিসাব

করেন। নগদ বলতে আছে তো পোষ্ট-অফিসের সেভিংস ব্যাঙ্কে জমানো কয়েক-শো। জমি-জমাও বলবার মত কিছু নেই। আর মার যা গহনা আছে, ভাগাভাগি করলে তাতে কুলাবে না। তবে?

মাসিমা হঠাৎ এক সময় বলে ওঠেন, তুমি সব ঠিক করো বাবা, আমার দু'চারখানা যা আছে তাও দেবো।

মাসিমা নিজের গহনার কথা বলছেন। দাদু চশমা খুলে আস্তে আস্তে রেখে দিলেন। সব খুইয়ে এই মেয়েটি তাঁর কাছে ফিরে এসেছে, সম্বলের মধ্যে তো ওই ক'খানাই।

—কী হবে বাবা ওসব দিয়ে, আমি তো কখনো আর পরব না।

না, পরবে না ঠিক। হারিকেনের আলোয় মেয়ের নিরাভরণ শুভ্র হাত দু'টির দিকে তাকিয়ে দাদু নিশ্বাস ফেললেন। বৈধব্যের কৃচ্ছ্রতার এক আশ্চর্য রূপ তিনি দেখেছেন এই মেয়েটির মধ্যে। তপস্যার পাণ্ডুর শুচিতা। একগাছি রুলিও হাতে রাখেনি, এক বেলা হবিষ্যান্নের অতিরিক্ত কিছু কখনও গ্রহণ করেনি। কিছুদিনের ছুটি নিয়ে যেন শ্বশুর-বাড়ি গিয়েছিল, ফিরে এসে সমস্ত সংসারটার ভার মাথায় তুলে নিয়েছে।

—দিস, তবে তাই দিস। দাদু হারিকেনের আলোটা কমিয়ে দিয়ে বললেন। মা আর মাসিমা শুতে আসছেন। ভালো করে গায়ে লেপ টেনে নিল শুভাশীষ। ওদিকে চারুও নিশ্বাস বন্ধ করে আছে।

আস্তে আস্তে চারুও কেমন নিবে আসছে। বুঝে নিয়েছে ওকে নিয়েই সকলের এখন ভাবনা, চোখে কালি। কত লোক তো আসছে, বারে বারে দেখে যাচ্ছে, এর যে কোন একটা সম্বন্ধ কি ঠিক হয়ে যেতে পারে না? মনে মনে প্রার্থনা করে চারু, হে ভগবান, যেমন হোক তেমন হোক তুমি আমাকে একটা বিয়ে দিয়ে দাও। দাদুকে টাকা জোগাড় করে দাও। আর—

আর কী। কেমন ঘর, কেমন বর জানবার প্রয়োজন নেই চারুর।

মোটামুটি হলেই হ'ল। মা যেমন বলেন, খেয়ে পরে সুখে থাকলেই হ'ল। রাজপুত্রের মত বর চাই না, শিবের মত স্বামীও না।

দুটি সম্বন্ধ শেষ পর্যন্ত টিকলো। এক পাত্র থাকে আসামের ওদিকে, পুলিশে কাজ করে। আরেকজন, শোনা গেল, তিন চারটে পাশ, অবস্থা ভালো, ওকালতি করে জেলা সদরে। দাবি দাওয়াও বেশি নেই।

মাসিমার এই সম্বন্ধই বেশি পছন্দ। লেখা-পড়া জানা ছেলে, এর সঙ্গেই তুমি চেষ্টা করো বাবা।

দাদু একদিন সদরে গিয়ে ছেলেকে দেখেও এলেন। ফিরে এসে বললেন, কী চমৎকার ছেলে, আর কী বিনয়ী। অল্পবয়স, চোখে মুখে যেন বুদ্ধি ফুটে বেরুচ্ছে। ভারি খুশি হয়েছি আলাপ করে।

—সব কথাবার্তা ঠিক করে এসেছ ?

—না, একেবারে সব ঠিক হয়নি। ভালো কথা, ছেলেটি শুনলাম নন-কোঅপারেশনের সময় জেলেও গিয়েছিল।

—জেলে গিয়েছিল ? সব আলো যেন হঠাৎ নিবে গেল মার চোখ থেকে। গম্ভীরকণ্ঠে মা বললেন, তবে তো এ বিয়ে হয় না বাবা।

—হয় না ? কেন ?

সেখান থেকে উঠে চলে যেতে যেতে মা বললেন, কেন হয় না, তা তুমি ভালোই জানো বাবা। ভুল মানুষ একবার করে, তুমি দু'বার কোরনা।

দাদু বললেন, কিন্তু এ ছেলেটি এমন চমৎকার—

চমৎকার ? মা একটু হাসলেন শুধু। জেলে যাওয়া চমৎকার ছেলে তো তাঁর না-দেখা নয়।

তুমি ওই পুলিশ ছেলেটির সঙ্গেই সম্বন্ধ পাকা করে ফেল বাবা।

দাদু বিব্রত ভাবে মাথায় হাত বোলাতে লাগলেন। কিন্তু এ ছেলেটির যে অনেক দাবী, নগদে গহনায় প্রায় দু'তিন হাজারের ধাক্কা।

—তা হোক। তুমি ঠিক করো। আমি না হয় আমার সব গহনা দেবো। মা অবিচল, স্থির গলায় বললেন।

লিটারেট কনেষ্টবল হয়ে ঢুকেছিল, এখন ছোট দারোগা হয়েছে। পাত্রের নাম ভুবনমোহন। সেখানেই চারুর বিয়ের কথা স্থির হ'ল। দাদু সেভিংস ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ওঠালেন। পোদ্দারদের কাছ থেকে ধার করলেন কিছু। বাড়িতে স্যাঁকরা এল। পুরোনো গহনা গুলো তার হাতে তুলে দিলেন মা। আধুলি, সিকি, কুঁচ দিয়ে সূক্ষ্ম পাল্লায় ওজন করে নেওয়া হ'ল গহনা। এগুলো নতুন করে গড়া হবে।

বিয়ের তারিখ এগিয়ে এল। আর একমাসও বাকি নেই। আসছে অমাবস্যার পরে যে পূর্ণিমা তারপরে যে সপ্তমী, সেই তিথি।

লাল লাল কাগজে বিয়ের চিঠি ছাপা হয়ে এল।...'শ্রীমান ভুবনমোহন বাবাজীবনের সহিত মদীয় কন্যা কল্যাণীয়া চারুর...'

কে নিমন্ত্রণ কর্তা? দেবাশীষ। চিঠির নিচে দেবাশীষের নাম দিতেই হয়েছে। পিতা বর্তমানে অন্য কারুর নামে নিমন্ত্রণ চিঠি ছাপানো ভালো দেখায় না।

মাসিমা বসেছেন পিঁড়ি চিত্র করতে। বড়টায় বসবে বর, ছোটটায় কনে। খড়িমাটির ওপরে দুধে আলতায় গোলানো রঙ্-এ মাসিমা কী বড় পদ্মফুল এঁকেছেন দেখ। আর চারপাশে কালো-কালো এগুলো কী। ভ্রমর বুঝি। ও চারু কোথায় গেলি। দেখ'সে, পছন্দ হয়?

চারু পালিয়েছে ঘরের ভেতর। ছুটোছুটির স্বভাবটা একেবারে গেছে চারুর। চুপ করে বসে থাকে। বোনে না, ছুঁচ সুতো নিয়ে বসে। পড়ে না, বইয়ের পাতা ওলটায়। একটু যেন রোগা হয়েছে চারু, কিন্তু আরো সুন্দর হয়েছে। চোখের পাতা এখন আর নাচেনা, কাঁপে। আর সেই চোখ দুটি ঘিরে বিষণ্ণকরুণ ছায়া ঘনানো।

তবে বুঝি চারুর এ সম্বন্ধ পছন্দ হয়নি। নাকি পছন্দ হলেও এমনি

শান্ত, স্থির হয়ে যেত চারু। জীবনের একটা পর্ব শেষ হয়ে এসেছে, বুঝতে পেরেছে। আবার নতুন করে শুরু করতে হবে, আরেক জায়গায়। নতুন জন্মের মত মা-মাসিমা-দাদু-খোকাকে নিয়ে যে পরিবেশ, তা পড়ে থাকবে। চারু পর হয়ে যাবে।

কে-কে আসবে বিয়েয়। তাই এখন ঠিক হচ্ছে। খবর দেওয়া হবে সবাইকে, তাই বলে বেশি লোককে খরচ দিয়ে আনা হবে না। আসবে ছোট মাসি সুরমা; মাসিমার দেওর নিরঞ্জন কাকা; সম্পর্কে কাকা-মামা এমন জনকয়েক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ও আসবেন।

আর? লিষ্টি থেকে কলম তুলে দাদু জিজ্ঞাসা করলেন, আর কে?

মাসিমা আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলেন, জামাইবাবু আসবেন না?

ওঃ, দেবাশীষ। দাদু কলম নামিয়ে বিমূঢ় চোখে তাকালেন মেয়ের দিকে: আশ্চর্য, সবচেয়ে প্রধান, সবচেয়ে প্রথম নামটাই এতক্ষণ মনে পড়েনি। তাই তো। তিনি কি এতক্ষণ তবে শিবহীন যজ্ঞের ফর্দ তৈরি করছিলেন।—কিন্তু দেবাশীষ কোথায় জানি না যে। খবর দিই কী করে।

—তাই বলে মেয়ের বিয়েয় বাপ আসবে না? মাসিমা অধীর গলায়, প্রায় জোরগলায় বলে উঠলেন।

দাদু এদিক ওদিক তাকালেন। চুপ, চুপ, বিভা শুনতে পাবে।

—আমি ওসব জানিনা বাবা, মাসিমা বললেন, চেষ্টা করলে কি খোঁজ পাওয়া যায় না। তুমি খবর দাও।

—বেশ, দাদু বললেন, কিন্তু খবর দিলেই সে কি আসবে। এখানে সে ফিরবে কি করে।

বিয়ের দু'তিন দিন আগে থাকতে সব একে একে এসে পড়তে লাগলেন। শুভাশীষের ফুরসৎ নেই। নতুন নতুন জামা-কাপড় শুধু

দিদির জন্যেই আসেনি, তারও কিছু কিছু হয়েছে। গাড়ির সময় হলে ষ্টেশনে যাচ্ছে। চেনা, আধচেনা, না-চেনা, নাম-শোনা আত্মীয়দের নিয়ে আসছে।

ছোট মাসি এবারে এসেছে কোলে একটা বাচ্চা নিয়ে। মেসোমশাই আসেননি, বিয়ের দিনে পারলে আসবেন। নিরঞ্জন কাকাও এসেছেন। তেমনি হাসি খুসি, কৌতুকময়। বাচ্চা কোলে নিয়ে ছোট মাসি বসে-ছিল, ঝপ করে ক্যামেরায় একটা ছবি তুলে নিলেন। শুভাশীষের জন্তেও ছোট একটা ক্যামেরা এনেছেন নিরঞ্জন কাকা।

উঠান তেরপল দিয়ে ছাওয়া হ'ল। বরযাত্রীরা আসবে সকালের গাড়িতে। বরের জন্তে পাল্কি যাবে ষ্টেশনে।

অনেক রাত অবধি সেদিন হাসি তামাসা গল্প গুজব চলল। কারুর ঘুম আসে না। বারান্দায় একটা হ্যাজাক আলো জ্বলছে। কে বলবে এই কিছুদিন আগে একটা কঠিন আঘাতে এবাড়ির সব আলো নিভে গিয়েছিল।

শেষ রাতে অধিবাস। চারুকে ডেকে তোলা হ'ল। জ্বালা হ'ল প্রদীপ। চারুর চোখে তখনো ঘুমের ঘোর, যন্ত্রচালিতের মতো এক একটা অনুষ্ঠান শেষ হ'ল। ভোর রাতে আবার সবাই গেল ষ্টেশনে। কোথায় বর।

এই তো। সবাই নেমেছে। বর, বরকর্তা, বরযাত্রী, অনুচর, সব। ভিড়ের সঙ্গে মিশে শুভাশীষ একদৃষ্টে লক্ষ্য করতে লাগল বরকে। কী অসাধারণ শক্তিমান মনে হচ্ছে লোকটাকে, কী চওড়া বুকের ছাতি। গোঁফের বাহার দেখ, টুথ ব্রাশের মতো পুরু, সমান করে ছাঁটা।

এই লোকটাই কি চারুর বর হবে। নিয়ে যাবে চারুকে। বাবা যেমন করে সরমাদিকে নিয়ে গেছেন তেমন করে নয়,—এ নিয়ে যাবে সবার সমুখ দিয়ে মাথা উঁচু করে, শাঁখ বাজবে মেয়েরা উলু দেবে।

বরযাত্রীদের সঙ্গে পাহারাদার একজন এসেছে, তার কাঁধে একটা বন্দুক। বন্দুক নিয়ে বিয়ে করতে এসেছে এ আবার কেমনতরো বর, অনেকে বলাবলি করলে।

—হবে না, পুলিশে কাজ করে যে। একজন বললে। বর যাবে পাল্কিতে, আর সবাই হেঁটে। পাল্কিতে আর কে যাবে। যাবে শুভাশীষ। ওকে সবাই বরের সঙ্গে এক পাল্কিতে তুলে দিলে। শুভদৃষ্টি আগে শালার সঙ্গেই করে নাও হে, পেছন থেকে কে যেন বললে।

পাল্কিতেই ভুবনমোহনের সঙ্গে শুভাশীষের আলাপ হয়েছিল মনে আছে।

—তুমি,—তুমি কনের ভাই?

—আপনি জামাইবাবু?

—এখনও হইনি, হেসে ভুবন বলেছিল, তবে বোধ হয় হবো।

বন্দুকটার কথা শুভাশীষ ভোলেনি, জিজ্ঞাসা করেছিল, আপনি বন্দুক ছুঁড়তে জানেন?

—জানিনা? তবে পুলিশে আছি কী করতে। এটা পাখি শিকারের বন্দুক। খোকা, এদিকে পাখি পাওয়া যায়?

শুভাশীষ উঁকি দিয়ে একবার আকাশের দিকে তাকিয়ে বললে, জানিনা, বোধ হয় যায়।

সারাদিন শুভাশীষ শুধু বরযাত্রীদের খবরদারি করেই কাটালে। চা চাই? পান? সিগারেট? বরের এক বন্ধু একবার শুধু বললে, কিছু চাইনা খোকা, শুধু একটি জিনিষ চাই। তুমি কনেকে একটিবার আগে থেকে দেখিয়ে দাও।

শুভাশীষ ছুটে পালাল সেখান থেকে। পাড়ার মেয়েরা মিলে চারুকে সাজাতে সুরু করেছে বিকেল থেকে। সেখানেও শুভাশীষ ঘুরে এসেছে। লাল চেলি, সারা কপালে চন্দনের টিপ, এত সুন্দর তার দিদি? অনেকক্ষণ

একদৃষ্টে চেয়ে থেকে থেকে শুভাশীষের চোখ ছল ছল করে উঠলো। আরেকবার মনে পড়ে গেল, দিদি পর হয়ে যাবে। আজও আছে, কাল এমন সময় দিদি আর এখানে নেই।

বিয়ের পিঁড়ির ওপর বসেও থর থর করে কাঁপছিল চারু, ছোটমাসিমা তাকে গিয়ে ধরলেন। বড় মাসিমা ঘরের ভেতর ছিলেন। শুভাশীষ তাঁকে গিয়ে ধরলো।

—তুমি বিয়ে দেখবে না, মাসিমা ?

—আমি ? বড়মাসিমা একটু হেসে বললেন, আমাকে এসব শুভ কাজে সামনে বেরুতে নেই।

এই বিয়ের ব্যাপারে উদয়াস্ত পরিশ্রম করেছেন মাসিমা, আড়াল থেকে সব কিছু জুগিয়েছেন, তাঁকে সামনে বেরুতে নেই ? সমস্ত ব্যাপারটাই বড়ো অশোভন মনে হ'ল শুভাশীষের ; মাসিমাকে বাদ দিয়ে এই মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের কোন মানে বুঝি হয় না।

আর, কোন কিছুর মধ্যে নেই মা। তিনিও ঘরের ভেতর এক কোণে বসে চোখের জল মুছছেন। মাসিমা যতো বলেন, চুপ করো, আজকের দিনে চোখের জল ফেলতে নেই, মা তত কাঁদেন, আঁচল দিয়ে চোখ ঢেকে ফেলেন।

শুভাশীষ জানে, এ কান্না কেন। চারু চলে যাবে তাই মা কাঁদছেন। কেউ চলে গেলেই মা কাঁদেন। কেঁদেছেন বাবা চলে যাবার পরে, আজ কাঁদছেন, চারু যাবার প্রাকমুহূর্তটিতে। অকস্মাৎ শুভাশীষের মনে হ'ল, মা কাউকে ছাড়তে চান না, বেঁধে রাখতে চান নিজের চার পাশে, একান্ত ভাবে ধরে রাখতে চান আঁচলের ছায়ায়। চান অথচ পারেন না, অক্ষমতার লজ্জায় মা কাঁদছেন।

সব অনুষ্ঠান কখন শেষ হয়েছে, শুভাশীষ জানে না। বাসরে যখন

হাসাহাসি চলছে, তখন তারই এক কোনে ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ কী একটা গোলমালে ঘুম ভেঙে দেখল, সে মার ঘরে বিছানার ওপর। খাটের ওপর বসে আছেন মা, আর তার কোলের ওপর মুখ গুঁজে চারু। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে, লাল চেলির শ্লথ আঁচল মেজেয় লুটিয়ে পড়েছে।

—কেন এরকম কথা বলবে মা, ও কেন বলবে।

মা কোন কথা বলছেন না, চারুর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। মার চোখেও জল।

স্পষ্ট করে শুভাশীষ সেদিন কিছু বোঝেনি, বুঝেছিল অনেক পরে।

বাসরে হাসাহাসির মধ্যেই বর বুঝি পাখি শিকারের কথা তুলেছিল। বন্দুক বয়ে এনেছে, কাজে তো লাগাবে।

—পাখি পাওয়া যায়, এখানে?

—যায়। কী করবেন?

—শিকার।

—একটি পাখি তো শিকার করেছেনই। আরো চাই? কত পাখি শিকার করেছেন এ পর্যন্ত?

রোমশ হাত দুটি প্রসারিত করে বর বলেছে, ঢের।

—শুধু পাখি মেরেছেন। মানুষ মারেন নি?

গোঁফে একবার হাত বুলিয়ে বর বলেছে, তাও মেরেছি। তারপর ফেঁদেছে গল্প। পুলিশের দারোগা। কত লোককে ডেকে চাবকেছে থানায়। কত দুধর্ষ ডাকাতের সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি। চা বাগানের কুলিদের একবার লাঠি পেটা করে ঠাণ্ডা করেছিল, সেই গল্প।

বলতে বলতে উৎসাহ এসেছিল, বর বলেছিল, আরো কত কিছু করেছি। স্বদেশীওয়ালা শালাদের—

কী করেছে স্বদেশীওয়ালাদের এই পুলিশের দারোগা? মীটিং ভাঙতে

লাঠি চালিয়েছে প্রথম। তবু হঠে না, হাড় পাঁজর ভাঙে, কিছু লোক পালায়, কিন্তু অনেকেই শুয়ে পড়ে, বলে বন্দেমাতরম্।

—তখনো বলে বন্দেমাতরম্? একটি মেয়ে জিজ্ঞাসা করে।

তবে আর বলছি কেন। হাড়জিরজির ওই শরীরে সব দেশ স্বাধীন করবেন। তারপর শুনুন, লাঠি চার্জ করে'ছি। বুট জুতো দিয়ে ঠোক্কর মেরেছি, এমন কি ওরা হাঁপাচ্ছে যখন, তখন হাঁ-করা মুখে থুথু ফেলেছি, —তবু ব্যাটাদের জেদ যায় না। স্বদেশীওয়ালা শালাদের কাণ্ড—

বলতে বলতে বর বুঝি একটু হাসতে গিয়েছিল, কিন্তু হঠাৎ তার হাসি থেমে গেছে। চারু কখন উঠে পড়েছে আসর থেকে, কোন দিকে না তাকিয়ে সোজা চলে এসেছে মার ঘরে। মার কোলে মুখ লুকিয়ে কেঁদেছে।

স্তম্ভিত মুখে দাদু, মাসিমা, অন্যান্য সব আত্মীয়রাও পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন মনে আছে। কী ব্যাপার। বিয়ের আসর থেকে বর উঠে যায় শোনা গেছে কখনও কখনও, কনে পালালো কেন বাসর থেকে!

সেদিনকার ঘটনাটা পরে ভেবেছে শুভাশীষ। সবটাই বিস্ময়কর সন্দেহ নেই। কিন্তু সব চেয়ে তার আশ্চর্য লাগে এই কথা ভেবে যে সেদিন মার চোখেও জল দেখেছিল।

স্বদেশীওয়ালাদের অভদ্র ভাষায় গাল দিয়েছে ভুবনমোহন, কিন্তু মা কেন চোখের জল ফেলবেন সেজন্যে। স্বদেশীওয়ালাদের বিরুদ্ধে তো মার নিজেরও কম নালিশ জমা নেই।

সবাই মিলে চারুকে বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করলেন। বড়মাসিমা ওকে আবার পৌঁছে দিয়ে এলেন বাসরে।

পরদিন সকালে, তখনো বাসি বিয়ের আয়োজন হয়নি, ডাকে চিঠি এলো একখানা। দাদু খামের ঠিকানা দেখে বললেন, তোর চিঠি, বিভা।

চিঠিটা হাতে নিয়ে ঠিকানা পড়ে হাত থর্‌থর করে কেঁপে উঠলো। মুখের রং বদলাতে লাগল নিমেষে নিমেষে।

—ওর কী সাহস বাবা; আমাকে আবার চিঠি লেখে? রুদ্ধশ্বাসে মা বললেন। খামখানা হাতের কঠিন মুঠিতে দুমড়ে যেতে লাগল।

বিপন্ন, বিভ্রান্ত মুখে দাদু চেয়ে রইলেন। 'দেবাশীষের চিঠি?' জিজ্ঞাসা করলেন আস্তে আস্তে।

এগারো

প্রথমে বিমূঢ়, তারপর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কপালের সব কটি রেখা কুঞ্চিত হয়ে গিয়েছিল দেবাশীষের। এ যে সরমা, তাতে ভুল নেই। কিন্তু রাত্রের ট্রেনে একলা কোথায় চলেছে সরমা।

একটু সরে জায়গা করে দিয়ে সরমা বললে, বসুন জামাইবাবু। যন্ত্রচালিতের মত দেবাশীষ বসল। শুধু শুধু বসে থাকা অশোভন, একটা কিছু বলে এই নিশির ডাকের নিঃশব্দ চলাকে যতিচিহ্নিত করতে হয়, কিন্তু কী সেই কথা দেবাশীষ ভাবতে পারলনা। চাকা আর লাইনের অবিরাম সংঘর্ষের বিচিত্র একটানা আওয়াজে সব চিন্তা টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। ট্রেনের কামরার নিষ্প্রভ আলোর দ্যুতি পড়েছে বাইরের খোয়া আর পাথরে। প্রান্তরের এক একটা তালখেজুর গাছ অনেকক্ষণ গাড়ির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটে শেষে হার মেনে পিছিয়ে পড়ছে।

পিছিয়ে তো পড়েছে আরো কতজনে। প্রথম জীবনে যারা তার সঙ্গে দেশ সেবায়, সভাসমিতি আর বক্তৃতা শেষের করতালির সমারোহে যোগ দিয়েছিল, তাদের অনেকেই শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারেনি, দমননীতির ভ্রূকুটিমাত্রেই পিছিয়ে পড়েছে। সেই সাবধানী পথিকদের অনেকেই আজ সংসারী। সুখী? নিরুদ্বেগ পর্যাপ্তির মধ্যে আকণ্ঠমগ্ন জীবন যাপনের পরিতৃপ্তিরই অপর নাম যদি সুখ হয়, তবে তারা সুখীও।

এখনও তাদের কারুর কারুর সঙ্গে দেখা হয়। নিষ্প্রাণ রেখাহীন মুখ, তারা ক্লিষ্ট হাসি হাসে। আরো একদল ছিল, তারা ভীড় জমিয়েছিল প্রতিপত্তির লোভে। দেশের নামে তারা মিউনিসিপালিটি, জেলা-বোর্ড, কাউন্‌সিল ইত্যাদি হাত করেছে। দেখা হলে তারাও হাসে। ঈষৎ করুণায়, ঈষৎ মেদস্ফীত হাসি।

বিয়ে করেছিল। একবার জেল থেকে বেরিয়ে দ্বিতীয়বার জেলে যাবার মধ্যবর্তী গর্ভাঙ্কে কোন এক আত্মীয়ের পরামর্শে বিয়ের প্রস্তাবে সম্মতি দিল। ক্ষণিকের দুর্বলতা হয়ত, হয়ত বা ক্লান্তি। সেই অবসাদে আর মোহে জড়ান ক'টা দিন কাটল মন্দ না। কিন্তু তার পরেই আবার ছুটের নেশা লাগল। বিভা ছুটতে পারল না পিছিয়ে পড়ল। মাঝে মাঝে পিছন ফিরে তাকিয়েছে দেবাশীষ, লোহার ফটকের ভেতর দিয়ে ঢুকেছে যখন, খোলা আকাশ আর করুণ একখানা বিষণ্ণ মুখ পেছনে পড়ে থেকেছে। মনে সংশয় এসেছে। ছুটতে চেয়েছিল, কিন্তু এর নামই কি ছোটা। কোন মোহ রাখবে না, এই যদি পণ, তবে কিসের মোহে বারবার এমন করে ঝাঁপ দেয়। ছুটতে গিয়ে নিজেকে ঘিরে ফেলে উঁচু প্রাচীর। আজ কিসের প্রেরণায় সব টুটিয়ে ছুটে এল। এ-ও কি মোহ নয়। দেশসেবার মোহ।

—কী ভাবছেন, জামাইবাবু।

সরমার কথায় চমক ভাঙল। বাইরে থেকে কনকনে হাওয়া আর কয়লার গুঁড়ো আসছিল, দেবাশীষ জানালা তুলে দিতে গেল।

—জানালা বন্ধ করছেন যে।

—বড্ডো কয়লা আসছে, কালি লাগবে।

—কালি? সরমা একটু হাসল। কালি লাগতে কি আর বাকি আছে জামাইবাবু।

দেবাশীষ সোজা হয়ে বসল। তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি সরমা। তুমি কাউকে না বলে যাচ্ছনা তো ?

—কাউকে না। কী সর্বনাশা দুষ্টুমির হাসিই খেলে গেল সরমার মুখে। শুধু আপনিই জানলেন।

দেবাশীষ স্তব্ধ হয়ে গেল, কিছু বললে না। নিজের ভাবনাই যথেষ্ট, এর ওপর আরেকজনের ভাবনা জুটিয়ে কাজ নেই।

গাড়ি শেয়ালদায় পৌঁছল যখন, তখনো গা থেকে অন্ধকারের লেপ সরিয়ে দিন হাই তোলেনি। নিজের ক্যাম্বিসের ব্যাগটা ঠিক করে নিয়ে দেবাশীষ প্লাটফর্মে নেমে দু'এক পা অন্যমনস্ক ভাবে এগিয়ে গেল। তারপর কী খেয়াল হতে দাঁড়িয়ে পড়ল। জানালা দিয়ে ভেতরে মুখ বাড়িয়ে বলল, তোমাকে নিতে কি কেউ ষ্টেশনে এসেছেন, সরমা।

সরমাও নেমে পড়েছে। কই, কাউকে তো দেখছি না। কে আসবে আবার। কেউ তো জানে না।

—তবে ? দেবাশীষের চিন্তিত মুখ থেকে একটি মাত্র কথা বেরুল : তবে ?

—তবে কী ?

—কী করবে এবার, কোথায় যাবে ?

—ব্লাউসের ভেতর থেকে এক টুকরো কাগজ বার করে সরমা বললে, এই ঠিকানা, জয়রাম সাহা লেন। আমার দাদার বাসা। আমি নিজেই চিনে যেতে পারব। আপনি শুধু একটা গাড়ি ঠিক করে দিন।

টিকিট দেখিয়ে বাইরে এসে সরমা কিন্তু একটু হকচকিয়ে গেল। ক'লকাতা বড় শহর, জানত। বইয়ের পাতায় ছবি দেখেছে হাওড়ার পুল, আর মনুমেণ্ট। কিন্তু এত বড়। বৃহত্ব সম্বন্ধে ওর মনের অতি দূরগামী কল্পনার সঙ্গেও সে কলকাতার এই ছবি মেলাতে পারল না।

দেবাশীষ সরমার মনের কথা বুঝে নিয়েছিল। বললে,—চল, তোমাকে আমি রেখে আসি। বাসাটা কোন অঞ্চলে, জান কিছু।

—শুনেছিলাম, শ্যামবাজার।

তারপর সারা সকাল ধরে ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ানটা কত যে ঘুরলে, হিসাব নেই। বড় রাস্তা থেকে গলি, গলি থেকে ফের বড় রাস্তায়, কিন্তু খোঁজ পাওয়া গেল না,—না বাসার, না গলির। গাড়োয়ানটা চাবুক লাগাল হাওয়ায়, বারবার অশ্রাব্য কটূক্তি করলে,—ঘোড়া দু'টিকে না আরোহী দুজনকে, বোঝা গেল না।

শেষে খোঁজ পাওয়া গেল টালার পুলের কাছাকাছি এসে। ঠিকানা শুনে রাস্তার এক ভদ্রলোক ভ্রূকুঞ্চিত করলেন। জয়রাম সাহা লেন? সে তো আর নেই মশাই?

নেই? গলিটাই নেই? সেকি?

সে ইম্প্রুভ্‌মেণ্ট ট্রাস্ট কবে ভেঙে মাঠ করে দিয়েছে। একশো ফুট চওড়া রাস্তা বেরুচ্ছে, সব প্লটের দাম আগুন।

আর আগে যারা ছিল?

তারা সব কে কোথায়, উড়ে গেছে, তার কী ঠিক আছে। গাছ ভাঙলে পাখী কি আর বাসায় থাকে।

এবার? সরমা জিজ্ঞাসা করল।

প্রশ্নটারই প্রতিধ্বনি ছাড়া আর কিছু করতে পারল না দেবাশীষ।

দেবাশীষ অল্প অল্প ঘেমেছিল, তার কতটা সারা সকালের পথশ্রমে, কতটা অপ্রত্যাশিত দায়িত্ব অকস্মাৎ ঘাড়ে এসে পড়ার বিমূঢ়তায়, তার হিসাব সেই। তাকিয়ে দেখল, সরমা তখনও হাসছে মিটি মিটি। যেমন অস্বস্তি বোধ করল দেবাশীষ, তেমনি চটে গেল। এই মেয়েটা কাউকে না বলে দড়ি ছিঁড়ে চলে এসেছে বেপরোয়া খেয়ালের হাওয়ায়, আরেকটি বন্দরের ঠিকানা না নিয়েই। এখন যে মাঝগাঙে ডুবতে বসেছে, তাতেও

যদি বিন্দুমাত্র হুঁস বা লজ্জা হয়। কি রকম হাসছে দেখ, তখন থেকে, একটুও যদি ঘাবড়ে গিয়ে থাকে।

আমার জন্যে এত ভাবছেন কেন, সরমা বললে, আপনি কোথায় উঠবেন ?

—আমি ? আমি তো ভেবেছিলুম, আগেকার চেনা কোন একটা মেসে—

—বেশ তো, নিশ্চিন্ত গলায় সরমা বললে, আমাকেও সেখানে নিয়ে চলুন না।

এই মেয়েটিকে নিয়ে আর পারে না দেবাশীষ। এ কাজ করে যেমন না ভেবে, কথাও যে তেমনি না ভেবে বলবে এ আর আশ্চর্য কী। দেবাশীষের মনে বিরক্তির সঙ্গে কখন যে একটু কৌতুকবোধও জড়িয়ে গিয়েছিল, সে নিজেও খেয়াল করেনি। বললে, তা হলে তো তোমাকে ধুতি পাঞ্জাবি পরিয়ে নিতে হয়। কেননা, আমি যে মেসে থাকতাম, সেখানে মেয়েদের প্রবেশ নিষেধ।

সরমা বললে, এতটা পেরেছি আর এটুকু পারব না মনে করেছেন। আমি পোষাক বদলাতে পারি না ? শাড়ি ছেড়ে ধুতি তো পরছিই, সেটা না হয় পুরুষের প্যাটার্ণে পরে নিলেই হবে। আর এই চুলগুলোর কথা ভাবছেন তো ? তা এগুলো না হয়—

সর্বনাশ। আধচেনা এক শহরের রাজপথে দাঁড়িয়ে অবেলায় রসিকতা করে, এ মেয়েটিকে দেবাশীষ সামলায় কী করে। আর বেশীক্ষণ এখানে দাঁড়ানও শোভন নয়। ইতিমধ্যে কৌতূহলী জোড়া জোড়া চোখ এদিকে দাঁড়িয়ে পড়ছে। টেরচা চাউনি এসে বিঁধছে গায়ে। কিছু না ভেবেই দেবাশীষ একটা রিকসা ডাকলে। সরমাকে উঠিয়ে নিয়ে মির্জাপুর অঞ্চলের একটা ঠিকানা বললে। চিরঞ্জীবদার বহুকালের আস্তানা। একসঙ্গে কিছুকাল রাজসাহী সেণ্ট্রাল জেলে ছিল। চিরঞ্জীবদা বদলাতে

পারেন, কিন্তু তাঁর আস্তানা বদলাবে না, দেবাশীষের এ ধারণাটা কেমন যেন বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল।

পটলডাঙ্গার গলি চিনে নিতে ভুল হ'লনা। সেই জানালাহীন বোবা-বোবা বাড়ির সারি। চূণচটা দেয়াল আর দুর্গন্ধ। আঠারো শতকের ফিউড্যালি স্থাপত্যের লুপ্তাবশেষ। এখন পায়রার খোপের মত টুকরো করে ভাঁড়া দেওয়া হয়েছে।

চিরঞ্জীবদার বাসার কড়া ধরে নাড়তে বহু পরিচিত ভৃত্য শশধর বেরিয়ে এল; সহাস্যে বললে, আসুন বাবু। সরমাকে দেখিয়ে বললে, দিদিমণি ?

দেবাশীষ বললে, আমার বোন। এঁকে ভেতরে নিয়ে যাও। আর আমাকে বাইরের ঘরখানায় একটু বসতে দাও। বাবু কখন ফিরবেন ?

বাবু? বাবু তো ক'লকাতায় নেই। মফস্বলে বেরিয়ে গেছে। কাল পরশু ফেরবার কথা। তা আপনি থাকুন না, কোন অসুবিধে হবে না।

কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিয়ে দেবাশীষ ভেতরে গিয়ে দেখল, সরমা স্নানের ঘরের দিকে যাচ্ছে। এতক্ষণ কী করল তবে ?

—বাঃরে, রান্নার ব্যবস্থা করলুম না, শশধর আর আমি দু'জনে মিলে!

—আর তোমার রান্না ?

—আমার আবার আলাদা রান্না কী। সব একসঙ্গে। পথে নিয়ম মানতে নেই, বলে সরমা একটু হাসল। আপনি বসুন একটু, আমি মাথায় দু'ঘটি ঢেলে আসি।

বাইরের উঠোনেও একটা কল, চৌবাচ্চা ছিল, দেবাশীষ সেখানেই স্নান করলে। তোয়ালে দিয়ে গা মুছছে, এমন সময় সরমা বেরিয়ে এল। সারা পিঠে ভিজে চুল ঢেকে দিয়েছে, চোখের পাতায় আর কর্ণমূলে এখনও দু'এক ফোঁটা জল চিক চিক করছে। আর পরণে—একী!

সবুজ রঙের স্নিগ্ধ একটা শাড়ি পরেছে সরমা। পাড়টা গাঢ় লাল। দেবাশীষ উঠে আসতেই প্রণাম করে বলল, আজ থেকে আমার নতুন জন্ম জামাইবাবু। অবাক হচ্ছেন? জোর করে চাপান শাদা শাড়িটা ছাড়ি-ছাড়ি করে এতদিন ছাড়তে পারছিলুম না, আজ বিদেশে এসেই সেটা খসিয়ে দিলুম।

খাওয়ার পরে একটা রেকাবে পান নিয়ে এল সরমা। নিজেও একটা খেয়েছে, দেবাশীষ লক্ষ্য করল। পশ্চিমের জানালা দিয়ে ইতিমধ্যেই একটুকরো রোদ এসে পড়েছিল দেবাশীষের মুখে। সরমা সেটা গিয়ে বন্ধ করে দিল। একটি মাত্র জানালা। আধো অন্ধকারে সরমার মুখখানা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল না। শুধু কণ্ঠস্বর শুনতে পেল,—এখন কি বিশ্রাম করবেন?

—হ্যাঁ, করি একটু। তুমিও জিরিয়ে নাও।

বাইরে থেকে সরমা হাসল একটু। যাবার আগে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে গেল। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল দেবাশীষ। হুকে লাগান পাঞ্জাবিটা পরে নিল চট করে। তারপর নিঃশব্দে পা টিপে টিপে বেরিয়ে এল।

রাস্তায় এসে দেবাশীষ কতকটা যেন স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করল। এখানে আর হৃৎপিণ্ডটা ধক ধক করে না, বন্ধঘরে টুক টুকে ঠোঁটের ওপর দুটি চোখ জ্বলছে না। আপন মনেই দেবাশীষ একটু হাসল। কাল যখন রাত্রে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল, ভেবেছিল, সব মায়ার ডোর ছিন্ন করে নিরুদ্দেশে ভাসল। আর কেউ আমাকে বাঁধতে পারবে না। অলক্ষ্যে তখন কি কেউ হেসেছিল? কে জানত এক বাঁধন ছিঁড়তে না ছিঁড়তেই আরেকটায় জড়িয়ে পড়বে।

পরিচিত আড্ডা যে ক'টি ছিল, সব ঘুরল। দূর থেকে বুঝতে পারেনি, কলকাতা এসে দেখল রাজনৈতিক হাওয়া গরম। আরেকটি আসন্ন

সংগ্রামের আভাস এখনই যেন কিছু পাওয়া যায়। চিরঞ্জীবদা যেমন, তেমনি আরো বহু কর্মী বেরিয়ে পড়েছেন এখানে ওখানে ছিন্নসূত্রগুলি পুনঃ সংযোজনের দায়িত্ব নিয়ে। এখনই সংগ্রাম নয়, এখন শুধু সংগঠন। দেবাশীষকে পেয়ে পুরনো সহকর্মীরা খুশি হ'ল। তৈরি থেক। তোমাকেও কাজে নামতে হবে।

তৈরি? দেবাশীষ তৈরি আছেই। যে অবসাদ মনের কোণে একটু একটু করে জমে উঠেছিল, তা নিমেষে দূর হয়ে গেছে। এরা আদর্শবাদীর দল। কাজ চায়, আপোষ চায় না। কাউন্সিল আর মিউনিসিপাল রাজনীতিতে অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে। চোং যদি মুখে নিতেই হয়, তবে তাতে সংগ্রামের আহ্বানই প্রতিধ্বনিত হোক। এর-ওর হয়ে ভোটভিক্ষা নয়।

বাসায় ফিরতে ফিরতে অনেক রাত হ'ল। দরজায় টোকা দিতেই খুলে গেল। দেবাশীষের মন ইতিমধ্যেই হালকা হয়ে গিয়েছিল, বললে, শশধর?

—না, আমি সরমা।

—তুমি এখন জেগে আছ? আমার ভাত ঢাকা দিয়ে রাখলেই পারতে?

সরমা কোন জবাব দিল না।

চিরঞ্জীবদার বিছানাতেই আজকের মত তার শোবার ব্যবস্থা হয়েছে। দেবাশীষ সেটা লক্ষ্য করলে, কিন্তু যে প্রশ্নটা বহুক্ষণ যাবৎ মনে এসেছে, সেটা কিছুতেই জিজ্ঞাসা করতে পারলে না।

মশলা নিয়ে এসে সরমা বললে, আপনি তা হলে শুয়ে পড়ুন এবার।

এবার দেবাশীষকে অগত্যা জিজ্ঞাসা করতেই হল, আর তুমি? তুমি কোথায় শোবে?

—আজকের মত রান্নাঘরের এক পাশে। শশধরই সব ব্যবস্থা করে দিয়েছে।

—ও। দেবাশীষ কিছুক্ষণ কী ভাবল। তারপর বলল, তোমার ভয় করবে না?

—কিসের ভয় জামাইবাবু?

—ধর, ভূতের।

কোমরে শক্ত করে আঁচল জড়ান সরমার। বললে, আমরা গাঁয়ের মেয়ে, নিম আর শ্যাওড়া গাছের ছায়ায় মানুষ। গোঁয়ো ভূত আমাদের কিছু করতে পারেনি, শহুরে ভূত কী করবে। আর যদি সত্যিই ভয় করে, তবে আপনাকে এসে ডাকব'খন। খিল দেবেন না।

আলো নিবিয়ে দিয়ে সরমা চলে গেল বটে, কিন্তু দেবাশীষ ঘুমুতে পারল না। অস্বস্তিতে বার বার গলা শুকিয়ে আসে। শিয়রের কাছে রাখা কাঁচের গ্লাসটা নিঃশেষ করেও পিপাসা গেল না। দরজার শিকল হাওয়ায় কাঁপতে দেবাশীষ চমকে ওঠে। সজাগ চোখ দুটি মেলে তাকায়। না, সরমা নয়। খস খস শব্দ হ'ল একবার। না, সরমা আসেনি; টেবিলের একটা কাগজ উড়ে গিয়ে সারা মেজেয় ঘষে ঘষে চলছে। উঠে গিয়ে দেবাশীষ কাগজটা তুলে টেবিলে চাপা দিয়ে রাখল। স্নায়ুর সঙ্গে এ কী প্রাণান্তকর লড়াই। এ কি শুধু ভয়; না কি কিছুটা প্রত্যাশা-ও। দেবাশীষ ভীষণ চমকে উঠল। তার পরক্ষণেই বাইরের দরজা খুলে রাস্তায় এল। আঃ, এখানে তবু আলো আছে, স্নিগ্ধ হাওয়া আছে। এখন এখানে ওখানে দু'একটা পানের দোকানে আলো জ্বলছে। কতক্ষণ উদ্‌ভ্রান্তের মত পথে পথে ঘুরল দেবাশীষ। না, এ ভাবে আর নয়। সে নিজেকে বিশ্বাস করেনা, সরমাকেও না। চিরঞ্জীবদা এলে সরমাকে তাঁর জিম্মা করে দিয়ে দেবাশীষ আবার ভেসে পড়বে। এখন তো কাজের অভাব নেই। কোন স্বার্থ নেই, বাঁধন নেই, মোহ

নেই, যে কোন কাজের ভার নিতে পারবে দেবাশীষ। আর, চিরঞ্জীবদা'কে বলে যাবে, এই মেয়েটি নতুন করে জীবন গড়তে চায়। এর মনের জোর আছে, কিন্তু সে জোর উপচে পড়ে, নিজেকে ধরে রাখতে জানে না। একে আপনাদের কোন একটা কাজে লাগিয়ে দিন।

সারা রাত কেন্দ্রীয় কলকাতা রাষ্ট্রীয় সমিতির আফিসে একটা টুলের ওপর ঘুমিয়ে দেবাশীষ যখন চিরঞ্জীবদার বাসায় ফিরে এল, তখন তার চোখ মুখ লাল, গায়ে, হাতে অল্প অল্প ব্যথা। এসে দেখল বাসা সরগরম। চিরঞ্জীবদা সকালের গাড়ীতে ফিরেছেন, এবং এরই মধ্যে সরমাকে নিয়ে জমিয়ে তুলেছেন।

দেবাশীষকে বললেন, বাঃ, বেশ কাণ্ডজ্ঞান তো তোর। সারা রাত কোথায় ছিলি ?

দেবাশীষ লজ্জিত মুখে বললে, কাজ ছিল একটু কংগ্রেস আফিসে—

চিরঞ্জীবদা বললেন, আমি তো সকালে বাড়ি ফিরে অবাক। অন্য অন্য বার দরজা ভাঙাভাঙি করলে তবে শশধর চন্দ্রের মুখ ভাঙে, আজ টোকা দিতেই, ছিটকিনি খুলে দিয়ে যিনি সামনে এসে দাঁড়ালেন, তাঁকে দেখে—

—সভয়ে পিছিয়ে গেলেন তো ?

—পিছিয়ে যাব কি রে হতভাগা। পুলিশের লাঠি দেখে হটিনি, আর একটা খুকিকে দেখে পিছিয়ে যাব ? কিন্তু তোর আক্কেলটি কী বল্‌তো। আমি যদি পুলিশে খবর দিয়ে দিতুম অনধিকার প্রবেশের নালিশে।

দেবাশীষ হেসে ফেলল। আমি জানি, আপনি পুলিশে খবর দিতেন না। পারতপক্ষে লাল পাগড়ির ছায়া মাড়াবেন না আপনি। পুলিশে আপনাকে খুঁজেছে আর আপনি এড়িয়ে গেছেন, বরাবর তো এই ঘটেছে ?

—এতদিনে এই বুঝলি তুই ? আমি পুলিশকে এড়িয়ে গেছি। তবে ছ'বার জেল খাটলুম কী করে ?

ভেতরে যখন মুখ ধুতে এল দেবাশীষ, সরমা তখন ওর জন্যে বারান্দায় স্টোভ জ্বালিয়ে চা করছে। দেবাশীষকে দেখে উঠে দাঁড়াল সরমা। দ্রুতপায়ে উঠোনে নেমে এল। দেবাশীষের কানের প্রায় কাছাকাছি মুখ নিয়ে চাপা গলায় বলল, কিন্তু আপনি কাল রাতে পালিয়ে গেলেন কেন জামাইবাবু ? আপনি কি সত্যিই ভেবেছিলেন আমার ভূতের ভয় করবে, আর আমি ভেজান দরজা ঠেলে আপনার ঘরে ঢুকব ?

এ কথার কোন জবাব দিলনা দেবাশীষ। মাথা নীচু করে ক্রমাগত ঘাড়ে, গলায়, কানের কাছে ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দিতে লাগল।

চলে যেতে যেতে সরমা ফিস ফিস করে আবার বললে, আরেকজনের ভূতের ভয় করবে ভেবে নিজে ঘুমুতে পারলেন না, শেষ পর্যন্ত দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে গেলেন ? ভয় আপনারো তো বড় কম নয়, জামাইবাবু ?

ভয় কিন্তু দিন দু'য়েকের মধ্যেই উবে গেল। কী এক আশ্চর্য আবহাওয়া আছে চিরঞ্জীবদার বাসায়। এখানে পলকে প্রাণ মন সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে। এ বাড়িতে অহরহ নানা লোকের আনাগোনা। তাদের আতিথ্যের ভার সরমার ওপর। কী অবাক লোক চিরঞ্জীবদা, একবার জানতে চাইলেন না সরমা কে, কেনই বা এসেছে। দেবাশীষ গায়ে পড়ে একবার বুঝি বলতে গিয়েছিল, বাধা দিয়ে বললেন, থাক। তোমার সঙ্গে এসেছে, তা-তো জানি। আর কিছু জানবার প্রয়োজন নেই।

দেবাশীষ ইতিমধ্যে মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে ওর সম্পর্কের ছেঁড়া সুতোগুলো জোড়া দেবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে। এটুকু সে লক্ষ্য করতে ভোলেনি, সবাই কেমন উত্তেজিত ভঙ্গিতে কথা বলে। গরম বুলি আর চরম পন্থার দিন আবার এল নাকি !

দেশবন্ধু তো নেই-ই, স্বরাজ্যদলের শিরদাঁড়াও যেন ভেঙে গেছে। যে দেশবন্ধু ফরিদপুরে ঘোষণা করেছিলেন যে সরকারী মনোবৃত্তি বদলাচ্ছে এমন লক্ষণের আভাস তিনি পেয়েছেন, বেঁচে থাকলে তিনি কী করতেন বলা শক্ত। আজ স্বরাজ্যদল যতই সরকারের সঙ্গে আপোষ ব্যাকুল শর্তের পর শর্ত পেশ করছে, সরকার মুখ ফেরাচ্ছেন তত। প্রত্যাখ্যাত, নতশির নেতারা আবার গণচিত্তে তাঁদের হারান আসন নতুন করে পাতবার প্রয়াস পাচ্ছেন। কিন্তু দশ বছর আগে আর আজকের দিনে তফাৎ যে অনেক। দশ বছর আগে গণমানব সহজে সাড়া দিত,—তাদের নিজের কোন ভাষা ছিল না। আজ নিজস্ব কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের ভেতর দিয়ে তারা আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ খুঁজছে। পূর্ব পরীক্ষায় বিফল নেতৃবৃন্দের ডাকে তারা আর নিঃসংশয়ে সাড়া দিতে পারছে না। এরা রাজনৈতিক স্বাধীনতা তো চায়ই, উপরন্তু আরো একটা কিছু চায়, যা ব্যাপকতর, গভীরতর। ঈশান কোণে টুকরো মেঘের মত রাজনৈতিক আকাশের এ এক নতুন শরিক, এখনও ছোট, এখনও এক কোণে, কিন্তু ক্রমেই বাড়ছে, ক্রমেই ছেয়ে ফেলছে। যারা খেটে খায়, তারাতো বটেই, এমন কি নতুন যাঁরা রাজনৈতিক আন্দোলনে এসেছেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই এই এক নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ। জাতীয়তাবাদের ক্ষেত্রে বামপন্থী নামে একটা নতুন কথা শোনা যাচ্ছে। কথাটার অর্থ সুবোধ্য না হলেও ইঙ্গিৎটা আর অস্পষ্ট নয়। এত ধর্মঘট কি আগে ছিল। আর, দলে দলে মজুর যদি যোগ না দিত, তবে কি সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে এমন জুৎসই বিক্ষোভ দেখান চলত। এখন একটা জিনিস স্পষ্ট হয়ে উঠছে। রাজনৈতিক আন্দোলনটা এখন আর কংগ্রেস আর বৃটিশ এই দু' তরফের দাম্পত্য কলহমাত্র নয়, সামান্য কিছু ঘুম পাড়ানি কনসেসন আর রিফর্মের জন্যে দর কষাকষি নয়। আন্দোলনের রূপ আজ ত্রিকোণ।

এই ত সেদিন জওয়াহরলাল নেহরু ফিরেছেন য়ুরোপ সফর করে। সে সব দেশের যুদ্ধোত্তর রাজনীতি ও সমাজনৈতিক চিন্তাধারার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটেছে তাঁর। এদেশে তরুণদের মনেও নতুন আশার প্রথম দীপটি জ্বালালেন তিনিই। মাদ্রাজ কংগ্রেসেই বোঝা গেল তরুণ কর্মীদের ঝোঁক বাঁদিকের পাল্লায়। নবগঠিত 'সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্তর্জাতিক সংঘ' কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত হ'ল। কংগ্রেসের নতুন দু'জন জেনারেল সেক্রেটারি হলেন জওয়াহরলাল আর সুভাষচন্দ্র। বামপন্থী নেতৃত্ব এ দু'জনেরই মুঠিতে।

কিছুদিন পরেই কলকাতায় কংগ্রেসের বিরাট মহাসম্মেলন হবে। এই অন্তর্দ্বন্দ্ব তখন কি নেবে আরো স্পষ্ট রূপ! দক্ষিণপন্থী নেতারা বুঝেছেন নিজেদের দৌর্বল্য। তাই আবার ডেকে আনছেন গান্ধিজীকে। একমাত্র গান্ধিজীই বুঝি পারেন এই তরুণ মনের উদ্দাম সপ্তাশ্বকে লাগাম পরাতে। তরুণেরা চায় অবিলম্বে সংগ্রাম, কেন না জনচিত্ত প্রস্তুত। হিসাবী নেতারা চান, আপোষ। গান্ধিজী দুইয়ের মধ্যে কি রফা করবেন। সংগ্রাম যদি আসেই, কেমন হবে সে সংগ্রাম। কোন পথে সে চলবে, কী হবে তার রূপ। কেউ জানে না। সকলে অস্থির প্রতীক্ষায় আছে।

এখানে, ওখানে, সর্বত্র চাপা গলায় এই একই আলোচনা। পথে পথে তোরণ তৈরি সারা। মতিলাল নেহরুকে পুরোভাগে নিয়ে মিছিল বেরুবে। কিন্তু এসব আয়োজন হ'ল বহিরঙ্গ। আসল প্রস্তুতি চলছে ভেতরে ভেতরে।

চিরঞ্জীবদার বাসায় কত লোক যে আসে। কেউ এই শহরের, কেউ বাইরের। আসে এক রাত থাকে, সকালে আবার উধাও হয়ে যায়। চিরঞ্জীবদা বা দেবাশীষ, এ দু'জনকেই বা দেখতে পাওয়া যায় কতটুকু। সরমা আড়াল থেকে সংসার চালায়, সব কিছু গুছিয়ে রাখে, এগিয়ে দেয়। অবসর সময়ে ক্লিষ্ট মুখে জানালার পাশে বসে থাকে।

মুক্তি পাবে বলে কলকাতায় এসেছিল। কিন্তু না ঘুচল নিঃসঙ্গতা, না পেল আত্মবিশ্বাস, না মিলল কারুর নাগাল, এ কোন ধরণের মুক্তি।

একদিন সন্ধ্যাবেলা মনোরমা দেবী এলেন। চিরঞ্জীবদা, কিম্বা দেবাশীষ, কেউ বাসায় ছিল না। গাড়ি থেকে নেমে একজন ভদ্রমহিলা জোরে জোরে কড়া ধরে নাড়ছেন দেখে সরমাই এগিয়ে এসে দরজা খুলে দিল।

পরনে টকটকে লাল পাড়ের খদ্দরের শাড়ি,—সিঁদুর আছে কি না আছে বোঝা গেল না, সরমার দিকে চেয়ে বললেন,—চিরঞ্জীব? চিরঞ্জীব নেই?

চিরঞ্জীবদাকে নাম ধরে ডাকে, এ আবার কে। সরমা থতমত খেয়ে বললে, বেরিয়ে গেছেন।

চেয়ারে আরামে গা ঢেলে দিয়ে মনোরমা দেবী বললেন,—তা যাক। আমি একটু বসব। আমার নাম শুনেছ বোধ করি,—রাধানগরের মনোরমা দেবী। তুমি কে?

আমি সরমা। বুঁজে-আসা গলায় সরমা কোনক্রমে বলল।

ওঃ তুমিই বুঝি সেই। শুনেছিলাম বটে চিরঞ্জীব একটি [illegible]বয়সী মেয়েকে এনে রেখেছে। তা বেশ, বেশ।

সরমার কান দু'টো লাল হয়ে উঠল। মনোরমা দেবীর কথাগুলো শুনতে নির্দোষ তবু সুরটা যেন কেমন।

বারো

বাসায় ফিরে চিরঞ্জীবদা রাধানগরের মনোরমা দেবীকে দেখে দু'পা পিছিয়ে গিয়েছিলেন, সরমার এটুকু লক্ষ্য করতে ভুল হয়নি।—মনোরমা যে, কী মনে করে? কংগ্রেসের ডেলিগেট হয়ে নিশ্চয়।

—এতক্ষণে বুঝি বনের মোষ তাড়ান তোমার সারা হ'ল চিরঞ্জীব, তাই ঘরের খাওয়ার কথা মনে পড়েছে। আমি সেই কখন থেকে বসে আছি। অন্য সব ডেলিগেটরা চলে গেলেন রিসেপসন কমিটির নির্দেশ মত আস্তানায়। আমি চলে এলুম এখানে। ওই হট্টগোলে আমার ঘুম হবে না। ভালো করিনি?

চিরঞ্জীবদা কোন জবাব না দিয়ে পাঞ্জাবিটা খুলে সরমার হাতে দিলেন। হাত-পাখার হাওয়া খেতে খেতে বললেন, এসে ভালই করেছ। অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ে আমার বাসার অভ্যর্থনা কিছু কম হবে না। এতদিনে এ বাসায় অভ্যর্থনা সমিতির খুব ভাল সেক্রেটারী পাওয়া গেছে। বলে হাসি মুখে সরমার মুখের দিকে তাকালেন।

—তারপর? তোমার ব্যবসা কেমন চলছে মনোরমা।

—ব্যবসা? মনোরমার গলা যেন শুকিয়ে এল,—আমার "প্রতিষ্ঠানের" আশ্রমকে তুমি ব্যবসা বলছ, চিরঞ্জীব? জান কী মহৎ উদ্দেশ্যে—

চিরঞ্জীবদা সামান্য হাসলেন; এটা কোন যুক্তি নয়। ব্যবসা হলেই যে উদ্দেশ্য মহৎ হতে পারবেনা এমন কথা নেই।

—তোমাদের এই হৈ-চৈ জেলে যাওয়া-আসা দেখে দেখে আমি হাঁপিয়ে পড়েছি চিরঞ্জীব। আমি নিয়েছি সংগঠনমূলক কাজের ভার। আমার আশ্রমে এখন পঁচিশটি প্রাণীর ভরণ পোষণ হয় জানো। গত বছরে আমরা কাপড় বুনেছি দশ হাজার গজ—

—ঢেঁকি ছাঁটা চাল বেচেছ হাজার মণ,—মধু পনের সের, খাঁটি গাওয়া ঘি বেচেছ—বলে যাও, মনোরমা। তোমার খাঁটি গব্যঘৃতস্নিগ্ধ খাঁটি দেশপ্রেমের হিসাব দাও।

—তুমি ঠাট্টা করছ চিরঞ্জীব। আমাদের কর্মনীতি আলাদা, কিন্তু লক্ষ্য তো একই?

—তাই বা কী করে বলি। দেখছ তো, এই ক'বছরেই তোমার

দেশপ্রেম মুনাফা ঢালতে শুরু করেছে, আর আমাদের পথ বারে বারে ঠেকছে গিয়ে সেই পাথরের দেয়ালে। কিন্তু একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি জেলে যাওয়া আসায় তোমার রুচি নেই, বলেছ একটু আগে। তবু এবারকার কংগ্রেসে যোগ দিতে এলে কেন?

অল্প একটু হাসতে চেষ্টা করে মনোরমা দেবী বললেন, পুরনো বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেখা হওয়াও একটা কারণ তো হতে পারে। আর, কংগ্রেসে তো সব মতেরই স্থান আছে, চিরঞ্জীব।

মর্মভেদী দৃষ্টিতে মনোরমার দিকে তাকিয়ে রইলেন চিরঞ্জীবদা।—আর কোন উদ্দেশ্য নেই?

সেই দৃষ্টির সমুখে কেমন যেন সঙ্কুচিত হয়ে পড়লেন মনোরমা দেবী। আর,...আর কী উদ্দেশ্য থাকবে আবার। অবিশ্যি কংগ্রেস একজিবিশনে ছোট খাটো একটা ষ্টলও খুলছি আমরা—

এতক্ষণে চিরঞ্জীবদা দরাজ গলায় হেসে উঠলেন। তাই বল। সব ধন্দ চুকে গেল। কংগ্রেসে ষ্টল খুলেছ, এটা আগে বললেই আর কোন প্রশ্ন থাকত না। সরমা, একগ্লাস জল।

জল নিয়ে এস সরমা দরজার বাইরে থমকে দাঁড়াল।

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন না তো মনোরমা দেবী। রুদ্ধ, অস্পষ্ট গলায় বলছেন, আমাকে শুধু আঘাত করবে বলেই যদি প্রতিজ্ঞা করে থাক, তবে আর কিছু বলবার নেই আমার। চিরকাল তুমি এমন ছিলে না চিরঞ্জীব।

—চিরকাল তুমিও এমন ছিলে না মনোরমা। আমার দু'জনেই শিক্ষা নিয়েছিলাম তোমার বাবার কাছ থেকে। তিনি সবার জন্যে নিজের সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়েছিলেন, এমন কি—

—এমন কি তাঁর মেয়েটিকেও। আশা করেছিলেন সে-ও এসে তোমাদের পাশে দাঁড়াবে।

—কিন্তু পাশে এসে তো দাঁড়ালে না। দু'দিন হুজুগে মেতেছিলে, পিছিয়েও এলে। আমরা জেলে গেলুম, ফিরে এসে দেখি তুমি আশ্রম নিয়ে মেতেছ। ঢেঁকিছাঁটা চা'লের নৈবেদ্য সাজিয়ে গব্যঘৃত ঢেলে দেশপ্রেমের সাত্বিক হোম।

মনোরমা কী বলতে যাচ্ছিলেন, চিরঞ্জীব বললেন, আমাকে বলতে দাও। পুলিশে তাড়ান দুটি ছেলেকে তোমার আশ্রমে পাঠিয়েছিলেম, তুমি তাদের আশ্রয় দিতে অস্বীকার করেছিলে। সে কি শুধু আমাদের পথ আলাদা বলে? নাকি পুলিশ এসে কবে হানা দেয়, তোমার ফেঁপেওঠা আশ্রমের উপর সরকারি কোন দৃষ্টি পড়ে, এই ভয়ে? তোমার সম্পর্কে আমার মোহমুক্তি ঘটেছে মনোরমা।

মনোরমা দেবীর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। পরমুহূর্তে সামলে নিলেন। গলায় শ্লেষ ঢেলে দিয়ে বললেন, কবে থেকে চিরঞ্জীব? এই পুঁচকে মেয়েটি যেদিন থেকে এসেছে, সেদিন থেকে নাকি।

পর্দার ওপাশে সরমার হাতে জলের গ্লাস থর থর করে কেঁপে উঠল। এবারে কী বলবেন, চিরঞ্জীবদা। প্রতিবাদ করে উঠবেন? তিরস্কারের কালি ঢেলে দেবেন মনোরমার মুখে? কয়েক সেকেণ্ড কেটে গেল চিরঞ্জীবদার একটা কথাও শোনা গেল না।

জলের গ্লাসটা পর্দার নীচে রেখে সরমা আস্তে আস্তে ফিরে গেল।

পরদিন সকালে মনোরমা দেবীকে দেখে কিন্তু মনে হ'ল না, কাল রাতে কিছু ঘটেছে। হাসি মুখে চা খেলেন, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কাগজ পড়লেন। দেবাশীষের সঙ্গে তুমুল তর্ক করলেন। তারপর ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, এবারে আমাকে যেতে হয়। ষ্টলটা একটু দেখে আসি। চল আমাকে এগিয়ে দেবে দেবাশীষ।

ফুরসুৎ পেয়ে এক সময় সরমা বললে, আপনাকে একটা কথা বলব, মনোরমাদি।

বিস্মিত চোখে মনোরমা তাকালেন, আমাকে? কী বলবে?

আমাকে এখান থেকে নিয়ে চলুন, মনোরমাদি। বিছানায় আধশোয়া ছিলেন, এবারে মনোরমাদি একেবারে সোজা হয়ে বসলেন, কী বলছ তুমি? এখান থেকে চলে যাবে? কোথায়?

—আপনার আশ্রমে। আমি নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে চাই। আমাকে আপনি একটা সুযোগ দিন।

—পারবে তুমি?

—কেন পারবো না মনোরমাদি। আমার স্বাস্থ্য আছে, প্রাণপণ খাটতে পারবো—

মনোরমাদি হাসলেন। তোমার শুধু যে স্বাস্থ্যই আছে, তাতো নয়, সরমা। তোমার বয়সও আছে।

—সেটা কি দোষের?

—দোষের নয়, ভয়ের। এই বয়স, সব প্রলোভন ছেড়ে পারবে তুমি আশ্রমের কঠোর নিয়ম পালন করতে।

সরমা ভেবেছিল বলে, দু' বছর বৈধব্যের কৃচ্ছ্র তার মধ্যে কাটিয়েছি, আশ্রমের নিয়ম তার চেয়ে আর কতইবা কঠোর হবে। মুখে বললে, নিশ্চয় পারবো।

—বেশ। মনোরমা বললেন, তোমার মত চটপটে চালাক মেয়ে পেলেতো ভালোই হয়। কিন্তু দেবাশীষের মত নিয়েছ, চিরঞ্জীব চটবে না?

—দেবাশীষবাবু অমত করবেন না, আর চিরঞ্জীবদাকে আপনি রাজি করাবেন মনোরমাদি।

সন্ধ্যার পর মনোরমা চিরঞ্জীবকে বললেন, তোমার সঙ্গে কথা বলতে ভরসা হয় না চিরঞ্জীব, কিন্তু একটা নিবেদন আছে।

চিরঞ্জীবদা উৎসুক হয়ে তাকাতে মনোরমা ধীরকণ্ঠে বললেন, সরমাকে তুমি আমাকে দিয়ে দাও।

—তোমাকে দিয়ে দেব? ঠিক বুঝতে পারছিনে, মনোরমা।

সব কথা শুনে চিরঞ্জীবদা একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন। সরমা বাইরে ছিল, মনোরমা বেরিয়ে এসে বললেন, আমার যা বলবার আমি বলেছি, এবারে তুমি গিয়ে বল।

সরমা বললে, আপনি অনুমতি দিন, চিরঞ্জীবদা।

অনুমতি? চিরঞ্জীবদা চোখ বুঁজে ছিলেন, এবারে তাকালেন। বললেন, তুমি যদি সুখী হবে মনে কর, আমি বাধা দেব না। তবে তুমি দেবাশীষকে একবার জিজ্ঞাসা কর।

শেষ পর্যন্ত স্থির হ'ল, কংগ্রেসের পর সরমা যাবে মনোরমা দেবীর সঙ্গে। এই ক'টা দিন মনোরমা দেবীর ষ্টলে গিয়ে বসবে। আশ্রমের পাঁচজনের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ও হবে সেই সময়।

১৯২৮ সালের কংগ্রেস। কলকাতার দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে গড়ে উঠেছে নতুন এক উপনগরী। রাস্তায় বেরুলেই দেখা যায়, অনর্গল জনস্রোত চলেছে, প্রদর্শনীর দিকে, সভামণ্ডপে।

কংগ্রেসে নেহরু কমিটির রিপোর্ট গৃহীত হ'ল। এর জন্যে গান্ধিজীকে কম বেগ পেতে হয়নি। তরুণদের তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন, নেহরু রিপোর্ট গ্রহণ করলেও পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্য রইল ধ্রুব। এক বছরের মধ্যে সরকার যদি এই রিপোর্ট মেনে না নেন, তবে আবার শুরু হবে অহিংস অসহযোগ। বামপন্থী মহলে অসন্তোষের গুঞ্জন শোনা গেল আবার। আরো এক বছর? দেড়শো বছর কেটে গেছে, আরো তিনশো পঁয়ষট্টি দিন? অগত্যা। কিন্তু পঞ্চাশ হাজার শ্রমিক ইতিমধ্যেই

বিক্ষোভ জানিয়েছে এই আপোষ আর অপেক্ষার পাকাচুল নীতির বিরুদ্ধে। তাদের মুখে পূর্ণ স্বাধীনতার বুলি। দু'ঘণ্টা সভামণ্ডপ ছিল তাদের অধিকারে।

এই ক'টা দিন সবচেয়ে উত্তেজনায় কেটে'ছ সরমার। এত লোক এক সঙ্গে সে কখন দেখেনি; জাবনের যে জোয়ারে ঝাঁপিয়ে পড়তে চেয়েছিল, এ বুঝি তাই। মনোরমা দেবীর ষ্টলে চুপ করে বসে সব দেখে; রাত্রে লক্ষ বিজলীর আলো আকাশ থেকে তারার ধুলো ঝাঁট দিয়ে ফেলেছে; অসংখ্য অক্ষরে কোটি মানুষের স্বাধিকার লাভের সংকল্প লেখা।

মনোরমা দেবীর ষ্টলের সম্মুখে লাল শালুর ওপরে তুলোর হরপে লেখা ছিল, "না জাগিলে আজ ভারত ললনা, এ-ভারত বুঝি জাগে না, জাগে না।"

লাইন দু'টি সরমার মুখস্ত হয়ে গেছে।

ভোর বেলার গাড়ি। সরমা আর মনোরমাকে ষ্টেশনে তুলে দিতে এসেছেন চিরঞ্জীব আর দেবাশীষ।

এ ক'দিন দেবাশীষের সঙ্গে সরমার বেশি কথা হয়নি। দেখাই-বা

জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে সরমা বললে, ঠিক এমনি সময় সকালে একদিন কলকাতা এসেছিলাম। আজ আবার ভাসছি।

মনোরমা দেবী ও-পাশে ছিলেন। গাড়ি ছাড়ার আগে সরমা প্লাটফর্মে নেমে চিরঞ্জীবকে প্রণাম করল।

চিরঞ্জীবদা হঠাৎ বললেন, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি সরমা। মনোরমা গোটাকতক কুৎসিত ইঙ্গিত করেছিল তুমি কি তা শুনতে পেয়েছিলে। আর তাই কি তুমি—

গাড়িতে উঠে দরজায় দাঁড়িয়ে সরমা বললে, আপনি এমন ভুল করলেন চিরঞ্জীবদা। কে কী বলেছে না বলেছে, তাইতেই ভেঙে পড়ব, আমি কি এমন লবঙ্গলতিকা।

একটু থেমে সরমা আবার বললে, মনোরমাদি আপনাকে যা বলেছিলেন, তা আমি শুনেছিলাম, সত্যি। কিন্তু তাতে ঘাবড়ে যাইনি। ভেবেছিলাম, আপনি প্রতিবাদ করবেন। কিন্তু আপনি চুপ করে শুনলেন সব। একটি কথাও বললেন না। আমি ভয় পেলাম তখন। আমার নিজের জন্যে ভয় তো ছিলই, আপনার জন্যেও ভয় হ'ল। প্রগলভতা মাপ করবেন চিরঞ্জীবদা।

গাড়ি ছেড়ে দিল। ধোঁয়ায় আর সকালের ভিজে হাওয়ায় ভরে গেল কামরা। সরমা জানালায় মাথা রেখে চোখ বুজল। আবার অভিসার শুরু হ'ল। সরমা বাঁচতে চায়। সঞ্জীবনীর তীর্থের পথে চলা শুরু করেছিল কবে, কিন্তু কেবলি ধাক্কা খেল, ভুল ঠিকানায় পৌছল বারবার। একদিন মনে হ'ত দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে পারলেই বুঝি বেঁচে উঠবে। দেহতৃপ্তির সরসীতে কামনার কলসী ভরে নেবে।

সেই মৃৎপাত্র গুঁড়িয়ে দিয়ে গেল উপেন। ভুল ভাঙল। এ নয়, এ বাঁচার পথ নয়। কোন পথ তবে? সেই খোঁজে বেরিয়ে পড়ল আবার। উদ্দেশ্য আছে, উদ্দেশ নেই। গ্রাম্য যে বালবিধবা অন্ধ প্রবৃত্তির সংগতে উসকে পরপুরুষকে একদা ডেকে এনেছে শয্যান্তে, শাশুড়ির গঞ্জনা সহ্য করেছে, তার সঙ্গে আজকের সরমার কত তফাৎ। অনেক দূরে সরে এসেছে, কেবল মাইলের হিসাবে নয়, মনেরও। আজও ঠিকানা মেলেনি, কিন্তু প্রত্যয় পেয়েছে। নিজের ভেতর থেকে নিজে সরমা আর ছাপিয়ে ওঠে না; সামলাতে শিখেছে। সরমা এখন নিজেকে তো অন্তত চেনে।

সাতদিন যেতে-না-যেতেই দেবাশীষ যে একেবারে এসে হাজির হবে মনোরমার আশ্রমে, সরমা ভাবতে পারেনি।

—একী, জামাইবাবু, আপনি।

উস্কো শুষ্ক চুল দেবাশীষের, যে চোখ দুটি বরাবর জ্বলত, সে দু'টিতে ক্লান্তি।

—এদিকে একটু কাজে এসেছিলাম, তাই···

—তাই, অকাজে এসেছেন এখানে?

দেবাশীষ অপ্রস্তুত হয়ে বলল, অকাজ বলছ কেন। তোমার সম্বন্ধে আমার দায়িত্ব কি নেই?

—দায়িত্ব? সরমা হাসল।

—অস্বীকার করছ? তোমাকে আমি ক'লকাতায় নিয়ে আসিনি?

—সব ভুলে গেছেন জামাইবাবু। আপনি আমাকে নিয়ে আসেন নি; হঠাৎ দেখা হয়ে গিয়েছিল।

মুখ অন্ধকার হয়ে গেল দেবাশীষের।—যা বলতে চাও, বল। আমি কিন্তু অন্য রকম ভেবেছিলাম সরমা।

—জানি আপনি অন্য রকম ভাবতে শুরু করেছিলেন বলেই তো পালিয়ে এসেছি জামাইবাবু। যে হাসি শোনা যায় না, সরমা এমন হাসল। নইলে আপনার অদ্ভুত ভূতের ভয় ভেঙে দেবার লোভ যে একেবারেই হয়নি, তা নয়। কিন্তু—সরমা এখানে মাথা নিচু করল, সেই সঙ্গে স্বরও,—সে লোভ সামলাতে পেরেছি জামাইবাবু।

ধরা-ধরা থতমত-গলায় দেবাশীষ বললে, আসবার আগে তুমি আমার অনুমতিও নিলে না—

—অনুমতি দিতেই কি এতদূর চলে এসেছেন?

—শুনলাম, তোমাকে আর চিরজীবদাকে নিয়ে কথা উঠেছিল, তাই

তুমি········শুনে কিন্তু বড় আঘাত পেয়েছিলাম, সরমা। চিরঞ্জীবদা দেবতা, তাঁকে নিয়ে—

এবারে শব্দ করে হেসে উঠল সরমা।—ভুলে যাবেন না, জামাইবাবু, আমাদের শাস্ত্রে দেবতারাও গৃহী, সংসারী।

—অর্থাৎ ?

—আর অর্থ শুনে কাজ নেই। স্নান করে খেয়ে নেবেন আসুন। সরমা দেবাশীষকে ডেকে নিয়ে গেল ভেতরে। যেতে যেতে বলল, আপনারা সবাই দেবতা জামাইবাবু। কিন্তু মনের অসুরেব কাছে দেবতারাই তো বার বার পবাস্ত হন ? মিছিমিছি এক মায়া কাটিয়ে আরেক মায়ায় জড়িয়ে পড়বেন না। আমি তো নিজেকে সরিয়ে নিয়ে এসেছি। এবারে মন দিয়ে কাজ করুন। আর,—গলা নামিয়ে সরমা ফিস ফিস করে বললে,—আর তা যদি না পারেন, তবে বিভাদি'র কাছে ফিরে যান জামাইবাবু। সকলকে ঠকাবেন না, নিজে ঠকবেন না।

কলকাতায় সেদিনই বিকেলে ফিরে এল দেবাশীষ। সব সুর কেটে গেছে কোথায়। কানে বাজছে সরমার হুশিয়ারি : 'এক মায়া কাটিয়ে এসে আরেক মায়ায় জড়িয়ে পড়বেন না।' দেবাশীষ কি আবেক মায়ায় জড়িয়ে ফেলছিল নিজেকে ? এ প্রশ্নের উত্তর অন্তত নিজের কাছ থেকে তো সঠিক পাওয়া যাবে না। কোন্ মায়া কাটিয়ে এসেছিল দেবাশীষ, কোন্ মায়ায় জড়িয়ে পড়ছিল ? দুবল স্নায়ুতে সুসম্বদ্ধভাবে কিছু ভাবা যায় না, মনে একে একে আগে দেখা ফেলে-আসা অনেকগুলো মুখ ভেসে ওঠে : শুভাশীষ, চারু। কে জানে কত বড় হয়েছে শুভাশীষ। চারুর কি বিয়ে হয়ে গেছে। গর্ব অভিমান তিরস্কারে দৃপ্ত-ছলছল-কুঞ্চিত আরেকটি মুখও মনে পড়ল, কিন্তু বেশীক্ষণ সে মুখ মনের সমুখে রাখতে দেবাশীষের সাহস হ'ল, না। সে মুখ বিভার।

অকস্মাৎ দেবাশীষের মনে হ'ল, ভুল সব ভুল। একটা মায়ার ডোর ও কি আজ পর্যন্ত ছিন্ন হ'ল; একটি গ্রন্থিও কি ঢিলে হ'ল। পালাতে গিয়ে নিজেকে বরং পাকে পাকে জড়িয়েছে। একটা বোঝাও নামাতে পারেনি, একটার ওপর আরেকটা চাপিয়েছে; ক্রমাগতই এই। এতদিন চলার নেশা ছিল, রক্তে গতি ছিল, টের পায়নি। আজ এতদিন পরে ভেতরকার ভারবাহী পশুটা বিদ্রোহ করছে, সে আর টানতে পারেনা, আর পারেনা চলতে। সব ওজন নামিয়ে দিয়ে ছুটি চায়। আর, পরম পরিতৃপ্তির একটা অব্যয় উচ্চারণ করল দেবাশীষ। ছুটি। দিনভোর একটানা ঘামঝরা ছুটের পর ঝিরঝিরে বিকেল বেলার ছুটি। আজ নিজেকে চাবুক মেরে চালান নয়। আপন সত্তার রক্তাক্ত পিঠের সওয়ার হয়ে, খুরের ঘায়ে ধূলো উড়িয়ে নিরুদ্দেশ যাত্রা নয়।

উঠে গিয়ে এক গ্লাস জল খেল দেবাশীষ, তারপরে কাগজ কলম নিয়ে বিভাকে চিঠি লিখতে বসল। নিচের হলঘরের ঘড়ির ঢং ঢং শব্দে রাত্রির বয়স জানা গেল। ফুরিয়ে এসেছে। আর কয়েক ঘণ্টা পরেই দিন। আর একটি দিন। আর-ও একটি দিন। তা হোক। তার আগেই দেবাশীষ এ-চিঠি শেষ করবে।

কাগজ কলম নিয়ে দেবাশীষ লিখতে শুরু করল,—

'কল্যাণীয়াসু',

তেরো

সেই চিঠি মার কাঠের হাতবাক্সের নিচের তাকে অনেক দিন রূপ আবিষ্কার করেছিল শুভাশীষ। প্রথমটা বুঝতে পারেনি, হলদে-হয়ে-আসা কাগজের ওপর বিবর্ণ লিপি, ভেবেছিল বাজে কাগজ। কিন্তু দু'এক লাইন পড়তেই চোখ জড়িয়ে গেল, মনে পড়তে লাগল একটু একটু করে। এ-তো সেই চিঠি। দিদির বিয়ের পরদিন এসেছিল। দাদু তুলে দিলেন

মার হাতে। মা ফিরিয়ে দিলেন দাদুকে। কেউই প্রথমে পড়তে চায়নি। কী লেখা আছে কে জানে। গর্ত খুঁড়ে সাপ বার করার ঝুঁকি কেউই নিতে চাইলে না।

তারপরে কেটে গেছে তো কতদিন। আজ পর্যন্ত শুভাশীষ জানেনা চিঠিতে কী ছিল। বাবা নিরুদ্দেশ হওয়ার পর যে-রকম সাড়া পড়েছিল, তেমন কিছু হ'ল না তো। নিঃশব্দ অবজ্ঞার স্তূপের নিচে চিঠিখানি চাপা পড়ে গেল।

আজ এতদিন পরে সেই চিঠি পাওয়া গেছে। রোমাঞ্চ লাগে বৈকি। রুদ্ধশ্বাস আগ্রহে শুভাশীষ পড়ে যেতে লাগল।

'কল্যাণীয়াসু' পাঠ দিয়ে শুরু করেছেন বাবা। তারপর সংক্ষেপে সরমাদির সঙ্গে ওঁর ট্রেনে আকস্মিক সাক্ষাৎকারের বিবরণ দিয়েছেন। তারপর আছে কলকাতায় কী ঘটল। চিরঞ্জীবদার বাড়ি, মনোরমা দেবী,—বাবা একের পর এক সব লিখে গেছেন। সবশেষে বাবা ক্ষমা চেয়েছিলেন।

> আমি যে অসাধারণ নই সেটা সরমাই আমাকে চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে গেছে। এবার একটু জিরিয়ে নেব ভাবছি···প্রথমেই মনে পড়ল তোমার কথা ···জানি এমন আবদারের কোন পথ আমি রাখিনি, তবু তুমি যদি আর একটিবার ক্ষমা কর, তবে তোমাদের নিয়ে জীবনের বাকি ক'টা দিন কাটিয়ে দিই।···এই ঠিকানায় আমি আরো তিনি সপ্তাহ থাকব। যদি মনে কর ক্ষমা করতে পারবে, তা হ'লে চিঠি দিয়ো। আমি অপেক্ষা করে থাকব।···আর যদি চিঠি না পাই (এখানে অনেক কাটাকুটির পর বাবা লিখেছেন) তা হ'লে আবার ভেসে পড়ব। বাকিটা অদৃষ্টের হাতে।

এ-চিঠির কোন জবাব মা দিয়েছিলেন কিনা জানা যায়নি। যেদিন-কার ডাকে এসেছিল, সেদিন বিকেলেই চারু শ্বশুরবাড়ি রওনা হয়ে গেল। দুপুর থেকে তারই তোড়জোড়। চিঠির কথা, অন্ততঃ তখনকার মত, ভুলে গেল সবাই

সঙ্গে যাবে কে? বাক্স গুছিয়ে দিতে দিতে চোখ মুছে মাসিমা এক সময় জিজ্ঞাসা করলেন।

তাইতো। সঙ্গে যাবে কে। ছোট মেয়ে চারু, বিয়ে হ'ল দূর দেশে। নতুন জায়গা, নতুন মানুষ, চারুর তো মন একটু খারাপ হতেই পারে।

—শুভাশীষ সঙ্গে যাকনা?

—শুভাশীষ? একসঙ্গে দু'জনকে ছেড়ে থাকতে পারবে দিদি?

—একসঙ্গে দু'জন কেন, সবাইকে ছেড়েই আমি থাকতে পারি শোভা। মা ধীরে ধীরে উত্তর দিয়েছেন।

শুভাশীষই যাক তবে। ছোটভাইকে কাছাকাছি পেলে চারু অন্তত সান্ত্বনা পাবে। চারা গাছ উপড়ে নতুন জায়গায় লাগাতে হ'লে কিছুটা পুরনো মাটিও সঙ্গে নিতে হয়। শুভাশীষ যখন ফিরে আসবে, চারুর ততদিনে মন বসে যাবে নতুন সংসারে।

একে একে প্রণাম করল চারু সকলকে। মাসিমা চিবুক ছুঁয়ে আশীর্বাদ করবার সময় কেঁদে ফেললেন। ভুবনমোহনকে হাত ধরে বললেন, আমাদের বড় আদরের জিনিষ তোমার হাতে তুলে দিলুম বাবা। যত্নে রেখ। ওর কোন ত্রুটি ধ'রনা, নিজের মত করে তৈরি করে নিও।

মা কিন্তু চোখের জল ফেললেন না। কঠিন হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন একপাশে। দেশাচার আর অনুষ্ঠানগুলো সারছেন একে একে। 'তোমার ঋণ শোধ করলাম মা' বলতে গিয়ে চারু ঝর ঝর কেঁদে ফেলল, উলুধ্বনি আর কান্নায় মিশে গিয়ে, ছোটমাসির গলা চিরে বিকৃত একটা ধ্বনি বেরুল, মা কিন্তু নিস্পন্দ। তবু এরই মধ্যে, দাদু ঠাট্টা করে আবহাওয়া সহজ করে দিলেন। বর কনে পাল্কিতে বসতেই এগিয়ে এসে বললেন, নামো শালা, কনের সঙ্গে পাল্কিতে যাব আমি।

ভুবনমোহন অল্প হাসল। চারু হাসিগোপন করতেই বুঝি আয়েরদিকে

মুখ ফেরাল। বরকনে গেল একগাড়িতে। বরযাত্রীদের সঙ্গে আরেক গাড়িতে উঠল শুভাশীষ।

এখানে-ওখানে গাড়িবদল করে পরদিন বিকেলে শ্বশুরবাড়ি পৌছল চারু। পথশ্রমে মুখ কালো হয়ে গেছে, জামাকাপড়ে কয়লা আর ধূলি।

বরযাত্রীরা একে একে পথ থেকেই বিদায় নিয়েছে, শেষ পর্যন্ত টিকে রইল একজন কি দু'জন চাকর, ভুবন, চারু আর শুভাশীষ।

বিয়ে বাড়ি আর একটু সরগরম হবে ভেবেছিল শুভাশীষ, তাতো নয়, সব কেমন যেন নিঝুম। দু'একটা কনেষ্টবল লাঠি-লণ্ঠন নিয়ে এদিকে ওদিকে ঘোরাফেরা করছে ; থানা বুঝি পাশেই।

চালকড়ি খেলা নামমাত্র হ'ল। এ অঞ্চলে বাঙালী কম। আরো একটু রাত হতে দু'চারজন স্ত্রীলোক এল, তারা এই গঞ্জের ব্যবসাদারদের বৌ। ভুবনমোহন একসময় উঠে গিয়েছিল। মেয়েরা চারুকে ঘিরে বসল।

—এত দেরি হ'ল তোমাদের? পেছন থেকে খনখনে গলায় কে জিজ্ঞাসা করলে।

দোকান থেকে এই তো ফিরল সবাই। কাচ্চাবাচ্চা ঘুম পাড়িয়ে এই এলুম।

দরজার পাশে দাঁড়িয়ে শুভাশীষ দেখছে। কালোকালো মোটাসোটা হাত, ভারি ভারি, বাহুমূল থেকে মনিবন্ধ অবধি সোনায় মোড়া। নাকে নথ। এদের পাশে কী হালকা চারু, হাওয়ায়-কাঁপা প্রদীপটির মত।

—দিব্যি বৌ হয়েছে লো রোহিণী। একজন বললে। তবে বড় রোগা। গায়েগতরে মোটা নেই।

সেই তো মুস্কিল। ভুবনের কেমন পছন্দ কে জানে। এই তো শরীর, প্রাণ-পাখি ফুড়ুৎ করে ওড়ে-ওড়ে। একটা বিয়োলে ও আর

ঠিক করে ভেবেছ। ফ্যাচ-ফ্যাচ, সর্দি-কাসি আমি কিন্তু সইতে পারবোনা বাছা, আগে থেকেই বলে দিলুম।—রোহিণী বলে যাকে ডাকা হ'ল, সে জবাব দিলে। শুভাশীষ তাকিয়ে দেখল, একটু আগে খোনা গলায় যে কথা বলেছিল, এ সেই।

তারপর শুরু হ'ল প্রচলিত ঠাট্টা। শুভাশীষ সব বুঝলে না, তবু ওর কান মাঝে মাঝে লাল হয়ে উঠতে লাগল, এখানে সে না থাকলেই যেন ভালো ছিল। বেশির ভাগ ঠাট্টাই শরীর নিয়ে, বেশির ভাগ খোঁটাই বাপের বাড়ি নিয়ে। চারুর গা টিপে টিপে পরীক্ষা করছে কেউ; বলছে, এমন ধারা শরীর কেন তোমার, এমন রোগা কেন। বাপের বাড়ি বুঝি খেতে পেতে না। এখন তবু চলছে, পোয়াতি হ'লে সামলাবে কী করে।

একজন বললে, বিয়ের জল পড়ুক না। এ বৌ-ই দেখবে ফুলে-ফেঁপে-ভরে উঠেছে।

চোখেচোখে একটা নিঃশব্দ হাসাহাসি হয়ে গেল।

হঠাৎ হাসি থামিয়ে একজন জিজ্ঞাসা করলে, ও কী।

তটস্থ হয়ে এদিক ওদিক তাকাল সবাই।

কিন্তু তাকিয়ে কি ঠাহর হবে ঘরের ভেতর একটা আলো শুধু টিম টিম করছে, বাইরে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার।

—ও কী।

কোথা থেকে মর্মান্তিক একটা আর্তনাদের শব্দ ভেসে আসছে। অসম্বৃত চীৎকার, মাঝে মাঝে থামে; কিন্তু তখনও চলে একটানা অনর্গল গোঙানি।

বাড়ির পাশেই থানা। শব্দটা কি আসছে সেখান থেকে। জানালার বাইরে লণ্ঠন হাতে একটা কনষ্টেবল যাচ্ছিল, রোহিণী তাকে জিজ্ঞাসা করলে, ও কে রে, শিউনন্দন? কে চেঁচায়।

শিউনন্দন নির্বিকার গলায় বললে, একটা পকেটমার ধরা পড়েছে আজ ইষ্টিশানে। দারোগাবাবু নিজে তাকে শায়েস্তা করছেন।

—কে, ভুবনমোহন?

—হাঁ। শালাকে খুব চাবকেছেন সাহাব। বোধহয় আধমরা হয়ে এল।

আধমরা হয়ে এল? আড়ষ্ট হয়ে দেয়াল ঘেঁষে বসল চারু। শুভাশীষ দরজার কড়াটা শক্ত করে চেপে ধরল। দু' ভাই-বোনে যে সশঙ্ক, বিহ্বল দৃষ্টিবিনিময় হয়ে গেল, সেটা লক্ষ্য করলে না কেউ।

কিছুক্ষণ কেউ কিছু বললে না। অন্ধকার ছিঁড়ে মাঝে মাঝে সেই গোঙানির শব্দ। তাও একসময় থেমে এল। হঠাৎ দাঁত বার করে হাসল রোহিণী,—ভুবন আমাদের অমনি ধারা। ওর কাছে চোর—গুণ্ডা —বদমাস সবাই জব্দ। সবাই বলে এমন জবরদস্ত দারোগা এর আগে কেউ আসেনি।

আর ঠিক তক্ষুনি জুতো মস-মস করে ঘরে ঢুকল ভুবনমোহন। খাকির শর্টটা পরনে, খাড়া-খাড়া ছোটছাঁটা চুল। নিজের নির্মমতায় নিজেরি গায়ে কি ভুবনমোহনের কাঁটা দিয়েছে।

মেয়েরা এদিক ওদিক পালাবার পথ পেলে না। রোহিণীর দিকে তাকিয়ে ভুবন বললে, আড়ৎদাররা চাল, ঘি, আটা—চিনি সব পাঠিয়ে দিয়েছে। তুলে রাখো।

বিয়ের ভেট। এর আগে যত বিয়ে শুভাশীষ দেখেছে তাতে বেশির ভাগ উপহারই পেত বৌ, বর নয়। সবই প্রায় বই, শাড়ি কি জর্মন সিলভারের সিঁদুরের কৌটা। এ বিয়ের উপহার এসেছে টিন-টিন ঘি, আর বস্তা বস্তা চা'ল। দারোগার বিয়ের আড়ৎদারদের ভেট।

সবাই চলে যেতে রোহিণী চারুকে বললে, যাও তুমি গা ধুয়ে এস বৌ। ও-পাশে কলতলা। আজ আবার ফুলশয্যে!

এতক্ষণে চারু রোহিণীর দিকে তাকিয়ে দেখার ফুরসুৎ পেল। পরনে নরুনপাড় ধুতি, গলায় কণ্ঠি। কপালে তিলক। বয়স হয়েছে তবু চোখ দুটি বেশ ঢলঢলে। চারু একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে: তবু কথা বলার লোক আছে একজন। একা একা এ বাড়িতে থাকতে গা ছম ছম করত।

জামা-কাপড় নিয়ে কলতলায় যেতে-যেতে চারু ফিস ফিস করে বলল, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব? আপনি ওনার কে?

কথাটা শুনে কত যে হাসল রোহিণী হিসেব নেই। ঠিক এই সময়েই বুঝি বারান্দা দিয়ে যাচ্ছিল ভুবনমোহন। তাকে ডেকে রোহিণী বললে, ও ভুবন, তোমার বৌ-কে বলে যাও, আমি তোমার কে।

জিজ্ঞাসা করছে নাকি, বলতে বলতে ভুবন ঘরে ঢুকল। মাথায় ঘোমটা টেনে চারু তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল।

—ভারি লাজুক, বললে ভুবন।

—শুধু লাজুক নয় বাপু, ন্যাকাও। কী বলিস রে, ছোঁড়া। দরজার পাশে দাঁড়ান শুভাশীষের দিকে তাকিয়ে রোহিণী বললে। তোর দিদি ন্যাকা, আর তুই পাকা, কেমন? বলতে বলতে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল রোহিণী।

শুভাশীষ সেখান থেকে সরে এল।

একটু পরে চারু ফিরে এল চান করে। শুভাশীষ অন্ধকার বারান্দার এক কোণে দাঁড়িয়েছিল। এখানে কেন রে, বললে চারু।—আয়।

কিন্তু ঘরে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়াতে হ'ল দু'জনকেই। খাটের ওপর পা ঝুলিয়ে বসেছে ভুবন, দু' পা দিয়ে রোহিণীর জানু বেষ্টন করে বলছে, সত্যি রোহিণী, তুমি আমার কে।

—কেউ নই। যতদিন পায়ে রাখ, ততদিন দাসী। কাঁসা গলায় বলতে বলতে হেসে ফেলল রোহিণী, আর ভুবন দু'হাত দিয়ে ওকে জড়িয়ে

টেনে নিলে কাছে। কানে কানে আধো-আধো গলায় বললে, পায়ে ছেড়ে মাথায় রেখেছিলাম। রাজার মত ঐশ্বর্য, অকলঙ্ক চরিত্র, অত্যাজ্য ধর্ম, ভ্রমরের মত স্ত্রী—ও, কে ?

ছিটকে জানালার কাছে সরে গেল রোহিণী। মুখে আঁচল চাপা দিয়ে বলল, তোমার ভ্রমর ইস্ত্রী গো। না-ও, এবারে মন ভোলাও।

শাদা পাথরের মত চারুর মুখ। দরজার সামনে কখন এসে অপলক চেয়ে আছে। রোহিণী বললে, কিছু মনে করিসনি ভাই ভ্রমর বৌ। ঠাট্টা করছিলুম। আমরা এমন করি।

ঠাট্টা। শুভাশীষ অবাক হ'ল। এ আবার কেমনতর ঠাট্টা, যে ঠাট্টায় দর্শকের মুখে এক ফোঁটা রক্ত থাকে না, শরীর কাঠ হয়ে আসে, পলক পড়ে না চোখের।

তা-না পড়ুক। তবু ফুলশয্যা হ'ল। রোহিণী নিজে সাজালে চারুকে। চারু বাধা দিলে না। চুল খুলে দিলে রোহিণী, পাথরের বাটিতে রাখা জলে সেই চুল ভিজিয়ে চারু ভুবনমোহনের পা মুছিয়ে দিল। নির্দেশমত সব করে গেল চারু। রোহিণী যা-যা বললে অবিকল তাই।

তারপর এক সময় দরজাটা বাইরে থেকে টেনে দিলে রোহিণী, খিল খিল করে হেসে শিকল তুলে দিল। এই ঘরে আজ ভুবনমোহনের সঙ্গে দিদি একলা থাকবে নাকি। সন্ধ্যাবেলা থানা থেকে ভেসে আসা গোঙানির শব্দ আবার কাণে বাজল। এই লোকটাই কি তখন চাবুক চালিয়েছিল নির্মম হাতে। এই একই লোক ?

রোহিণী বললে, শোবে এস। আমরা ও-ঘরে শোবো, কেমন ?

গোঁজ হয়ে বসে রইল শুভাশীষ। মাথা নেড়ে জানালে, সে এখন যাবে না। কৃষ্ণপক্ষের রোগা চাঁদকে অর্ধচন্দ্র দিয়ে ওপরে তারাদের আসর বসেছে। একদৃষ্টে তাকিয়ে শুভাশীষ অনেকক্ষণ রাস্তার পাশের ঝোপটায় জোনাকির জ্বলা আর নেবা দেখল। তারপর কখন একটু

ঝির ঝিরে বাতাসও বইতে শুরু করল। শুভাশীষ তখনও ঠায় বসে আছে; সেকি বন্ধঘরের ভেতর থেকে কখন দিদির গোঙানি শোনা যাবে, সেই আশায়?

—শোবে না?

ঘাড় ফিরিয়ে শুভাশীষ দেখল, রোহিণী। আবার এসেছে। গায়ে জামা নেই, আঁচল লুটিয়ে পড়েছে পায়ের কাছে। এই অন্ধকারেও দেখা যায় গলার কণ্ঠী; পিঠময় ঢালা, ঢিলে, চুল; কাঁচা ঘুমভাঙা শরীরের আলস্য।

—শোবে না? একটা হাই তুলে জিজ্ঞাসা করলে রোহিণী, নিজেই একটা তুড়ি দিলে।

—আমি দিদির কাছে শোবো।

—মাইরি? দিদির কাছে শোবে বৈকি। বয়েস তো কম হয়নি, তোর দিদি যে আর তোর কাছে শোবে না, বুঝিস নে ছোঁড়া। পারিস তো এই দরজার ফাঁকে উঁকি দিয়ে দেখ, দিদি এখন কী করছে। বলতে বলতে রোহিণী নিজেই উঁকি দিলে। ইশারায় শুভাশীষকে বললে, আয়, দেখবি।

দেখতে সাহস হ'ল না। শুভাশীষ ছুটে গিয়ে পাশের ঘরে ঢুকল। পিছন পিছন এসেছে রোহিণীও। বিছানায় গুড়িয়ে পড়ে রোহিণী অন্ধকারেই দু'হাত বাড়িয়ে দিলে।—এই তো লক্ষ্মী। আয়। মা-মাসি-দিদির কাছে অনেক শুয়েছিস, এবারে অন্যের কাছে শুতে শেখ,—হাসতে হাসতে বলল। সেই হাসির আগুনে মাথাটা দপ করে উঠল একবার, শুভাশীষ কেঁপে উঠল।

জানে, এ গোঙানি নয়, হাসি। তবু শরীরটা কাঠ হয়ে যায় কেন।

চোদ্দ

বাড়ী ফিরে এসে শুভাশীষ মাকে কিছু বলেনি। চারুরও নিষেধ ছিল। আসবার সময় চারু ওর বাক্স বিছানা গুছিয়ে দিতে দিতে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে নিয়েছিল রোহিণী আছে কিনা। তারপর বলেছিল, এখানে যা দেখে গেলি, মাকে-দাদুকে বলিস নি ভাই।

—বলব না?

—না। ওঁরা মিছিমিছি মনে কষ্ট পাবেন।

—কিন্তু, এখানে ওই মেয়েছেলেটা—

—চুপ। চারু বললে, কেউ শুনতে পাবে! আমি বেশ সুখেই থাকব। দেখছিস না, কী বড় বাসা, পাহারার জন্যে সেপাই আর বস্তা বস্তা আটা, ময়দা, চিনি? এত ঘি-ময়দা খেয়ে, চারু হেসে বলল, পরের বার এসে দেখবি, আমি কী মোটা হয়ে গেছি। এই তো সুখ?

—এই সুখ, দিদি? শুভাশীষ বোকার মতো জিজ্ঞাসা করেছিল।

—এই সুখ। বাক্সের ডালা বন্ধ করে চারু আস্তে আস্তে বললে, অন্ততঃ আমাদের পরিবারের মেয়ে বিয়ের পর এর চেয়ে সুখী হয় না। দেখিসনি মাকে? মাসিমা তো বিধবা। আর ছোট মাসিমা—

—কিন্তু দিদি, ওই রোহিণী, ওর সঙ্গে কী করে তুই এক সঙ্গে—

—পারব। চারু বললে।

বাড়ী ফিরে শুভাশীষ কিছু বলেওনি। মা-মাসিমা চৌকাঠ পেরুতেই ঘিরে ধরেছেন, দাদু জিজ্ঞাসু চোখ দুটি থেকে চশমাটাকে নাকের ডগায় নিয়ে গেছেন, কিন্তু শুভাশীষ কিছু বলেনি। এই সবে মাত্র হাফ-প্যাণ্ট ছেড়ে ধুতি-পরার গৌরব অর্জন করেছে শুভাশীষ, কিন্তু এরি মধ্যে সে এড়িয়ে গিয়ে প্রশ্নের জবাব দিতে শিখল কী করে। কেবল বর্ণনা দিয়ে গেছে দারোগার কোয়ার্টারের; ক'টা ঘর, ক'টা জানালা, ক'টা কাঁঠাল গাছ আছে উঠনে। এমন কি ভাঁড়াড়ের অফুরাণ, অপরিমাণ রসদেরও

উল্লেখ করল। বলল, দারোগা-জামাইবাবুর অপ্রতিহত প্রভাবে মুলুক শাসন করার দাপট, অবশ্য সেদিনের, ফুলশয্যার সন্ধ্যাতেই থানা থেকে ভেসে আসা গোঙানি-টুকুর কথা বাদ দিয়ে। শুধু বললে না, রোহিণীর কথা।

আর রোহিণীর কথা কী-ই বা বলতে পারত। কী জানে সে রোহিণীর। ফেরবার সময় পোড়াদা জংসনে গাড়ী বদল করবার সময় লুকিয়ে একটা সিগারেট ধরিয়েছিল। প্রথমে ধোঁয়ায় গলা বন্ধ হ'ল, জিভে, নাকে কেমন একটা জ্বালা, তারপর দু'টো ঠোঁটের মাঝখানে সিগারেটটা ভিজে, চুপ্‌সে কাদা হয়ে গিয়েছিল। প্রথম সিগারেট খাওয়া। সিগ্‌রেট খেতে খেতে সেদিন রাত্রে রোহিণী যখন দু'হাত বাড়িয়ে বিছানায় ডেকেছিল, সেই জ্বালাময় অস্বস্তির মুহূর্তক'টির কথা মনে পড়েছিল। অভিজ্ঞতা দু'টোর জাত আলাদা, তবু অনুভূতিব মিল আছে। একই রকম জ্বালা, দমও বন্ধ হয়ে আসে একই রকম ভাবে, কাদা হয়ে আত্ম-বিলোপের ভঙ্গিটাও যেন এক।

প্রথম সিগ্‌রেট খাওয়া, আর প্রথম মা-মাসি-দিদি ছাড়া অন্য লোকের কাছে শোওয়া!

শুভাশীষ হাসল। রোহিণীর কথা সে কাউকে বলতে পারবে না।

মা বাবার চিঠিটার কী জবাব দিয়েছিলেন। মা বাবার চিঠিটার কি আদৌ জবাব দিয়েছিলেন। শুভাশীষ বাড়ী ফিরেও ঘুণাক্ষরেও টের পেল না। আগেকার মতনই সব চুপ। বাবার যে কোন চিঠি এসেছিল, সেটাও যেন কারুর মনে নেই; মনোযোগী ছাত্র অসীম অধ্যবসায়ে আঁকা মানচিত্র থেকে ভুল সীমান্ত রেখাটুকু রাবার দিয়ে মুছে ফেলেছে।

আরো একবার গরমকাল এলো। আকাশের কাঁসা-গলানো রোদ্দুর দেখে মনে পড়ল উঁকি দিয়ে সরমাদির ঘরের তাসের আসর দেখার কথা; বর্ষার জল এবারেও দাওয়া ছুঁয়ে গেল। বাইরের শোঁ শোঁ হাওয়ার মুখে

গলা মিলিয়ে দাদু ঘরের মধ্যে কাশছেন। দাদুর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে। ওয়াসারে এবারে পুটিন দেওয়া হয়নি, চাল চুইয়ে অল্প অল্প জল পড়ে। মেঘের ধমক খেয়ে এক দমক হাওয়া ঘরে ঢুকতে চায়, দরজা কাঁপে, শিকল নড়ে, ভরসাও হয়, বাবা বুঝি এলেন।

জল নেমে যায়। হাঁচি-কাসি-সর্দিজ্বরের পালা। খেজুরের গুঁড়ির সেই সিঁড়িটা এবারকার জলে ভেসে গেছে, যেটার ওপর দাঁড়িয়ে সরমাদি গোড়ালির ওপর কাপড় তুলে ধরে কবে যেন শুভাশীষকে একঘটি জল আনতে ফরমাস করেছিল।

বড় বাড়ীতে পূজো। আর আর বছর একমাস ধরে ঠায় মণ্ডপে বসে শুভাশীষ প্রতিমা-গড়া দেখত। কুমোরকে যোগান দিত রঙের সরা। একদৃষ্টে চেয়ে দেখত খড়ের ওপর মাটির প্রলেপ পড়ল, তার ওপর চক-খড়ি, রঙ, তেল, চালচিত্র, ডাকের সাজ। প্রতিমার পেছন দিকটাতে কুমোরমশাই রঙ দিতে রাজী হতেন না, এ নিয়ে শুভাশীষের অভিযোগের অন্ত ছিল না। শুধু যেটুকু দেখা যায় সইটুকুই সাজানো আর সবটা কোনমতো, গোঁজামিল, এইটেই পীড়া দিত।

এবারে আর প্রতিমা-গড়া দেখতে ভালো লাগল না। ভালো লাগল না হাটুরেদের নৌকো চুরি করে বাইচ খেলা।

শুভাশীষ বড় হচ্ছে। শুধু বড়ো-মাপের জামায় জুতো-কাপড়ে নয়, মনেও। ভেতরে আগে কে একজন ছিল, সব কিছুতে সাড়া দিয়ে উঠতো চেঁচিয়ে, আনন্দে বেদনায়, সুখে-দুঃখে বেহিসেবি-বেসামাল হয়ে পড়ত। এখন আর তেমন হয় না। কথায় কথায় হাসি এখন পায় না; চোখে জল আনা তো দস্তুরমতো দুঃসাধ্য।

এরি নাম বুঝি বড়ো হওয়া, এই আস্তে আস্তে জুড়িয়ে যাওয়ার নাম? ভেবে ভেবেই বুঝি গাল বসে গেল, চোখে কালি পড়ল। আনন্দ এখনো পায়, কিন্তু তার প্রকাশটা পরিমিত। একি শুধু তার একার অভিজ্ঞতা,

না সকলের? আর সব কিছু ছাপিয়ে আছে এক মেঘলা বিষণ্ণতা, কারণহীন, নিঃসঙ্গ একটু বেদনা বোধ। এ বেদনায় চোখে জল আসে না, শ্বাস হয় না দীর্ঘতর, কেবল কোথায় একটু টনটন করে ওঠে।

বেশ তো ছিল সব, চকচকে, উজ্জ্বল; হঠাৎ এই পাঁশুটে চশমা এলো কোথা থেকে। শুভাশীষ ফূর্তি চায় না, চায় স্ফূর্তি। হঠাৎ সবার সমান হতে চায়। মাথায়, মনে, বুদ্ধিতে, সব। সমবয়সীদের সঙ্গে মিশে সুখ নেই, বড়োদের কাছে ঘেঁষতে গেলেও ধমক। এরা বুঝতে পারে না কেন, এরা জানতে চায় না কেন, শুভাশীষ আর ছোট নেই, সে মনে মনে সবার একবয়সী হয়ে গেছে। আধবোঁজা আধ-বোঝা মন এখন সব বোঝা হইতে পারে।

সব চেয়ে আঘাত লাগে, যখন দেখে ওর চেয়ে যারা বড়, তারা কেউ এখনো ওকে 'তুমি' বলল না, বিশেষ করে যে-সব মেয়েরা বয়সে বড়, তাদের চোখের কৃপা আর ঠোঁটের তাচ্ছিল্য 'তুই'-তেই ঠেকে আছে। সে-সব মেয়েদের চোখের দিকে চেয়ে করুণা কুড়োবার শখ নেই শুভাশীষের, তাই আজকাল সে মেয়েদের সামনা সামনি পড়লে মাথা নীচু করে।

লোকে মনে করে লজ্জা।

শুভাশীষ জানে, লজ্জা নয়, মাথা নীচু করে মাটির দিকে তাকিয়ে আরো বড়ো হবার অঙ্গীকার।

পূজোর ছুটিতে একটিও অঙ্ক না কষে শুভাশীষ যাবতীয় পাঠ্য-অপাঠ্য গল্প-উপন্যাস-গ্রন্থাবলী পড়ে ফেলল।

শুভাশীষ চারুর শ্বশুরবাড়ির কথা বিস্তারিত বলল না, কিন্তু জানতেও বাকি রইল না কারুর। চারুর চিঠি তো এসেছে।

—চারু কেমন আছে, দিদি। মাসিমা জিজ্ঞাসা করেছেন।

—ভালো না। বিনা দ্বিধায় মা বলেছেন।

—কী করে বুঝলি। চিঠিতে লেখা আছে?

এ কথা তো চিঠিতে কালি দিয়ে লেখা থাকে না, থাকে অজস্র কাটাকুটিতে, দু'লাইনের ফাঁকে ফাঁকে শাদা জায়গাটুকুতে। প্রতি চিঠিতেই হিসেব আসে ক'খানা নতুন গহনা হ'ল, কেনা হ'ল ক'খানা শাড়ি। চারু শুধু তার স্বামীর ঐশ্বর্যের কথা লেখে, একবারো লেখে না তার স্বামী মানুষটি কেমন। এ কি সুখের চিহ্ন। চিঠির শেষে চারু যখন লেখে "ভালো আছি, ভেবো না"—কী জানি কেন, মার মনে হয়, কতবার না-জানি চারু চিঠিটা ডাকে দেবার আগে ওই "আছি" কথাটা কেটে "নেই" লিখতে গিয়ে থেমে গেছে।

শুভাশীষকে ডেকে মা জিজ্ঞাসা করেন, সত্যি করে বল্‌তো খোকা, কেমন দেখে এসেছিস তুই চারুকে সেখানে।

ভালোই দেখেছি মা, মিথ্যে কথাটা বলতে শুভাশীষের গলা একবার কাঁপে!

এই তো সবে শেষ আশ্বিন, আকাশের ছেঁড়া জোব্বার পকেট ফুঁড়ে এখনো দু'চার পশলা বৃষ্টি নামে; রোদ এখনো কাঁচা-সোনা। শেষরাত্রে শিউলি-ঝরার নিঃশব্দ শব্দে ঘুম ভাঙে, ফিকে-হিম মসলিন আকাশের দিকে তাকিয়ে চারুর চোখ দু'টির কথা মনে পড়ে। এ-তো শ্রাবণের বর্ষণের মতো কূলছাপানো বুকভাসানো লোকজানানো কান্না নয়। চারুর কান্না এই শেষ-আশ্বিনের ভিজে-সোনা ভোরের শিশিরের মতো, চোখের পল্লবও ভেজে-কি-না-ভেজে।

দিদি ভালই আছে মা, শুভাশীষ বলে বটে, কিন্তু কিছুতেই সরাতে পারে না মন থেকে সেই ছবি: অন্ধকারে লাঠি-লণ্ঠন নিয়ে সঞ্চরমান ছায়ামূর্তির মতো কনষ্টেবল, আর সব চিরে মর্মভেদী একটা দীর্ঘ গোঙানি। এতদিন পরেও সেই গোঙানির শব্দটুকু শুভাশীষের কানে লেগে আছে, শুধু পকেটমারের গলার আওয়াজ আর শুনতে পায় না, শুনতে পায় চারুর।

পনেরো

কার্তিকের গোড়াতেই ছোটমাসিমার মৃত্যুসংবাদ এল। মা বললেন, আর নয়। খোকা, তুই একবার চারুকে গিয়ে দেখে আয়।

ছোটমাসিমা আগুনে পুড়ে মারা গিয়েছিলেন। রান্নাঘরের কোন কোনে অসতর্ক কুপীটা জ্বলছিল, বুঝি দেখতে পান নি। বেসামাল হাওয়া যখন আঁচল উড়িয়ে নিয়ে শিখার ওপর ফেলল, তখনো না। দেখতে আর কখনোই পাননি, যখন টের পেলেন, তখন সমস্ত ঘর ধোঁয়ায় ভরে গেছে, রুদ্ধশ্বাস অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না, অর্ধসমাচ্ছন্ন চেতনা দিয়ে অনুভব করা যায় সারা শরীরের জ্বালা। কোথায় দরজা, কোথায় কি। পায়ের ধাক্কায় ছিটকে গেছে বাসনপত্র; উনুনের ভাতের হাঁড়িটা উল্টে পড়েছে।

বাইরে থেকে লোকজন এসে শেষ পর্যন্ত রান্নাঘর বাঁচালে, কিন্তু ছোটমাসিমার ঝলসানো মাংসস্তূপ আর অর্ধদগ্ধ হাড় ক'খানা থেকে বাঁচানোর কিছু ছিল না।

দাদুকে প্রথম জানানো হবে না ঠিক হয়েছিল, কিন্তু তিনিও জানলেন। কোলের মেয়েটিকে আনতে একবার যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ওখান থেকে মাসিমার শ্বশুরবাড়ীর লোকেরা জানালে যে মেয়েটিকে দেওয়া হবেনা।

দাদু কাঁদেন নি।

বাইরের ঘরে বসে ছিলেন চুপ করে। শুভাশীষ জানালার ধারে দাঁড়িয়েছিল। যাঁরা সান্ত্বনা দিতে এসেছিলেন, তাঁদের দিকে তাকিয়ে শান্ত গলায় বললেন, কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই। আমি বিচলিত হইনি। একসময় তো মানুষ মেয়ে হলে গলা টিপে মেরেও ফেলেছে। আমিও তাই করেছি; শুধু দুর্ভাগ্য এই ভাসিয়ে দিতে পারিনি, তাই সারাজীবন-ধরে নিজের মেয়েদের মরা-মুখই আমাকে দেখতে হয়েছে। এক জনের জ্বালায় পোড়া চুকে গেল, এ বরং ভালোই হ'ল।

দাদুর কথা শুভাশীষ ঠিক বুঝতে পারলে না, কিন্তু ওর মনে পড়ল,

চলে-আসার দিনে চারুর কথা, 'আমাদের পরিবারের মেয়েরা সুখী হয় না। মাকে তো দেখেছিস; মাসিমা বিধবা; আর ছোট মাসিমা—'

সেই একই কথা দাদু আজ আত্মধিক্কারের খাদ মিশিয়ে বলছেন।

সবচেয়ে আশ্চর্য, ঠিক পরদিনই নিরঞ্জনকাকা এলেন। প্রথমে মনে হয়েছিল খবর পেয়ে এসেছেন। কিন্তু দু'চার কথার পর বোঝা গেল, নিরঞ্জনকাকা কিছু জানেন না।

প্রথমে বিশ্বাসই করেন না।

—তুমি ঠাট্টা করছ বৌদি।

—এ নিয়ে কি ঠাট্টা হয় ঠাকুরপো। বড়োমাসিমা বললেন।

অনেকক্ষণ নিরঞ্জনকাকা গুম হয়ে বসে রইলেন। তারপর আপন মনে আস্তে আস্তে বললেন, সুরমা মারা গেল! কিন্তু আমি যে ওর চিঠি পেয়েই এসেছিলাম।

ছোটমাসিমার চিঠি পেয়ে এসেছেন নিরঞ্জনকাকা?

বড়োমাসিমা বললেন, মানে তো ঠিক বুঝলাম না ঠাকুরপো।

নিরঞ্জনকাকা সে-কথার উত্তর না দিয়ে বললেন, এ তবে এ্যাকসিডেণ্ট নয়; নিশ্চয় স্যুইসাইড। কিন্তু একটা কথার আমি কিছুতে মীমাংসা করতে পারছিনে বৌদি, মরবেই যদি তবে সুরমা আমাকে আসতে লিখেছিল কেন।

—তোমাকে আসতে লিখেছিল, ঠাকুরপো?

—লিখেছিল বৌদি। অনেকক্ষণ ধরে মাথার অবিন্যস্ত চুলগুলোর মধ্যে আঙুল চালিয়ে নিরঞ্জন কাকা বললেন, সে চিঠিতে অনুনয় ছিল, মাথার দিব্যি ছিল। ওর জীবনে এক সঙ্কট আসন্ন এমন একটা আভাসও ছিল। জানতাম তো ওর ছেলেমানুষি স্বভাব, আমল দিইনি। রওনা হতে হতেও দু'চার দিন দেরি হয়ে গেল।

আস্তে আস্তে নিরঞ্জন কাকা আবার বললেন, কিন্তু বড্ডো বেশি দেরি দু' মিনিটের দেরিতেও শেষ ফেরি মিস করে লোকে। এ-ও তাই।

রাত্রের গাড়িতেই নিরঞ্জন কাকা ফিরে গেলেন।

লণ্ঠন নিয়ে শুভাশীষ তাঁকে গাড়িতে তুলে দিতে গেল। ফেরবার সময় হাই স্কুলটার বাঁকে. ঝাউ গাছটার নিচে গা-ছমছম অন্ধকার। মরবার আগে ছোট মাসি নিরঞ্জন কাকাকে চিঠি দিয়েছিলেন। কী বলতে চেয়েছিলেন তিনি, নিরঞ্জন কাকাকে? পায়ের কাছে কী একটা ঠেকল। চমকে উঠে শুভাশীষ তুলে দেখল খালি শিশি। তুলে পাশের ডোবাটায় ফেলে দিল।

বুট-বুট-টু-ট—শিশিটা ডুবে যাচ্ছে। সেই শব্দে ছোটমাসির বলতে চাওয়া কিন্তু চিরকালের মতো বলতে না পারা কথাগুলোর প্রতিধ্বনি। ছোটমাসিমা চিঠি লিখেছিলেন। কিন্তু এত লোক থাকতে নিরঞ্জন কাকাকেই বা কেন। আশ্চর্য, এত প্রশ্ন, এত কান্না, ছোটমাসিমার মৃত্যুর আকস্মিকতার বিস্ময়, সব ছাপিয়ে এই কেন-টাই মাথা জাগিয়ে আছে বিমূঢ়, বিশৃঙ্খল ভাবনার ঢেউয়ের ওপর: চিঠি লিখেছিলেন কেন ছোট মাসিমা। লিখেছিলেন যদি, নিরঞ্জনকাকাকে কেন?

•

বাক্স-পেঁটরা খুলে চারু শুভাশীষকে দেখালে, এই দেখ্।

শুভাশীষ দেখল। থাকে থাকে শাড়ি। ভাঁজে ভাঁজে জরির চমক।

—আরো আছে। এই দেখ্।

শুভাশীষ দেখল। থরে থরে গহনা। সোনা, হীরে জড়োয়া। চোখ ঠিকরে ফিরে আসে।

—সব জামাইবাবু দিয়েছে দিদি?

—সব। চারু বলল, এখন বিশ্বাস হ'ল, তোর জামাইবাবু আমাকে ভালোবাসে কি না?

—তোর হাতে এ দাগগুলো কিসের ? আর গলায় ?

আঁচল টেনে দিতে দিতে চারু বললে, গহনার। সোনায় দাগ পড়ে জানিস না ?

গহনার ভারে এমন, এমন গভীর-কালো দাগ ? শুভাশীষের বিস্ময় আর ফুরোয় না, গহনা পরে কালশিটে পড়েছে দিদির গায়ে, না কালশিটে ঢাকতে পরেছে গহনা ?

—এখন বিশ্বাস হ'ল ?

শুভাশীষ সে কথার জবাব না দিয়ে বলল, আর, আর সে কই ?

নামটা মুখে আনতে পারছিল না শুভাশীষ, কেমন একটা সঙ্কোচ। এদিক ওদিক তাকিয়ে চাপা গলায় বলে ফেলল, রোহিণী।

—ওঃ, সে কবে চলে গেছে তীর্থে। তাকে বিদায় করেছি।

কোথায় যেন প্রত্যাশা লুকানো ছিল, শুভাশীষ একটা আঘাত পেল। রোহিণী তবে নেই। থাকলে কী হ'ত। তার সামনে গিয়ে শুভাশীষ কি বুক ফুলিয়ে দাঁড়াত, বলত, এখন সাহস বেড়েছে তার। মা মাসি ছাড়াও—

ছিঃ। অসংযত কল্পনাকে ধমক দিলে শুভাশীষ। ভালোই হয়েছে। দিদি বেঁচেছে। চারুর বুদ্ধির কাছে হার মেনে রোহিণীকে পালাতে হয়েছে, ভেবেও শুভাশীষ সুখ পেল।

—দিদি ?

চারু তাকালো।

—জামাইবাবু এখনও কয়েদীদের মারে না রে ?

—মারে বইকি। রোজই তো ওসব হচ্ছে। এই তো সেদিন একটা মেয়ে আসামীকে—বলতে বলতে চারু থেমে গেল।

—কী দিদি ?

—এমন মার মেরেছিল যে মাগির ছত্রিশ ঘণ্টা জ্ঞানই হয়নি। আবার

পোয়াতী ছিল। এ নিয়ে কত হৈ-চৈ। সদর থেকে তদন্ত। আমরা ক'দিন ভয়ে মরি। শেষটায় দু'কুড়ি টাকা দিতে হ'ল মেয়েটার স্বামীকে,—বখশিস।

—বখশিস, না ঘুষ?

—ওই হ'ল। চারু বললে।

খানিক পরে শুভাশীষ খুব চাপা-গলায় ফিস-ফিস-স্বরে বললে, তুই আমার সঙ্গে যাবি দিদি? মা বলেছেন। মা'র কেমন ধারণা তুই এখানে সুখে নেই। ছোট মাসিমার ব্যাপারটার পর মা আরো মুষড়ে পড়েছেন।

একটু দম নিয়ে শুভাশীষ আবার বললে, সত্যি তো তুই সুখে নেই, দিদি। আমার কাছে শুধুই লুকোচ্ছিস।

চুপ করে শুনল চারু। বাক্সের ডালা বন্ধ করল।

তারপর কিছুক্ষণ আপন মনেই চারু মাথা নাড়ল।

হঠাৎ উত্তেজিত গলায় বলল, যাবো। নিয়ে যাবি আমাকে তুই? বরাবরের মতো,—বরাবরের? বলতে বলতে চারুর চোখ দুটি জলে ভরে উঠল, শুভাশীষের হাত দুটি চেপে ধরে বলল, আমাকে এখান থেকে তুই নিয়ে চল্ ভাই, এখানে আর বেশি দিন থাকলে মরে যাব। দিনের পর দিন কী যে যন্ত্রণা—

—যন্ত্রণা, দিদি?

চারু একথার জবাব দিতে পারলে না, মস্‌মস্ শব্দ করে ভুবনমোহন ততক্ষণ ঘরে ঢুকে পড়েছে। পলকে কেমন বিনম্র, ম্রিয়মান, নিস্তেজ হয়ে গেল চারু, মাথায় ঘোমটা টেনে দেয়াল ঘেঁষে এক পাশে সরে দাঁড়াল।

—শালাবাবু যে, কী খবর?

কী হ'ল শুভাশীষের খাকি কোর্তাপরা এই সবুট দস্তটাকে দেখে

ঘৃণায় সারা শরীর জলে উঠল। উঠে ভুবনমোহনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল, দিদিকে নিয়ে যেতে এসেছি।

দেয়াল ঘেঁষে সরে সরে চারু দরজা দিয়ে কখন বেরিয়ে গেছে। উঁচু গলায় হেসে ভুবনমোহন বললে, নিয়ে যাবে? তা নিয়ে যাবেই তো।

—ঠাট্টা করছেন? সব কটি পেশী কঠিন হয়ে গেছে শুভাশীষের। এই লোকটা যে তার দিদিকে একটা মন্ত্রঃপূত গ্রন্থি দিয়ে বেঁধে রেখেছে,—প্রতিদিন ব্যবহারের নির্মমতায়, শাড়ি-গহনার উপঢৌকন-স্তূপের অসম্মানে যে প্রতিমুহূর্তে লাঞ্ছিত করেছে চারুকে, তার এই অসময়ের পরিহাস শুভাশীষের অসহ্য মনে হ'ল।

—হাসছেন, লজ্জা হচ্ছে না? এক নিঃশ্বাসে শুভাশীষ বলে ফেলল, আপনি শুধু হৃদয়হীন দাম্ভিক নন,—আপনি—

আশ্চর্য ভুবনমোহন রাগ করল না, বুট ঘষল না মেজেয়। আরো খানিক হেসে বলল, হাঁপিয়ো না, আস্তে আস্তে বলো। বলো তো এবার আমি কী।

—আপনি অত্যাচারী। আপনার হাত থেকে দিদিকে আমি বাঁচাব। ওকে এখান থেকে নিয়ে যাব। দম নিয়ে ফুঁসতে ফুঁসতে শুভাশীষ আবার বললে, নিয়ে যাবই।

ভুবনমোহন তবু হাসে। স্বভাবকোপন দারোগার এ এক আশ্চর্য রূপান্তর। —নিয়ে তো যাবেই। আমিও তাই বলছি। নিয়ে যাবে। ভুবনমোহন দরজা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বলল,—এ অবস্থায় সবাই নিয়ে যায়।

তার মানে?

—তার মানে, খুব সোজা। প্রথামবাধ্য,···সব মেয়েই বাপের বাড়ি যায়।

শুভাশীষ তবু বোঝে না। তার মানে?

আরো মানে চাই? ভুবনমোহন করলে কি, দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে হাঁক দিলে, কই গো, শুনে যাও।

চারু এল। মাথায় ঘোমটা। সে-মাথাটিও নুইয়ে মিশিয়ে দিয়েছে বুকে।

—এবারে ছাখো। উহুঁ, পায়ে নয়, মাঝামাঝি তাকাও হে শালা, তা-হলেই বুঝবে। তোমার তো দিদি, লজ্জা কিসের। এবারে বুঝেছ তো। যাও, নিয়ে যাও, সব চুকে টুকে গেলে ফেরৎ দিয়ে যেয়ো—আমার বাসায় মেয়েছেলে নেই। এ সময়ে আবার অনেক ঝামেলা।

শুভাশীষের কান ঝাঁ-ঝাঁ করছিল, সব কথা শুনছিল কিনা সন্দেহ। শুকনো গলায় অনেক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করলে, সত্যি, দিদি?

মাথা তুলে চারু তাকাল। চোখ দু'টি শুধু জলে ঝাপ্‌সা; নিস্পন্দ মুখে একটিও রেখা নেই। প্রায়শোনাযায়না গলায় বললে, তুই একাই যা ভাই।

আর কিছু শোনবার প্রয়োজন ছিল না। এক হাতে সুটকেস-টা কুড়িয়ে নিল শুভাশীষ। তারপর দিদির পায়ের কাছে ঢিপ করে একটা প্রণাম গচ্ছিত রেখে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে এল। একেবারে সদর রাস্তায়। অট্টহাসির মতো ভুবনমোহনের গলা তখন শোনা যাচ্ছে,—কী হ'ল হে,—শালাবাবু, নিয়ে যাবেনা দিদিকে?

* * * *

ট্রেনে বেশি ভীড় ছিল না। বাঙ্কের ওপর শুভাশীষ শুতে জায়গা পেল। মাথা ঝিম ঝিম করছে, গাড়ির দোলানিতে ঘুমও এসেছিল চোখে।

শুভাশীষ স্বপ্ন দেখল।

বরফ-ঝরা রাত্রে বন্ধ ঘরের বাইরে বারান্দায় বসে পথের পাশের

অন্ধকার ঝোপটায় যেন জোনাকির ক্রমাগত জ্বলা নেবা দেখছে। জ্বলা আর নেবা। জ্বালা আর নেবা। নেবা আর জ্বালা। সেই আলোয় দেখতে পেল একটা সাপ একটা ফুলগাছকে পাকে পাকে পিশে ফেলছে। বিষাক্ত শ্বাসে পাপড়িগুলো হলুদ, বিবর্ণ। দেখতে দেখতে চোখে জ্বালা ধরে গেল, বন্ধঘরের কবাটের ফোকর দিয়ে কানে ভেসে এল গোঙানি। বরফের মতো শীতল, কিন্তু মনে কেটে কেটে গেঁথে যাওয়া একঘেয়ে অবিশ্রাম আওয়াজ। ভুবনমোহনের আস্ফালনও শোনা গেল। কয়েদীকে মারছে। চাবুকের শিরশিরে শিষ। আবার গোঙানি।

হঠাৎ দরজা খুলে গেল। ভুবনমোহনের বুটের ধাক্কায় কে ছিটকে এসে পড়ল বারান্দায়। কয়েদী নয়, এ-যে চারু। দিদি, শুভাশীষ সমস্ত শক্তি দিয়ে ডাকতে চেষ্টা করল; চারু সাড়া দিল না। হাঁটুতে মুখ গুঁজে চারু তখনো ফুঁপিয়ে চলেছে। একটানা, একঘেয়ে সেই গোঙানী। একটু পরে আবার দরজা খুলে গেল। ঘরের ভেতর থেকে ভুবনমোহন কী একটা ছুঁড়ে দিল চারুর কোলে। নিস্প্রভ আলোতেও সেটা ঝকঝক করে উঠল। একটা গহনা।

ঘুষ? না, বখশিশ।

সম্মোহিতের মতো শুভাশীষ চেয়ে আছে। গহনাটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল চারু, বুকের কাছে চেপে ধরল। আদরও করল বুঝি একটু। গহনা নয়, এ-যে একটা ছেলে। আশ্চর্য, শুভাশীষ কি এতক্ষণ দেখতে পায়নি।

ছেলেটা ককিয়ে কাঁদছে। থামে না, শান্ত হয়না। ক্লান্ত, লজ্জিত চোখ দুটি তুলে চারু হাসল। শুভাশীষ অবাক হ'ল। বাচ্চাটা ট্যাঁট্যাঁ করছে, আর সে কিনা সেই তখন থেকে ভাবছে এ-গোঙানি চারুর! কত ভুলই মানুষের হয়।

গাড়ির গতি কমে এসেছিল। শুভাশীষ আস্তে আস্তে চোখ মেলে চাইলো। শেকলটা ঠক ঠক করে অবিশ্রাম বাজছে, আর লাইন থেকে লাইনে ছিটকে যাওয়া চাকাগুলোর আবর্তনে নিরবচ্ছিন্ন শব্দের ঝড়। সুর ওঠে, নামে, কিন্তু একেবারে থামেনা।

তারপর কখন গাড়ি থেমেছিল, কখন জংসন স্টেশনে নেমে পড়েছিল মনে নেই। আরো দু'ঘণ্টা পরে ফরিদপুর লাইনের গাড়ি।

খোলা মাঠের মধ্যে স্টেশন। এখন শেষ রাতের হু-হু হাওয়া! রাত জেগে জেগে কয়েকটি সিগন্যালের চোখ লাল; কতগুলো এখনো শাদা, আকাশের তারার সহোদর। ওই দিকে তাকিয়ে প্ল্যাটফর্মটা চষে ফেলা-ছাড়া উপায় নেই। নীচু ক্লাশের মুসাফিরখানা প্ল্যাটফর্ম থেকে বেশ খানিকটা ভেতরে। প্লাটফর্ম ঘেঁষেই কুলীগুলো আগাগোড়া মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। শুভাশীষ শিউরে উঠল, গাড়ি যদি এখুনি এসে পড়ে, হঠাৎ?

কিন্তু গাড়ি এলে তো হঠাৎ আসেনা; প্রথমে ঘণ্টা পড়ে, সিগন্যাল হেলে; তারপর মাটি থরথর করে কাঁপে; আবহমন্দিরে দূরের মৃদু ভূকম্পের মতো ঘুমন্ত কুলীদের কানে সেটা ধরা পড়ে। মুহূর্তে প্রাণ পেয়ে জেগে ওঠা সুপ্তপুরীর সৈনিকদের মতো একসঙ্গে উঠে বসে। ততক্ষণে প্লাটফর্মটাও কাঁপছে, কাঁপছে স্টেশন বাড়িটাও। গাড়ি এসে পড়ল।

উঁচু ক্লাসের ওএটিং রুমে টিম টিমে একটা আলো এখনো জলছে। শুভাশীষ উকি দিয়ে দেখল লম্বা ইজিচেয়ারটায় টান হয়ে শুয়ে এক লালমুখো সাহেব একটা চুরুট ধরিয়েছেন। পাশের টেবিলে গ্লাস বোতল সব মজুত। পায়ের কাছে একটা অতিকায় কুকুর কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে। একটু দূরে সাহেবের উর্দিপরা আর্দালিটা ঠক ঠক করে কাঁপছে। কে জানে শীতে না ভয়ে। শুভাশীষ আর ঢুকতে সাহস পেলনা।

ওভারব্রীজ থেকে ওভারব্রীজ। হেঁটে হেঁটে পা ধরে গেল, পথ ফুরোয়, সময় ফুরোয়না। সিগন্যালের ক্লান্ত-লাল আলোর দিকে চেয়ে চেয়ে চোখে জ্বালা ধরে গেল, গাড়ি আসার জানান শোনা গেল তখন।

বাড়িতে এসে যখন পৌছল, তখন হিমে গাল-গলা ফোলা-ফোলা, সারা-শরীরে প্রবল উত্তাপ, লাল সিগন্যালের দিকে চেয়ে থেকে থেকে জ্বালাকরা চোখ দুটিও টকটকে লাল।

মা বললেন, এ কী, রে।

শুভাশীষ কোন জবাব দিলনা। সটান বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল।

জ্বরে বেহুঁশ হয়ে ছিল বোধ হয় দিন চারেক। তারপর জ্বর গেল, দুর্বলতা গেলনা। সামনে পরীক্ষা, সেজন্যেও তৈরি হতে হবে।

বেশ ক'দিন কেটে যাবার পর মা জিজ্ঞাসা করলেন, কীরে, চারুকে কেমন দেখে এলি।

সেই প্রশ্ন। এ ক'দিন জ্বরের ঘরেও এই প্রশ্নটা আশঙ্কা করে শুভাশীষের বুক ঢিপ ঢিপ করেছে। মাথার কাছে বসে মা হাওয়া করছেন, স্বস্তি পায়নি। হয়ত মা সুযোগের অপেক্ষায় আছেন। চারুকে কেমন দেখে এলি—কথাটা পাড়লেন বলে। কপালের জল-পটি শুকিয়ে উঠেছে। এই প্রশ্নটা শুনতে চায়নি শুভাশীষ, বালিশে মুখ গুঁজে প্রার্থনা করেছে, এ-জ্বর যদি না সারে, না সারুক, তবু যেন এ-প্রশ্ন না শুনতে হয়।

সেই প্রশ্ন এলো আজ।

—চারুকে কেমন দেখে এলি? মা আবার জিজ্ঞাসা করলেন।

—ভালোই, মা।

—ভালো তো বুঝলাম। তবু বল।

—সুখেই আছে। দিদির ছেলেপুলে হবে মা। শুভাশীষ এক নিঃশ্বাসে বলতে পেরে হালকা হয়ে গেল। জ্বর ছেড়ে যাওয়ার চেয়ে এ কম স্বস্তি নয়।

—ছেলেপুলে হবে? মা নিজেই আবৃত্তি করলেন কথাটা, খুশি হয়েছেন কিনা বোঝা গেলনা। তারপরে বললেন, তুই তবে ওকে নিয়ে এলিনে কেন। এ-সময়ে আমার কাছে থাকতো;—ওর ছেলেপুলে হবে জেনেও তুই নিয়ে এলিনে?

এ প্রশ্নের জবাব নেই। শুভাশীষ নিজেই কি জানে, কেন সে দিদিকে নিয়ে এলোনা। মাকে কী করে বোঝাবে, দিদির ছেলেপুলে হবে জেনেও সে নিয়ে আসেনি কেন। শুভাশীষ নিজেও জানেনা। কেন সেদিন খবরটা শুনেই মাথার ভেতরে সব গোলমাল হয়ে গিয়েছিল, ছুটে এসেছিল সেখান থেকে, জানে না। মাঝে মাঝে মানুষ এমন খামখেয়ালিও করে। যুক্তি নেই আচরণের, কোন সঙ্গত কৈফিয়ৎও তার মুখে যোগাবে না, তবু নিজের কাছে নিজেকে অপরাধী কিছুতে ভাবতে পারে না। বেশ করেছি, সেদিন ও-ভাবে চলে না এসে উপায় ছিল না। এতদিনের জ্বরের বিকারে আর কিছু মনে নেই, কিন্তু কিছুতেই ভুলতে পারছেনা ভুবনমোহনের দম্ভ, দিদিকে নিয়ে কুরুচিপূর্ণ হাসাহাসি।

ষোলো

সেই বছরই দাদু মারা গিয়েছিলেন, মনে আছে। পরিণত বয়সের মৃত্যু, ধীরে ধীরে তেল ফুরিয়ে সলতে পুড়ে যাওয়ার মতো। ছোট মাসিমার মতো দমকা হাওয়ায় হঠাৎ নিবে যাওয়া নয়। শীত কালেই কাশি হয়েছিল, সর্দি, জ্বর। প্রথমে কবিরাজ দেখতেন, বাড়াবাড়ি হতে ডাক্তার এলেন; বাড়াবাড়ি কমল কিন্তু অসুখ সারল না। শেষ পর্যন্ত কবিরাজ আবার এলেন অনুপানের ওপর অনুপানের সঙ্গে মিলিয়ে ওষুধ

চলল, আয়াসী চিকিৎসা, আয়েসীও। দাঁড় নড়ে না, পালে চলেনা, এখন শুধু গুন টেনে টেনে শরীরটাকে যতদূর নিয়ে যাওয়া যয়।

বেশিদূর গেলনা। সেবারে বৈশাখের শুরু থেকেই ঝড় বৃষ্টি। বাইরের দর্মার বেড়াটা ঝড়ে ফুলে ফুলে ওঠে, সেই সঙ্গে দাদুও কাঁপেন। বিছানা ছেড়ে কিছুদিন থেকেই উঠছেন না, অস্বস্তি হলে শুধু পাশ ফেরেন। কালো ছায়া পড়েছিল দাদুর চোখে। তরী ভাসিয়ে দিয়ে যেতে হবে এই ভয়ে, নাকি সে ছায়া আসন্ন মৃত্যুর। প্রতীক্ষা মাত্রই দুঃসহ, সে প্রতীক্ষা যদি আনন্দের হয়, তবু। মৃত্যুর প্রতীক্ষা তো আরো দুঃসহ। বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক হয়ে যাবার পর চারুর মধ্যেও শুভাশীষ এই অস্বস্তির সুতোয় গাঁথা চঞ্চলতা দেখেছে। প্রতি মুহূর্তে সাজতো চারু, শাড়ি বদল করত, তবু সেই বিদ্যুৎ-অস্থির চোখ দুটোতে মাঝে মাঝে ছায়া পড়ত। শুভাশীষ জানে ভয়ে।

সেই একই ভয় দাদুর। প্রায় সত্তর বছর আগে পৃথিবীতে এসেছেন। পঞ্চাশ বছর আগে প্রথম যৌবন এল, সেটা জীবনকে সমগ্র ভাবে গ্রহণ করার প্রস্তুতি। তাতে আনন্দ ছিল, আগামী কাল সম্পর্কে ঔৎসুক্য ছিল। তারপর একে একে সব এসেছে, সব গেছে। জীবন সম্পর্কে ঔৎসুক্য গেছে, কিন্তু মায়া ফুরোয়নি তো। আজ আর কিছু বাকি নেই। আধময়লা বিছানার চাদরে নিঃশেষে মিশে গিয়ে মৃত্যুর প্রতীক্ষা। সব চেয়ে দুঃসহ অন্য সব প্রতীক্ষার শেষে কী থাকে তাও জানা যায়। জানা যায়না মৃত্যুকে। এই-যে রোজ নিজেকে তিলে তিলে তৈরি করছেন মৃত্যুর জন্য, আসন্নপরিণয় কুমারী যেমন তৈরি করে শরীর, মন, কিন্তু যখন সে আসবে তখন জানা যাবে না। তিনি তো জানবেন না সব কিছু জানা যায়, যায়না মৃত্যুকে।

মাসিমা মাকে বললেন, চারুকে আসতে চিঠি লিখে দি ?

মা বললেন, থাক। নিজে ছেলে সংসার নিয়ে ব্যস্ত। এখানে আসবে কী।

একটা ছেলে হয়েছে চারুর। সে-খবর এখানে এসেছে চিঠিতে। চারুকে শেষ পর্যন্ত মা আনেন নি। দাদুর অসুখ, তা' ছাড়া চারুও জানিয়েছিল, ওখানে তার কোন অসুবিধে নেই। সংসারের কোন খাটুনি তাকে খাটতে হয় না। সর্বক্ষণ দেখা শোনা করবার জন্যে ওখানকার চ্যারিটেব্‌ল্‌ হাসপাতালের দু'জন নার্স রেখে দিয়েছে ভুবনমোহন।

দু'জন নার্স? একটা লোককে দেখা শোনা করার জন্যে দু'জন লোক কেন। প্রথমে শুভাশীষ অবাক হয়েছিল। প্রথমে মনে হয়েছিল এ-ও বুঝি ভুবনমোহনের দারোগাদম্ভ; ভারি ওজনের বুট দিয়ে শব্দ করে মাটিতে পা ফেলার মতো। তার পরে আরো একটা কথা মনে হয়েছিল, এবং মনে হবার পরে শুভাশীষ আর স্বস্তি পায়নি,—রোহিণী নেই, চারুর অসুখের ছুতোয় ভুবনমোহন আরো দু'টি স্ত্রীলোককে বাড়ীতে এনে ঠাঁই দেয়নি তো। কিন্তু এ-সব কথা শুধু ভাবাই চলে। কাউকে বলা চলে না।

ছেলে হবার খবর দিয়েছিল ভুবনমোহন। তারও অনেকদিন পরে, একটু সেরে উঠে, চিঠি দিয়েছিল চারু। এখন তো সব ভালোয় ভালোয় হয়ে গেল, এবার এখানে আসতে চায় চারু। কাউকে পাঠাতে হবে না। চারু নিজেই আসতে পারে। ভুবনমোহনের অবিশ্যি ছুটি নেই। কিন্তু থানায় জমাদার নেই? সিপাই নেই? লোকের অভাব কী চারুর।

মা তবু চারুকে আসতে লিখলেন না। এই-তো সবে কোলে একটা এলো। সংসারে মন বসুক। ভুবনের মন বসুক ঘরে। দাদুর অসুখের বাড়াবাড়ি ঠিক। কিন্তু মাসিমা আছেন, মা আছেন। পরিচর্যার ত্রুটি নেই। এর মধ্যে চারু এসে করবে কী।

—আর, আর, জামাইবাবুর একটা খবর নিবিনা? মাসিমা ইতস্তত করে মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

মা এবারেও বলেছিলেন, না।

আশ্চর্য মনের জোর মার। এখানকার ভরসার মধ্যে তো একটি বৃদ্ধ, আরেকটি শিশু। তবু এতটুকু টলছেন না। কাউকে তাঁর দরকার নেই। প্রয়োজন হয় তো দু'টিমাত্র স্ত্রীলোকে মিলেও সংসারটাকে চালিয়ে নেবেন ঠিক।

রগফুলেওঠা আঙুল দিয়ে বালিশটা চেপে ধরে দাদু কাসছেন। তক্তপোষটা কাঁপছে থর থর করে। মা পায়ের কাছে। মাসিমা মুখের সামনে খল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। এই ধাক্কাই বুঝি শেষ। এই ওষুধটুকু আর দিতে পারা যাবে কিনা কে জানে। না, থেমে এসেছে। আস্তে আস্তে, স্তিমিত হয়ে আসছে কাশির বেগটা। বালিশটা প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে দাদু সামলে নিলেন। খানিক পরে ইশারায় ওষুধটুকু চেয়ে নিয়ে চেটেও খেলেন। এখুনি হয়ত ঘুমিয়ে পড়বেন। একটা ধাক্কা কেটে গেল।

পা টিপে টিপে শুভাশীষ এলো বারান্দায়। এখান থেকে অনেকদূর অবধি দেখা যায়। মিউনিসিপ্যাল সড়কটার বাঁক অবধি; তার পরেই ঝাউ আর রেন্ ট্রি সব আড়াল করে দিয়েছে। হঠাৎ কেউ এসে চোখ-দুটি চেপে ধরে 'বলো-তো আমি কে' বলার মতো; বলো তো এর পরে কী।

শুভাশীষ জানে এর পরে কী। এর পরে রাস্তাটার বাঁক, ইস্কুল, আরো পরে রেল লাইন ঘেঁষে ঘেঁষে এসে ষ্টেশনের কাছে রাস্তাটা মিশে গেছে। এই রাস্তার সবটুকু শুভাশীষের মুখস্ত। কোন্‌খানে একটা খোয়া উঁচু হয়ে আছে, কোনখানে কালভার্ট, রাস্তার পাশে কোন্‌খানে আগাছা। তবু—তো এখন আর বেড়ানো হয় না। দাদুর অসুখের জন্য সারাক্ষণ বাসায় থাকতে হয়।

আর বেরুবেই বা কোথায়। এ পাড়ার হাট তো ভেঙেছে সরমাদি

যেদিন থেকে নেই, সেদিন থেকেই। ননী বরফকলে কাজ নিয়েছে। রুচিদির কাছে গেলে মাঝে মাঝে পিয়ানো শোনা যায় বটে, কিন্তু ভাল লাগেনা। বাজনার সময় ঘরে আলো জ্বালতে দেননা রুচিদি। নিঃসঙ্গ একটি মোমবাতি জ্বলে। অন্ধকারেই আঙুল চলে রুচিদির অশ্রান্ত অনর্গল শব্দের ঝড় ওঠে। আর কি আশ্চর্য, সুরের কখনো তীব্র কখনো স্তিমিত প্রবাহের মধ্যে শুভাশীষ যেন ফিরিঙ্গি জনসনের স্খলিত মত্ত কণ্ঠের প্রলাপ শুনতে পায়।

বলা কওয়া নেই, চারু নিজেই একদিন এলো। পাল্কির পাশে পাশে হেঁটে এসেছে দু'জন সিপাই।

মাসিমা নিজে গিয়ে চারুকে নামিয়ে নিয়ে এলেন। একটা চিঠিও তো দিতে হয়, এমন একটা অনুযোগ করলে বুঝি। চারু শুধু হাসল।

শরীর সেরেছে চারুর। খুশি-খুশি ভরা-ভরা দেখাচ্ছে। কোল ভরে একটা ছেলে। ছেলেটাকে মার কাছে তুলে দিয়ে চারু প্রণাম করল সবাইকে। শুভাশীষ সামনে এলো না।

ওই ছেলে চারুর। কে জানে এ ঈর্ষা শুভাশীষের কেন। হৃষ্টপুষ্ট ছেলে কিন্তু শুভাশীষের মনে হ'ল, ওতো শুধু একতাল মাংস। নাক চোখ সব ঢেকে গেছে স্বাস্থ্যে নির্বোধ চোখে এদিকে ওদিকে তাকাচ্ছে। একে পেয়েই চারু এত খুশি।

চারু ওঘরে বসে মাকে শ্বশুরবাড়ির গল্প বলছে। তোমার জামাই-ই নিজে থেকে পাঠিয়ে দিলে মা। বললে, যাও দাদুকে দেখে এসো।

আরো কতো-যে কথা। না ফুরোয় মার শোনা, না ফুরোয় চারুর গল্প।

—তোমার জামাই নিজেই আসত। কিন্তু জানোতো সময় পায়না একটু। চুরি চামারি ডাকাতি এ সব তো লেগেই আছে। একদিন যায়, হয়ত আর দিন দুই আর খবর নেই। আমরা ভয়ে মরি। একবার

তো শেষ বুলেটটি খরচ করে ডাকাতদের সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে ফিরে এসেছে।

—ফিরে এসেছে তো। তোর ভাগ্য। মা বললেন।

—শুধু ফিরে আসেনি, ডাকাতগুলোকে বেঁধেও এনেছে। আঃ মা, সেগুলোর চেহারা যদি তুমি দেখতে। ইয়া কালো, জোয়ান, হাতে কড়ি, পায়ে বেড়ি, দশটা সিপাই তাদের হাজতে ঢোকাতে পারেনি।

—যাক, জামাই আজকাল তোকে ভালবাসে তো। মা শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করেছেন।

—বাসে মা। মাথা নীচু করে চারু বলেছে। বুকের কাছে বাচ্চাটাকে চেপে ধরে।—সব চেয়ে ভালবাসে এটাকে। এই তো এক রত্তি মানুষ। এর যে কত পোষাক আছে না। রোজই আসছে। একটা পোষাক আবার খাকির,—দারোগাদের যেমন থাকে। ওটা পরিয়ে কোলে তুলে আদর করেন,—আদর করে ডাকেন ছোট দারোগা বলে। দারোগার বেটা দারোগা।

বলে চারু হাসল।

পাশের ঘরে বসে বসে শুনছে শুভাশীষ। রাগে দাঁত ঘষছে। এরি মধ্যে কি সব ভুলে গেছে চারু, সব ?

সন্ধ্যার পর চারুর মুখোমুখি পড়ে যেতেই হ'ল।

—কীরে খোকা, এতক্ষণ কোথায় ছিলি ? চারু জিজ্ঞাসা করলে।—সিনেমা দেখতে গিয়েছিলি বুঝি। ও, এখানে তো আবার সিনেমা নেই।

—তোদের ওখানে আছে বুঝি, মা জিজ্ঞাসা করলেন।

—আমাদের ওখানে নেই, সদরে আছে, জেলা সদরে। আমরা মাঝে মাঝে যাই যে। উনি পাশ পান, পুলিশ কিনা। ডগ্‌লাসফেয়ারব্যাঙ্ক্‌স, মরিস শিভলিয়র নাম শুনেছিস ?

এ-ও পুরুনো ফন্দী চারুর। অনেক বাজে কথা বলে আসল কথা

এড়িয়ে যেতে চায়। কিন্তু শুভাশীষ কি ভুলবে অতো সহজেই। মা চলে যেতেই শুভাশীষ জিজ্ঞাসা করল, তুই চলে এলি, জামাইবাবুকে এখন দেখাশোনা করবে কে?

—বাঃরে, লোক নেই? ঝি-চাকর, সিপাই-পেয়াদা। তা, ছাড়া দু'দুজন নার্স।

—নার্স দু'টো এখনো যায়নি দিদি? শুভাশীষের কণ্ঠ কঠিন হয়ে এলো।

—গেল আর কই। হাই তুলে চারু বললে।—যেতে দিলুম কই। বাচ্চাটা হতে যা কষ্ট। তারপরে অনেক দিন ধরে জ্বরে ভুগলুম। ওদের আর যাওয়া হ'লনা।

সব বুঝতে পারছে শুভাশীষ। ভুবনমোহনের ষড়যন্ত্রটা পরিষ্কার হয়ে আসছে। বললে, ওরা দু'জনে বাসায় রয়েছে, তুই জামাইবাবুকে ফেলে এলি?

—কী আর হবে, নিশ্চিন্ত, তৃপ্ত গলায় চারু বললে,—কতদূর আর হবে। আমাকে তুই ভাবিস কী। আমার ক্ষতি করে সাধ্য কার। রোহিণীকে তাড়াইনি আমি?

একটু থেমে অল্প হেসে চারু বললে,—আর পুলিশের লোক, যুধিষ্ঠির হবে না, সেতো জানা কথাই। আমি তো জানি, আসল জায়গায় ঠিক আছে। গলায় একটু গর্বের বিচিত্র ছোঁওয়া এনে চারু বললে, ওরা যা খুসি করুক, তোর জামাইবাবুকে ছেলে তো দিতে সাহস করবে না। ওইখানেই আমার জিত। আর,—গলাটা একেবারে নামিয়ে এনে চারু বললে,—আর, ওদের কাছে তোর জামাইবাবু ছেলে চাইতেও পারবে না। ওরা আইনের রক্ষক কিনা; এমনিতে যা করুক, বে-আইনি কিছু করবে না। বুঝলি?

নির্লজ্জের মতো বাচ্চাটাকে দুধ দিতে লাগল চারু। ওর সবকিছু ভরসার শিকড় ওইখানে।

সিপাই দুটো পরদিন সকালেই চলে গেল।

দাদু মারা গেলেন তারো তিন দিন পরে।

তিন দিনের কাজ চুকে যেতে চারু বললে, মা বাবাকে এবার খবর দাও।

মা জবাব দিলেন না। মাসিমা বললেন, দিতে তো চাই কিন্তু ঠিকানা পাই কোথায়।

—ঠিকানা জোগাড় করা আর শক্ত কী। কংগ্রেস অফিসটফিসের কেয়ারে চিঠি দিলেই হবে।

—জেলের বাইরে থাকলেতো।

—বাইরেই আছেন। এখনো কোন গোলমাল হয়নি তো; তাছাড়া বাবার সঙ্গে সরমাদিও তো আছেন। চারু আরও কী বলতে যাচ্ছিল, মার চোখে চোখ পড়তে চুপ করে গেল। এবার শ্বশুরবাড়ি থেকে চারু প্রগলভ হয়ে এসেছে। কোথায় কী বলতে হয়, ভুলে গেছে।

সামলে নিয়ে চারু বললে, গোলমাল হয়নি, তবে হবে। ওঁর কাছে শুনি তো। আবার নাকি স্বদেশি শুরু হবে। জেলখানা থেকে কয়েদীদের সরানো হচ্ছে, স্বদেশিওয়ালাদের এনে পুরবে বলে। ওদিকে তো মীটিং টিটিং শুরু হয়ে গেছে। মাঠে মাঠে বক্তৃতা, আর বন্দেমাতরম্। এদিকে শুরু হয়নি রে?

শুভাশীষ কোন জবাব দিলেনা।

ক'দিন থেকেই শুভাশীষ গম্ভীর হয়ে গেছে। দাদুর অন্ত্যেষ্টির সময় নিজের হাতে মুখাগ্নি করতে হয়েছিল। সেই চিতাধূমের ঔদাস্য লেগেছে

মনেও। অন্য উত্তরাধিকারীর অভাবে শ্রাদ্ধও করেছে সে নিজেই। মধু বাতা সতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বীর্নঃ সন্তোষধিঃ। মধু নক্তং উতোষত, মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। কিন্তু আশ্চর্য শ্রাদ্ধের মন্ত্র কিছুই মধুময় করতে পারেনি। সারাক্ষণ মন ভারি হয়ে আছে।

চারু চলে গেছে। যাবার সময় ওদের সবাইকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। এখানে থেকে কী করবে মা। এখানে কে আছে। আমার সঙ্গে চলো।

মা উত্তর দিলেন না। শুভাশীষ দূর গলায় বললে, না।

চারু একাই গেল।

মাসিমা গোপনে বুঝি নিরঞ্জন কাকাকে চিঠি দিয়েছিলেন দেবাশীষের খবর নিতে। কিন্তু দেবাশীষ এলো না। নিরঞ্জন কাকা বুঝি সন্ধানই পাননি। তিনি জবাবে মাসিমাকে এখান থেকে নিয়ে যেতে চাইলেন। তুমি চলে এসো বৌদি।

মাসিমা মার দিকে তাকালেন। মা বললেন, তুই যা। আমি যাবোনা।

কিন্তু এখানে চলে কিসে। সামান্য সঞ্চয়, চারুর বিয়ের পর অবশিষ্ট বিশেষ কিছু ছিলনা, উবে গেছে দু'দিনেই। শুভাশীষ মানুষ হবে,— সেতো ঢের দেরি। ওর এখনো ইস্কুলের পড়াই শেষ হ'ল না।

কিন্তু মা তবু ভরসা করে আছেন। কে জানে কিসের ভরসা। আয়ুর শেষ আছে, স্বাস্থ্য ফুরোয়, টাকার খরচ আছে। কিন্তু মার মনের জোরের যেন খরচ নেই।

সতেরো

অনেক রকম সম্ভাবনার কথা শুভাশীষের মনে এসেছে, এই একটি ছাড়া। কেন যে ঘুম ভেঙেছিল মনে নেই। হয়ত গা থেকে লেপ সরে গিয়েছিল। স্বপ্নে ভয় পেয়েও থাকতে পারে। মিট মিট করে তাকিয়ে-

ছিল এদিকে ওদিকে। মাকে দেখা যায়নি। আন্দাজেই গোটা বিছানাটা হাতড়ালে। শেষে ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল : মা।

সিলিংয়ের উপর দিয়ে একটা ইঁদুর মচমচ করে দ্রুত পায়ে হেঁটে গেল। টেবিলের ওপর থেকে বিনিদ্র পোষা বেড়ালটা লাফিয়ে পড়ল মেজেয়। পেয়ারা গাছের ডাল থেকে একটা বাদুড়ের পলাতক ডানার শব্দ এলো ; ঠোকরানো একটা ফল ঝুপ করে পড়ল পাশের ডোবায়।

অনেক দূরে, একটা বেহায়া ওয়াগন বিরক্ত ইঞ্জিনের বাফার-হাতের ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ল সাইডিংয়ে। টিনের চালাটা বিজ্ঞানের নিয়মে সঙ্কুচিত হল : স্ক্রুয়ে ওয়াসারে মিলে আওয়াজ উঠল।

এমনি আরো কত শব্দ যে কানে এলো হিসেব নেই। মিহি মোটা, উঁচু মৃদু। এমন কি ছেঁড়া মশারির ফাঁক পেয়ে খুসি একটা মশাও বার কয়েক গুণ গুণ করে গেল।

সব যখন ঘুমিয়ে পড়ে, তখনো কি এত শব্দ বেঁচে থাকে পৃথিবীতে। সবাইকে লুকানো, সকলের চোখ পালানো এমন বিচিত্র কর্মব্যস্ততা? অনেকক্ষণ ধরে শুভাশীষ শুনল। শুধু সাড়া এলো না মার। প্রথমে মনে করেছিল, মা বাইরে গেছেন, এক্ষুনি ফিরবেন হয়ত। কিন্তু মিনিটের পর মিনিট কেটে গেল, এক বাদুড় পালালো, আর এক বাদুড় এসে বসল পেয়ারা গাছের ডালে, তবু মা ফিরলেন না।

ধড় মড় করে শুভাশীষ উঠে বসল বিছানায়। ওই তো একটু দূরে আর একটা খাট, যার ওপর ন্যাড়া গদিটা পড়ে আছে। ওই খাটে সেদিন অবধি দাদু শুয়েছেন। অস্পষ্ট ছায়ায় যেন দাদুর বয়সজীর্ণ দেহটাকে দেখতে পাওয়া গেল। ওই দেহটা এখুনি পাশ ফিরবে কি, দাড়িতে ঢাকা ঠোঁট দুটি নাড়িয়ে দাদু ইশারায় জল খেতে চাইবেন? মরবার দু'দিন আগেও শুভাশীষের কাছে যেমন চেয়েছিলেন? ভয়ে শরীর কাঠ হয়ে গেছে, তবু শুভাশীষ সাহস করে বিছানায় হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে

এগিয়ে পায়ের কাছের জানালাটা খুলে ফেলল। ভয় তবু ঘুচল না। বন্ধ ঘরে তবু একটিমাত্র খাট ছিল, সেই খাটে ছিল একটি মাত্র ছায়া, কিন্তু বাইরের পৃথিবী থেকে হাজার ছায়া যেন জানালার শিকের ভেতর দিয়ে হাত গলিয়ে দিল। মিশন কম্পাউণ্ডের ইউক্যালিপটাসের পিছনের মাঠ ঝাউঝাপসা। তার পিছনে, বিলের ধারে ওটা কি! তালগাছ। অন্ধকার, কিন্তু শুভাশীষ জানে ওদের মাথার ঠিক নীচে ক্ষত, সেখান থেকে পুঁজের মতো গড়াচ্ছে। গলায় দড়ি কলসী, ঘায়ের জ্বালায় বিলের জলে ডুবে মরবার মৎলব নাকি।

এখনো রাত আছে, শেষ তারাটি আকাশে জ্বলজ্বল। ভোর হবার ভয়ে চাঁদের মুখ এখনো শুকিয়ে সাদা হয়ে যায়নি।

চাঁদের কপালে চাঁদ টিপ দিয়ে যা। ছেলে বেলায় ঘুম পাড়াতেন মা। **টিপ** কথাটা বোতাম লাগানোর মতো এমন ছোট্ট করে বলতেন না। টেনে টেনে বলতেন টি-ই-প দিয়ে যা। একথাটা আজ মনে না পড়লেও চলত, গা যখন ভয়ে ছমছম ; তবু চাঁদ দেখে মনে পড়ল।

টিপ দিয়ে যা। চাঁদই তো আকাশের টিপ, চাঁদের আবার টিপ কী।

কখন শুভাশীষ আবার ঘুমিয়ে পড়েছিল! কতক্ষণ ঘুমিয়েছিল মনে নেই। ঘুম ভেঙ্গে মাকে শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অবাক হ'ল।

—খোকা, এই খোকা। বালিশ ছেড়ে এদিকে মাথা দিয়ে শুয়েছিস কেন। জানালাটাই বা কখন খুললি। বৃষ্টিতে তোষক চাদর ভিজে গেছে, তবু খেয়াল নেই ?

ঘুমভাঙা, ধরাধরা গলায় শুভাশীষ শুধু জিজ্ঞাসা করল, বৃষ্টি হয়েছিল বুঝি মা ?

এরি মধ্যে বেলা হয়ে গেছে। বিছানা ছেড়ে উঠে শুভাশীষ অন্য দিনের সঙ্গে আজকের কোন তফাৎ দেখতে পেল না। মা রোজকার

মতোই ঘর ঝাঁট দিয়ে, উঠোন নিকিয়ে বাড়িটাকে ঝকঝকে করে ফেলেছেন, উনুনে আঁচ পর্যন্ত দেওয়া হয়ে গেছে।

কখন ফিরলেন মা। এত কাজ করলেনই বা কখন। একবার মনে হ'ল হয়ত সবটাই ভুল, স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে উঠে মাকে দেখতে পায়নি নয়, মাকে দেখতে না পাওয়াটাও ঘটেছে স্বপ্নে। কিন্তু জানালা খোলা ? বৃষ্টিতে বিছানা ভিজে যাওয়া, এগুলো তো স্বপ্ন নয়। তবে ?

শুভাশীষের বিস্ময় গেল না, তবু মাকে জিজ্ঞাসা করলে না কিছু। মুড়ি খেয়ে বললে, বাজারের পয়সা দাও মা।

পয়সা ? মা বললেন, আজ আর বাজারে যাস না খোকা। আজ মাছ খায় না।

মাছ খায় না কেন ? পাঁজিতে লেখা আছে কেন ? এ কেন-র উত্তর না দিয়ে মা বললেন, তার চেয়ে তুই এক কাজ কর খোকা, পুকুর থেকে গোটা কতক কলমী শাক তুলে নিয়ে আয় দেখি। আজ শাক খেতে ভারি ইচ্ছে করছে।

—কলমী শাক খেতে আমার ভাল লাগে না মা। গা বমি বমি করে।

—করে নাকি। মা এগিয়ে এসে শুভাশীষের কপালে হাত রেখে বললেন, তবে তো তোর আরো বেশি করে শাক খাওয়া উচিত। নিশ্চয়ই পিত্তের দোষ হয়েছে।

শুভাশীষ বুঝে নিয়েছিল। পরদিন সকালে মা যখন হাত বাক্স ঘাঁটাঘাঁটি করে দু আনা পয়সা ওর হাতে দিয়ে বললেন, যা তো খোকা, চট করে বাজার থেকে কিছু নিয়ে আয় ; শুভাশীষ ফস করে বলে বসল, আজ তো বাজার বসবে না মা। আজ হরতাল।

—হরতাল ? কেন।

—কী জানি কেন। কাল সন্ধ্যাবেলা কালীবাড়ির ওখানে সবাই বলাবলি করছিল।

মা ছেলের চোখের দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকলেন। কিছু বললেন না।

তারপর আরো একদিন শুভাশীষ শেষ রাতে মাকে বেরিয়ে যেতে দেখেছে। খুট করে শব্দ হ'ল দরজা খোলার বাইরে, সন্তর্পণে দরজাটা আবার ভেজিয়ে দেওয়ার আওয়াজও এলো। শুভাশীষ একবার ভাবলে, মাকে ডাকে। জিজ্ঞাসা করে কোথায় যাচ্ছো মা। কিন্তু গলা দিয়ে স্বর ফুটল না। সেই সঙ্কোচ, যার জন্যে প্রথম দিনও মাকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারেনি!

সেদিন আর সে রকম ভয় করল না বটে, কিন্তু ঘুমও এলো না। সেই পুরনো, চেনা শব্দগুলো এল একে একে : শীতে গায়ে কাঁটা দেওয়া, টিনের চালের অস্ফুট আর্তস্বর ; ইঁদুরের খোঁজ পেয়ে অনিদ্র লুব্ধ বেড়ালের মেঝের ওপর ঝুপ করে লাফিয়ে পড়া ; মজে আসা ডোবাটার বাদুড়ের অসতর্ক ঠোঁট থেকে খসেপড়া পেয়ারা টুপ করে গিলে ফেলা ; আর, অনেক—অনেক দূরে কোথায় শেষ রাতের ডাক গাড়ির অসহিষ্ণু ইঞ্জিন অন্যমনস্ক সিগ্ন্যালটাকে বাষ্পশক্তির কাছে মাথা নোয়াতে বলছে।

আস্তে আস্তে রাত পুইয়ে এল। ফুটো দর্মার ফাঁক দিয়ে সকালের প্রথম আলো আড়াআড়ি ভাবে অনেকগুলো ধোঁয়াধোঁয়া ছায়াস্তম্ভ ফেললে ঘরের মধ্যে।

সদর দরজা আবার খুলল। মা ফিরেছেন। প্রথমে কুয়োর জলে মুখ ধুলেন। তারপর থেকে থেকে উঠোনে জল পড়ার শব্দ পাওয়া গেল।

মা উঠোনে গোবরছড়া দিচ্ছেন।

আবার সারাদিন যথানিয়মে সব কাজ চলল বটে, কিন্তু শুভাশীষের

অস্বস্তি গেলনা। কোথায় যান মা সকালে, রোজই কি যান? যান যদি, কোথায়। কেন।

কত রকম সম্ভাবনার কথাই মনে এলো। পুকুর ঘাটে যান না নিশ্চয়ই, এত রাত্তিরে, যখন সাপের ভয়। তবে। কী এমন কাজ থাকতে পারে মার। কী কী। কী। ভাবতে মাথার রগ দপ দপ করতে লাগল, স্নায়ুগুলো সেতারের তার ছেঁড়ার মতো ঝন ঝন করে যেন বেজে উঠল। কী এমন কাজ, যা শুভাশীষও জানে না। যা ছেলেকেও বলা চলে না।

তবে কি—

সেদিন আর শুভাশীষ ঘুমুতে পারল না। চোখের পাতা মাঝে মাঝে বুজে এসেছে, আবার বিছানাটা নড়ে ওঠার সামান্যতম আভাসেই তন্দ্রা ছুটে গেছে। মা উঠলেন নাকি। না, এই যে মা এখনো তার পাশেই। দীর্ঘ প্রশ্বাসের শব্দে গভীর ঘুমের ইঙ্গিত।

মাঝে মাঝে ঘুমিয়ে পড়ে, মাঝে মাঝে ঘুম ছুটে যায়, এমনি ভাবে কতক্ষণ যে কাটলো। শেষে কখন একসময় মা উঠলেন। দরজাটা খুললেন সন্তর্পণে ভেজিয়েও দিলেন, কিন্তু শুভাশীষও উঠে পড়েছে সঙ্গে সঙ্গে।

মার মূর্তি তখনো চোখের আড়ালে চলে যায়নি, ওই তো একটু আগেই দ্রুত পায়ে এগিয়ে চলেছেন, চক্রবর্তীদের পোড়ো বাড়িটার সামনে একটুখানি থমকে দাঁড়ালেন, আবার চলতে শুরু করলেন। আরেকটু সামনেই মিউনিসিপ্যালিটির সীমানার শেষ। জ্বলছে একটা কেরোসিনের আলো, যার নিশিজাগা চোখ দু'টির কোল কালিতে ঢেকে গেছে, আকাশেও আলো নেই, তবু মাকে দেখা যাচ্ছে! আরো কতদূর যাবেন মা।

মিউনিসিপ্যাল সড়ক ছেড়ে এবার মা কাঁচা রাস্তা ধরেছেন। শুভাশীষ

জানে, এ-রাস্তা বেশি দূর যায়নি, আর একটুখানি এগিয়ে পোদ্দারদের বাড়ির খিড়কিতে শেষ হয়েছে।

সেই খিড়কির দরজা ঠেলে মাকে ভেতরে ঢুকতে দেখে শুভাশীষ অবাক হ'ল! এ-বাড়িতে এমন অসময়ে কী কাজ।

সে নিজেও ভেতরে ঢুকবে কিনা ইতস্ততঃ করছিল। কিছুক্ষণ পরেই ভেতর থেকে নিয়মিত তালে একটা ভারি জিনিষ পড়বার শব্দ এল। উঁকি দিলে শুভাশীষ। এ-দিকটাতে পোদ্দারদের ঢেঁকি ঘর। মনে ছিলনা। মা ঢেঁকিতে পাড় দিচ্ছেন। আড়া আড়ি ভাবে রাখা একখানা বাঁশের ওপর দু'খানা হাত, পায়ের কাছে একটা কেরোসিনের ল্যাম্প। পোদ্দার বাড়ির একটা ঝি যোগান দিচ্ছে মাকে।

এই তবে রহস্য। বুকের ভেতর থেকেও ঢেঁকির শব্দ যেন শুনতে পেল শুভাশীষ।

—আপনি একটু বসুন দিদি। আমি গোয়ালটা একটু দেখে আসি। পোদ্দারদের ঝি বললে মাকে। সে চলে যেতেই এগিয়ে এল শুভাশীষ। 'মা'—ডাকলো চাপাস্বরে।

চকিত হয়ে ফিরে তাকালেন মা।—খোকা, তুই!

কিছু জিজ্ঞাসা করবার ছিলনা, আর কোন রহস্য নেই। না পারল এগিয়ে যেতে, না সেখান থেকে ছুটে আসতে। ওইখানে, সেই প্রাক্-সকাল অন্ধকারে পোদ্দারদের ঢেঁকিঘরের সামনে দাঁড়িয়ে ওর চোখ ভিজে উঠল।

এগিয়ে এসে মা মাথায় হাত দিলেন—তুই বাড়ি যা খোকা। আমি এক্ষুনি আসছি।

শুভাশীষ তবু নড়ছেনা দেখে বললেন, এতে কোন অসম্মান নেই। অন্ধকারে আসি যাই, কেউ জানতে পায় না।

শুভাশীষ তবু চুপ। মা বললেন, তুই কি এত অবুঝ। তোকে তো

মানুষ করে তুলতে হবে। পোদ্দারদের ঝি'র ফিরে আসবার সাড়া পেয়ে মা তাড়াতাড়ি বললেন, তুই এবারে যা।

বাড়িতে ফিরে এলো শুভাশীষ। এবারে আর দ্রুত, উত্তেজিত পায়ে নয়। আকাশ ফর্সা হয়ে এসেছে। গুমোট কেটে গিয়ে একটা ঝিরঝিরে বাতাস বিলের ওপাশ থেকে বইতে শুরু করেছে।

মা ফিরে এলেন আরো আধঘণ্টামত পরে। কোঁচড়ে ক্ষুদকুঁড়ো, আর আধসের মত চাল। ক্ষুদ রাখলেন বেতের ডালায়, চাল হাঁড়িতে। বললেন, আয় খেতে দিই তোকে।

মুড়ি চিবোতে চিবোতে শুভাশীষ বললে, বাবার একটা খোঁজ নেবো মা?

মা আজও বললেন, না।

একটু থেমে, বললেন, ও-বাড়ির সৌরভী আমাকে মুড়ি ভাজার কাজও ঠিক করে দেবে বলেছে। দু'টি তো মাত্র লোক তোর মাসিমাও এখন নেই, আমাদের স্বচ্ছন্দে চলে যাবে।

—তুই এসব কিছু ভাবিসনে, মন দিয়ে পড়াশুনা করে যা। আমি ঠিক চালিয়ে নিতে পারবো। নিজের পায়ে নিজে দাঁড়ানো, এ কি অসম্মান?

দু'টি মোটে প্রাণী। এ পরিবার থেকে শেষ নাম কাটা গেছে মাসিমার। সেও একটা ঘটনা।

হঠাৎ একদিন সকালে নিরঞ্জন কাকা এসে হাজির। আগে থেকে খবর নেই। হাতে পয়সা নেই, মা তটস্থ। এটা ফুটবল খেলারও সময় নয়, কে জানতো হঠাৎ নিরঞ্জন এভাবে এসে পড়বে।

কিছু ভাবতে হ'ল না, নিরঞ্জনকাকাই স্যুটকেশ থেকে চা, চিনি, জমানো দুধ বার করলেন! আপনি শুধু একটু গরম জল আনুন বৌদি।

সুদিন থাকলে, কিম্বা দাদু বেঁচে থাকলে, মা মনে কিছু করতেন কিনা বলা যায় না। হয়ত ঠাট্টা করতেন,—জলটুকুও কলকাতা থেকে নিয়ে এলেই পারতে ভাই।

আজ মা সহসা গম্ভীর হয়ে গেলেন। কলকাতা থেকে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে তৈরি হয়ে আসাটাকে মনে করেছেন ওঁদের অভাবের প্রতি কটাক্ষ।

চা খেতে খেতেই নিরঞ্জনকাকা মাসিমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার চিঠি পেতে দু'দিন দেরি হ'ল বৌদি, কলকাতায় ছিলুম না। তোমরা সব তৈরি তো। কালই নিয়ে যেতে চাই। আমার আবার হাতে ছুটি নেই।

—চিঠি? মা বিস্মিত চোখে মাসিমার দিকে চাইলেন।—তুই আবার চিঠি লিখলি কবে!

মাসিমা অপরাধীর মতো ঢোঁক গিললেন, এদিক ওদিক তাকালেন। তারপর বললেন, লিখেছিলাম দিদি।

—আমাকে জানাসনি কেন।

—তোমাকে সব পরে বলছি দিদি। এখন চুপ করো। ঠাকুরপোকে খেতে দাও।

তারপর মাসিমার নিজের মুখেই সব শোনা গেল। এখানকার টানাটানি, অভাব অনাটনের কথা জানিয়ে নিরঞ্জনকাকাকে চিঠি লিখেছিলেন। সে চিঠিতে এমন ইঙ্গিতও ছিল যে নিরঞ্জন যদি পারে, তবে—

সেই ইঙ্গিতটুকু বুঝতে ভুল হয়নি নিরঞ্জন কাকার, ওদের সবাইকে নিতে এসেছেন।

মা বললেন, তুই একাই যা শোভা।

—তোমরা যাবে না? মাসিমা মাথা নীচু করে বলেছিলেন।

হঠাৎ কঠিন কণ্ঠে মা বললেন, সত্যি করে একটা কথা বলবি? তুই

শুধু তোর একার যাওয়ার কথাই লিখেছিলি। নিরঞ্জন এখন এখানে এসে চক্ষু লজ্জার খাতিরে এখন সকলের কথা বলছে। তাই, না?

মাসিমা কিছুক্ষণ কোন জবাব দিতে পারেননি। তারপর আড়ষ্ট ভাবে আস্তে আস্তে বলতে চেষ্টা করেছেন,—সে রকম পষ্ট ভাবে তো কিছু—তবে—

হঠাৎ মার মুখের রেখাগুলো কোমল হয়ে গেছে, অস্বাভাবিক চাপা গলায় হেসে উঠেছেন। মাসিমার পিঠের ওপর হাত রেখে বলেছেন, তোর কথায় কিন্তু সব স্পষ্ট বুঝলাম। তুই একাই যা শোভা। নিরঞ্জন এমন কিছু বড় কাজ করে না তো, সবাই মিলে ওর ওপর—

—কিন্তু দিদি, ঠাকুরপো তো তোমাকে আপন দিদির মতোই শ্রদ্ধা করে।

মা আবার হেসে ফেললেন, বোকার মতো কথা বলিসনি। ওই শ্রদ্ধাটুকুর ওপর লোভ আছে বলেই তো ওর গলগ্রহ হতে চাই না। তুই একাই যা। এখানে তোর যে কী কষ্ট হচ্ছে বুঝি তো সব। কত আর সহ্য করবি। ওকে চিঠি দিয়ে ভালোই করেছিলি শোভা।

মাঝরাত্রে গাড়ি। যাবার সময় মাসিমা ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন। মার আঁচলে মুখ লুকিয়ে বললেন, তুমি বিশ্বাস করো দিদি, আমি একা যাবো একথা লিখিনি, একার সুখ আমি চাইনি—

রাত্রে হারিকেনের চিমনির ওপর অল্প অল্প কালি পড়ছিল। বাড়িটা আজ আরো চুপ। সেদিকে তাকিয়ে মা আস্তে আস্তে, নিজের মনে বললেন, শোভাও তা হলে গেল।

সে-কথা শুভাশীষের কানে গেল ঠিক। মাসিমাও গেলেন। মাসিমা নিরঞ্জনকাকাকে চিঠি লিখেছিলেন এখান থেকে তাঁকে নিয়ে যাবার জন্যে। সেই মাসিমা, যিনি একদিন বিনাবাক্যে নিজের সব গহনা দাদুর হাতে তুলে দিয়েছিলেন, চারুর বিয়ের জন্যে? সেই একই মানুষ?

বালিশে মুখ ঢেকে শুভাশীষ সেদিন জিজ্ঞাসা করেছিল, আমরা এখান থেকে যাবো না মা ?

—যাবো। মা বলেছেন, সবাই গেছে, আমারই কি ভাল লাগে এখানে পড়ে থাকতে। কিন্তু তুই আগে মানুষ হয়ে ওঠ। নিজে কোথাও গিয়ে বাসা করবি, তবে যাবো। কারুর গলগ্রহ হতে নয়।

পোদ্দারদের বাড়ির ঢেঁকিঘরে যেদিন মাকে আবিষ্কার করল, সেদিন দুপুর বেলা শুভাশীষ স্কুলে গেল। খাতাপত্র নিয়ে ক্লাসে নয়, সোজা গেল হেডমাষ্টার মশায়ের ঘরে।

—আমার নাম কেটে দিন স্যার, আমি আর পড়ব না।

—পড়বে না ? হেডমাষ্টার মশায় কিছু বুঝতে না পারার চোখে তাকালেন, কেন ?

এর আগে কোন দিন হেডমাষ্টার মশায়ের চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলার সাহস শুভাশীষের হয়নি, আজও কথা বলতে গিয়ে গলা কেঁপে গেল,—আর পড়তে পারব না স্যার।

—সে-তো বুঝলাম। কিন্তু কেন ?

গুছিয়ে জবাব দিতে পারলো না শুভাশীষ, বার বার শুধু ওই একই কথা মুখে এল, আমি আর পড়ব না। আমার নাম কেটে দিন, স্যার, তারপর আকস্মিক ভাবেই বেরিয়ে এল। বক্তব্য যা ছিল, বলা তো হয়ে গেছে। আবার কী। কারণ তো সে কিছুতেই বলতে পারতো না মাষ্টার মশাইকে। কী করে বলবে যে যার মা ধান ভেনে মুড়ি ভেজে খায়, সে বইয়ের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে বসে থাকে কী করে। একটা কিছু করতেই হবে তাকে।

করতে তো হবে। কিন্তু পাবে কোথায় কাজ। ছোট সহর, বেশির ভাগ ভদ্রলোকই এখানে উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, পেস্কার, মাষ্টার,

দোকানদার। আর মন্দিরচূড়া স্বর্ণকলসীর মতো দু'চারজন অফিসার মাথার ওপর। পথে পথে অনেকক্ষণ ঘুরলো শুভাশীষ, ষ্টেশন থেকে ডাকঘর হয়ে আদালত অবধি। আবার পথে বাজার হয়ে রেললাইন ধরলে। পরের ষ্টেশনটা এখান থেকে মাইল তিনেক হবে। কিন্তু কিছুদূর এগিয়ে এসেই একটা সাইডিং চলে গেছে বরফকলের দিকে।

রোদঝলসানো দুপুরে পঞ্চাশ যাট জন মুটে গলদঘর্ম্ম হয়ে বরফের পাটা ওয়াগনে তুলে দিচ্ছে। তাদের ডাকাডাকি চেঁচামেচি রেললাইনের ওপর দাঁড়িয়েও শোনা যায়। এক মুহূর্ত ইতস্তত করলে শুভাশীষ। তারপর এদিক ওদিক তাকিয়ে সোজা ম্যানেজারের ঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

সব শুনে মার মুখ শাদা হয়ে গেল।

—তুই পড়াশুনা ছেড়ে দিলি ?

—ছাড়িনি মা। বাড়িতে বসে কি পড়াশুনা হয় না।

—বরফকলে চাকরি নিলি তুই? এই বংশের ছেলে হয়ে কারখানায়—

জবাবে শুভাশীস বলতে পারতো এ বংশের কোন্ বৌ ই বা কবে পরের বাড়ি ধান ভেনে চিঁড়েমুড়ি ভেজে খেয়েছে। কিন্তু মার রক্তলেশ-হীন মুখের দিকে তাকাতে মাথা আপনা থেকে নত হয়ে এলো। ঠোঁট দুটো কাঁপল শুধু, কথা ফুটল না।

আঠারো

চারুর পাঠানো নোট ক'খানা নয়, মনিঅর্ডারের কুপনটাকে হাতের মুঠোয় দুমড়ে দুমড়ে ফেলেছিল, তারও কয়েক মাস পরে আন্দোলন শুরু হ'ল।

কার কাছে না জানি শুনেছিল চারু ওদের কথা। শুভাশীস পড়াশুনা ছেড়ে দিয়েছে, মা বাড়ী বাড়ী—

শুনেই চারু পাঠিয়ে দিয়েছিল পঞ্চাশ টাকা। ওখানে আর কিসের মায়ায় পড়ে আছ মা, চলে এস।

এত সাহস চারুর। এখানে মায়া নেই, সম্মান আছে। নিজের ঘামঝরানো পরিশ্রমের দু'মুঠো ভাত। চারুর ওখানে থাকবে কি। চারুর নিজেরই বা কী আছে। ভাত-কাপড়। সেও যথেষ্ট। যথেষ্ট কিন্তু সব তো নয়। সেখানে আজ থাকে রোহিণী। সে বিদায় নেয় তো এসে জোটে আর দু'জন চারুর ছেলের নার্স।

তবু ওখানে আছে চারু, ওখানেই থাকবে। আঁচলের গিঁট খুলে শেষ কড়িটি দেওয়ার মত আত্মসম্মানের খণ্ডিত ভগ্নাংশটুকুও খুইয়ে। আর সে খোয়ানোও কি জুয়া খেলতে বসে অকস্মাৎ, এক রাত্রে ফতুর হয়ে যাওয়ার মত বিচিত্র, স্বাদময়? এ-খোয়ানো পলে পলে, তিলে তিলে; গলায় ধারালো ছুরির ফলা বসিয়ে সের কয়েক রক্ত ঢেলে মরা নয়; রোজ রোজ অল্প অল্প কেশে, একদিন ফুরিয়ে যাওয়ার মত।

হঠাৎ শক্ত কিছুতে ঠেকে হাতের শাঁখার মত টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া নয়, বাসন-মাজা হাতের দু'গাছি নোয়ার মত নিঃশব্দে ক্ষয়ে ক্ষয়ে যাওয়া।

তবু ওরই মধ্যে আছে চারু। থাকুক। কিন্তু আর পাঁচজনকে ডাকে কেন। সংকোচ কি নেই। ভেবেছিল নোট ক'খানাকে ছিঁড়ে ফেলবে, টুকরো করে উড়িয়ে দেবে হাওয়ায়। শেষ পর্যন্ত কিন্তু মাথা ঠাণ্ডা হ'ল। টাকাটা তুলে রাখল বাক্সে। মণিঅর্ডারের কুপনটাকেই ছিঁড়লে।

তারও কয়েক মাস পরে শুরু হ'ল।

কানাঘুষা তো চলছিলই কিছুদিন ধরে। এবারে আয়োজন।

স্বদেশী আন্দোলন শুরু হবে আবার। সেই যে ভাঁটা লেগেছিল সি, আর, দাশের মৃত্যুর পর,—আবার জোয়ার আসছে।

প্রথমটা শুনেই মনের ভেতরটা একবার কেঁপে উঠেছিল শুভাশীষের, আনন্দে, প্রত্যাশায়, ভয়ে।

ভয়েও। এই ভয়ের ভিত্তি আছে শুভাশীষদের পরিবারের ইতিহাসে। ভীরু শিরায় শিরায় ছড়িয়ে গেছে সেই শিকড়, গভীরতম মনে গেঁথে গেছে বঁড়শির মত।

এই স্বদেশীই একদিন ওদের পরিবারের সংহতি ধ্বংস করেছিল। সর্বনাশা টানে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল দেবাশীষকে। সেই স্বদেশী এবারে কী হয় কে জানে। ছায়াছবির মতো মনের সমুখ দিয়ে চলে গেল কালীবাড়ীতে ম্যাজিকলণ্ঠনে দেখা ঢাকার তাঁতিদের আঙুল কাটা; দেবাশীষের জেল—ফিরে আসা। ঘটা করে সরমাদিদের নিয়ে সুতো কাটা। তারপর—

তারপর আর ভাবা চলেনা। নিরাবরণ লজ্জা; মাথাহেঁট কলঙ্ক। নিরলম্ব, নিরাশ্রয় দারিদ্র।

এই ভাল আছে। কারখানায় চাকরি। পড়াশুনা ঘুচেছে, ঘুচুক। তবু তো মাসান্তে কুড়িটা করে টাকা আসছে। ঘুমন্ত শেষরাত্রে মিউনিসিপ্যাল সড়কের কেরোসিনের আলোয় পথ চিনে মাকে যে আর পোদ্দারবাড়ি গিয়ে ঢেঁকিতে ধান ভানতে হচ্ছেনা, এই ঢের।

ছোট আশা। ছোট সুখ। সংকীর্ণ প্রশান্তি।

সারাদিন খেটে খুটে এসে সন্ধ্যাবেলা বই পড়তে পড়তে যদি টেবিলের ওপর মাথা কাৎ হয়ে পড়ে, মা আছেন তুলে বিছানায় শুইয়ে দেবার জন্যে। পড়া এগোয়না, তবু আশা আছে, এভাবে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে পড়তে পড়তেই একদিন ও পৌছে যাবে পরীক্ষার ঘাটে। সব নৌকোই তো পালে চলেনা। গুন টেনেও চলে। হয়ত অনেক বেশি সময় লাগবে, অনেক বেশি মেহনৎ। দু'বছর, পাঁচবছর।

কারখানার কাজ মন্দই বা কী। ইস্কুলে শ্রমের মর্যাদা নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছে, আর ঘাম ফেলার কাজ একটু করতে পারবে না? চিরদিনও তো না। আর একটু লেখাপড়া শিখুক। তারপর মিস্ত্রী হবে শুভাশীষ। মিস্ত্রী, টেকনিসিয়ান, ইঞ্জিনিয়ার। রাস্তার সারি দেওয়া আলোর মতো একটার পর একটা দপ্ দপ্ করে যেন চোখের সামনে জ্বলতে লাগল শুভাশীষের।

এরি মধ্যে আবার দিনকতকের জন্যে স্কুলে ভর্তিও হয়েছিল।

বিচিত্র ব্যাপার। বাড়িটার উত্তরে যে ডোবা আর তার ওপারে বিঘে দুই জমি, সেটাও শুভাশীষদের। রেলকোম্পানী নতুন কোয়ার্টার তুলবে, জমি চাই। পাড়ার আর পাঁচজনের মধ্যস্থতায় মা শুভাশীষকেও না জানিয়ে জমি বিক্রী করবার বন্দোবস্ত করলেন। রেলকোম্পানীর টাকা, কিছু চড়া দামই পাওয়া গেল।

রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর শুভাশীষ শুয়ে পড়তে যাচ্ছিল, মা ডেকে তুললেন।

ঝকঝকে চিমনি, মা আজই বুঝি মেজে পরিষ্কার করেছেন। সারা বিছানা আলো হয়ে আছে। সেই আলোয় ছেলের মুখোমুখি বসে মা গম্ভীর গলায় বললেন, আমার একটা কথা রাখবি, খোকা।

—কী কথা?

—বল রাখবি।

এই স্বর বহুবার শোনা শুভাশীষের, ভাব বহুপরিচিত। জীবনে কত জনকে এমনি কত কথা রাখতে অনুরোধ করেছেন মা। হাতে ধরে মিনতি করেছেন। কেউ রাখেনি। ছিটকে নাগালের বাইরে চলে গেছে একে একে। দেবাশীষ, চারু, বড়মাসি। একটু বুঝি চমকে উঠল শুভাশীষ, আড়ষ্ট হ'ল একটু। গলা পরিষ্কার করে কথা বলতে গিয়েও ভাঙা একটা স্বর ফুটল।—রাখব। তুমি বলো।

বালিশের নিচে থেকে একখানা বড় খাম বার করলেন মা। বিছানার ওপর ঢাললেন। দশটাকা পাঁচটাকা মিলিয়ে অনেকগুলো নোট ছড়িয়ে পড়ল।

—তুই কালই ইস্কুলে ভর্তি হয়ে যা খোকা।

বিছানার এক পাশে মা, ছেলে আরেক পাশে, মাঝখানে নোটগুলো অল্প অল্প কাঁপছে, অল্প অল্প উড়ছে।

—এত টাকা তুমি কোথায় পেলে মা।

—তুই তো জানিস। পুকুরপাড়ের জমি বিক্রী করেছি।

শুভাশীষ বিশ্বাস করলনা।

—দু' বিঘে তো জমি। তার দাম কখনো এত হয়?

—হয় না? হারিকেনের উগ্র আলোর দিকে দৃষ্টি সন্নিবেশ করে মা কী যেন ভাবলেন। তারপর হঠাৎ এক সময় একবারে বলে উঠলেন, আমি এ-বাড়ী বন্ধক দিয়েছি খোকা।

বন্ধক? কোথায়, কার কাছে। সব অনিশ্চয়তার মধ্যে এই বাড়ীটুকু ছিল, মাথা গোঁজার আশ্রয়। তাও গেছে। শুভাশীষ বিশ্বাস করতে পারছিল না, একসঙ্গে অনেকগুলো প্রশ্ন উঠছিল মনে।

মা নিজেই বলে গেলেন।

হ্যাঁ, বন্ধক দিয়েছি। তাতে ভয় কি খোকা। সর্ত আছে দু' বছরের মধ্যে ওরা টাকার তাড়া দেবে না। সুদ বাদ দিয়েই টাকা দিয়েছে। কিন্তু ততদিনে তুই মানুষ হয়ে উঠবি খোকা—উঠবি না?

কি ভাবছিল শুভাশীষ বলা যায়। ক্ষীণ গলায় আস্তে আস্তে বললে, হব মা।

আরেকবার ভর্তি হ'ল বটে, কিন্তু আড়ষ্টভাব ঘুচল না। ক্লাশের ছেলেদের সেই মুখটেপাটেপি। হাসাহাসি। লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে

ভদ্রলোকের ছেলে হঠাৎ কারখানার চাকরি নিয়েছিল এরা জানে। ছোট কাজ করেছে, ছোট লোকদের সঙ্গে মিশেছে, এখন আবার উঠে আসতে চাইছে। প্রায়শ্চিত্ত করে জাতে ওঠার মত।

কিন্তু মুড়োনো মাথা কোথায় যাবে? ঘোল ঢালার স্মৃতি?

কিন্তু ঠিক সেই সময়েই বন্যা এল। সব স্মৃতি, সম্মান, অপমান ধুয়ে মুছে একাকার করে দিল।

কাচারিপাড়ায় থিয়েটার হলের সামনের মাঠটিতে প্রথম মীটিং শুনতে যাওয়া মনে আছে। মিটিংয়ে যেতনা শুভাশীষ, মার শাস্ত গম্ভীর মুখ মনে পড়ছিল, তবু না গিয়ে পারল না।

বিকেল থেকেই দলে দলে লোক মীটিংয়ে যাচ্ছে। স্কুলের ছেলেরাই বসেছে প্রথম সারে; পেছনে পেছনে বসে গেছে, দোকানদার, ডাক্তার, কবিরাজ, মাষ্টার। একেবারে শেষে ছড়িহাতে প্রৌঢ়প্রায় উকিল বাবুরাও দাঁড়িয়েছেন। সরকারী চাকুরে ছাড়া শহরের আর সব।

একটি টেবিল, দুটি চেয়ার, গোটাকয়েক গ্যাসের আলো আর তেরঙ্গা ঝাণ্ডা একটা নরম মাটিতে প্রোথিত। মীটিংয়ের আয়োজন এই। জেলা-সদর থেকে এসেছেন গোবিন্দ মজুমদার।

সবাই একে একে আসছিল সদর রাস্তা থেকে কালভার্ট পেরিয়ে, এসেই ঝুপ ঝুপ করে বসে পড়ছিল মাটিতে, আশেপাশে, সর্বত্র।

গোবিন্দবাবু দেখছিলেন।

খদ্দরের ধুতি, খদ্দরের পাঞ্জাবী, খদ্দরের উড়ুনী, মাথায় টুপি। জেলা-সদরের নাম করা উকিল। এককথায় প্রাকটিশ ছেড়েছেন—খালিপায়ে নেমে এসেছেন কাঁকরপথে। সভার সবাই বলাবলি করছিল; চেয়ে দেখছিল মুগ্ধ বিস্মিত দৃষ্টিতে।

দেখছিল শুভাশীষও। সৌম্য, স্মিত মুখ। উদ্ধত সঙ্কল্পের মত্তো উন্নত নাক, কঠিন চিবুক আর ওষ্ঠ ভঙ্গিমায় বিশ্বাসী দৃঢ়তা। দীপ্ত অথচ উদাস চোখে বৈরাগ্য।

উদ্বোধন সঙ্গীতের পর হাততালি পড়েছিল, গোবিন্দবাবুর গলায় মালা পড়তে আরেকবার। গোবিন্দবাবু যখন মালাটা খুলে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন তখন আরো একবার।

ডানহাতখানা অল্প একটু তুলে গোবিন্দবাবু সবাইকে চুপ করতে ইঙ্গিত করলেন। তারপর বক্তৃতা শুরু হ'ল।

প্রথমে আস্তে আস্তে শুরু করেছিলেন। উদাত্ত শান্ত কণ্ঠে পাঠ করেছিলেন স্বাধীনতার সংকল্প বাক্য।

তারপর বক্তৃতা এগিয়ে গেল যত, কথার গতিবেগ তত বাড়ল, চোখে যেন বিদ্যুৎ ঝলসাতে লাগল, গলায় শোনা গেল মেঘের ডাক। কী আমাদের ছিল ; কেড়ে নিয়েছে কে ; কোন পথে পাওয়া যাবে সেই হৃত সম্পদ।

কতটুকু বুঝল, কি বুঝল না এতদিন পরে বলা শক্ত। কিন্তু শুনতে শুনতে শুভাশীষের মুষ্টি আপনা থেকেই দৃঢ় হয়ে এল : সংকল্পের প্রস্তুতি। এটুকু তো বুঝেছে বিলিতি জিনিষ আর কেনা চলবেনা, যারা কেনে তাদের ঠেকাতে হবে ; মাদক দ্রব্য কেউ যেন না ছুঁতে পায়। আর সর্বোপরি লবণ সত্যাগ্রহ। সাধারণ মানুষের মৌলিক অধিকারের প্রতীক। মহাত্মাজীর আসন্ন ডাণ্ডি যাত্রার কথা।

আরো কত কথা। এ-আন্দোলনের রূপ কী। প্রতিবাদ কিন্তু প্রতিহিংসা নয়। অসীম স্পর্ধাকে অসীমতর অসহিষ্ণুতা দিয়ে জয় করা। নম্রতা কিন্তু নতি নয়।

মহাত্মা গান্ধীর উদ্দেশে বক্তা নমস্কার জানালেন। স্বদেশ-আত্মার মুক্তিতৃষ্ণার একটি শীর্ণ-কঠিন শিখাপ্রতীক।

সর্বশেষে বক্তা আহ্বান জানালেন : স্বেচ্ছাসেবক চাই। শত শত, হাজার হাজার ত্যাগী, নিঃস্বার্থ কর্মী।

এগিয়ে আসুন আপনারা দলে দলে। না, বিনিময়ে কোন কিছুর আশ্বাস দিতে পারবোনা। দুঃসহ দুঃখের কাঁকরে এ-পথ ছাওয়া। বহুদূরের ধ্রুবতারার আশ্বাসের মতো লক্ষ্য স্বাধীনতা। এ-পথেরও মাঝে মাঝে বিশ্রামের চটি আছে—সরকারী অতিথিশালা। আসুন আপনারা। কই, এলেন না ?

সভাময় গুঞ্জন বয়ে গেল। এগিয়ে এলোনা কেউ। মুখ চাওয়া চাউয়ি করছে একে অপরের। এতক্ষণ ধরে দীর্ঘ বক্তৃতাকে অভিনন্দন জানিয়েছে মুহুর্মুহু করতালি দিয়ে। ক্লান্তি এসেছে এবার।

হাততালি দেওয়ার হিসাব ছিলনা, না দায়িত্ব, না ভাবনা। কিন্তু নাম লেখানোর আহ্বান আসতেই অনেক প্রশ্ন মনে এসেছে, অনেক সন্দেহ, অনেক দ্বিধা। পিছনের দিকে যাঁরা ছিলেন তাঁরা সরে পড়তে লাগলেন একে একে। অনেক অভিভাবক তাঁদের ছেলেদের চোখের ইশারায় বাড়ি চলে যেতে বললেন।

যাদুকর যতক্ষণ খেলা দেখিয়েছে, সবাই ছিল ভীড় করে। টুপিটি খুলে সামনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিতেই ভীড় ফিকে হতে শুরু করেছে।

সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর ওপর দিয়ে ক্রুদ্ধ, নিরাশ দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে গেলেন বক্তা। কই, আসুন এগিয়ে ? একজন অন্ততঃ আসুন ? একজনও না ? তবে কি বুঝে নেবো এ-সহরে একজনও মানুষ নেই ? এমন একজনও নেই যার পায়ে পরাধীনতার শেকল বাজছে, কব্জিতে গোলামির কড়ির দাগ বসেছে শক্ত করে ?

সভাময় একটা নিঃশব্দ অস্বস্তি বয়ে গেল। তখনো সবাই চুপ।

বুঝেছি। বক্তা বললেন, ভীরুতা আপনাদের স্নায়ু পক্ষাহত করেছে ; আপনারা মেরুদণ্ডহীন আত্মসম্মানবর্জিত—

ঢোঁক গিলে আব্বার বললেন, প্রবীণ যাঁরা তাঁদের মনস্তত্ত্ব বুঝি। কিন্তু তরুণ? এ-শহরেও তো যুবক আছেন, ছাত্র আছেন, তাঁরাও কি পেছনে থাকবেন? এগিয়ে আসবেননা? তবে কি আপনারা এখানে শুধু মজা দেখতেই এসেছিলেন, হাততালি দিয়েছিলেন লোকটা বেশ ভালো বলতে কইতে পারে বলে? এত বড় একটা মহকুমা শহর, এত দোকান-পসার আফিস-আদালত ইস্কুল—এখানে একজনও কি স্বেচ্ছাসেবক সংগৃহীত হবেনা?

চাপা গলার গুঞ্জন ছাপিয়ে ক্ষুব্ধ, অসহিষ্ণু ভৎ‍র্সনার মেঘকণ্ঠ বাজতে থাকলো। শেষে বক্তা বললেন, বেশ সভা তবে ভঙ্গ হোক। আপনারা থাকুন আপনাদের গোলামির বদ্ধ কোটরে, রায়বাহাদুরি তাকিয়ার ঠেসান দিয়ে আয়েস করুন।

সভামঞ্চ থেকে তিনি নামতে যাচ্ছিলেন—হঠাৎ সম্মুখের সারির এক-জন উঠে দাঁড়ালো। হাফপ্যাণ্ট আর ফতুয়া গায়ে, মঞ্চের দিকে মুখ থাকায় হঠাৎ বোঝা গেলনা কে। সভার তিন চার সারি ছাড়িয়ে তার ছায়া পড়ল।

কে? কে? কে? সভাময় একটা স্তম্ভিত বিস্মিত দৃষ্টি বিনিময় হয়ে গেল। কে উঠে এসেছে এই শহরের লজ্জামোচন করতে? রক্তাক্ত পথের দিকে প্রথম অসমসাহসী পদক্ষেপ কার?

ততক্ষণে তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরেছেন গোবিন্দবাবু। সবাই তাকে দেখতে পাচ্ছিলনা, তাই এক রকম কোলে তুলে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন টেবিলের ওপরে। নিভে-আসা প্রত্যাশা আবার জ্বলে উঠেছে তাঁর দু'চোখে, তিরস্কার গলে আবেগে পরিণত হয়েছে। গলা ধরে গেছে।

—এই দেখুন। স্কুলের ছাত্র, বয়স ১৪।১৫র বেশিনা। কেউ যখন পারলনা আসতে এ এসেছে। এই কিশোরের যেটুকু অনুভূতি আছে

আপনাদের কি তাও নেই। অশক্ত পায়েও এ নির্ভীক ভাবে উঠে দাঁড়ানোর সাহস অর্জন করেছে। আপনারা কী করলেন।

শুভাশীষ চেয়ে দেখল প্রথম স্বেচ্ছাসেবকের মুখের দিকে।

গঙ্গানন্দ বিভ্রান্ত। আধবোকা ছেলেটি, যাকে নিয়ে ক্লাসে সবাই মিলে হাসাহাসি করত, একদিন দল বেঁধে গোবর খাইয়েছিল যাকে।

আপনা থেকে মাথাটা হেঁট হয়ে এলো শুভাশীষের। এই নিরীহ ছেলেটি এতদিন ধরে সব অপমান নিঃশব্দে সয়ে আজ চতুর্গুণ করে ফিরিয়ে দিয়েছে ক্লাসের সবাইকে।

আস্তে আস্তে সব সঙ্কোচ সংশয়ের বাঁধ যেন ভেঙে পড়তে লাগল। আরো একজন এগিয়ে এলো। তার পিছনে আরো একজন। আরো দু'জন। তিনজন, চারজন। একে একে এগিয়ে যাচ্ছে সবাই নির্ভয় হাসিমুখে, ছোট ছোট হিসাবনিকাশের, আপন আপন স্বার্থ বোধের, সাবধানী ভাবনার মৃত্যু পরোয়ানায় সই করে দিয়ে আসছে।

পা দু'টো চঞ্চল হয়ে উঠল শুভাশীষের। চোখ উত্তেজনায় ছল ছল করছে। বুকের ভিতরে কী একটা জিনিষ ওঠাপড়া করছে বারংবার। সেও যাবে।

আস্তে আস্তে মঞ্চের দিকে এক পা দু'পা করে এগিয়ে গেল। ওই তো সম্মুখে তিনরঙা ঝাণ্ডা, গ্যাসের আলোর নীচে দেশনেতার স্নেহনবনীত মুখ। আর দু'পা মাত্র বাকি।

—এসো খোকা। কোমল কণ্ঠে গোবিন্দবাবু ডাকছেন। —তোমার নাম বলো।

আস্তে আস্তে ভীরু চোখ তুলে গোবিন্দবাবুর দিকে শুভাশীষ তাকালো। আর সেই মুহূর্তে কী হ'ল, হঠাৎ ঘুরে গিয়ে মঞ্চ থেকে লাফিয়ে পড়ল শুভাশীষ। তারপর ভীড় ঠেলে, এর কনুই ওর হাতের ভেতর দিয়ে পথ

করে সদর রাস্তায় এসে দাঁড়ালো। তারপর দ্রুত পায়ে চলতে লাগলী। প্রায় ছুটে চলার মতো।

না, নাম সে লেখাতে পারেনি, পারবেনা। কাছাকাছি গিয়ে দেশ-নেতার দিকে তাকাতেই ওঁর চোখের মনিতে দেখতে পেয়েছে দেবাশীষকে। ওর বাবা।

সেই অযত্নবিন্যস্ত চুল, সুদূর সন্ন্যাসী দৃষ্টি; ভয়হীন, ভাবনাহীন, বিবেচনাহীন। নির্মল কিন্তু নির্মমও। নির্ভয়, কিন্তু নির্দয়ও তো।

আর সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়েছে ওর মাকে। বিষণ্ণ, করুণ, একাকী। ওদের পরিবারের মানুষগুলি মিছিলের মতো একে একে যেন চলে গেছে চোখের সমুখ দিয়ে।

না শুভাশীষ পারবেনা। জননীর চেয়ে তার কাছে জন্মভূমি গরীয়সী নয়।

আলো জালিয়ে মা চুপ করে বসে ছিলেন। শুভাশীষ এসে করল কি, সেই একেবারে ছেলেবেলার মত, কোলের মধ্যে মুখ লুকালো।

—মীটিংয়ে গিয়েছিলাম মা। তাই দেরি হল। আর যাবোনা। তুমি বুঝি ভয় পেয়েছিলে?

মা কোন জবাব দিলেন না। আস্তে আস্তে ওর চুলে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন।

তারপর সময় চলতে থাকল দ্রুত বেগে। কোথায় ছিল এই তেজ এই উদ্দীপনা। পথ একজন করে দেয় তবে তো লোকে সে-পথে চলে। একদিন একটি সত্যাগ্রহী সংগ্রহ করাও যেখানে কষ্টকর ছিল, সেখানে এখন হাজারের ওপর স্বেচ্ছাসেবক। কালীবাড়ির পাশেই কংগ্রেস অফিস বসেছে—কাতারে কাতারে কত লোক সেখানে জড়ো হচ্ছে দেখে এসো গিয়ে।

দেখে বৈকি, শুভাশীষও দেখে। তবে পেছন থেকে, দূর থেকে, দর্শকের মতো।

শুধু গঙ্গানন্দ বিভ্রান্ত নয়। ক্লাশের আরো কত ছেলে। খদ্দরের প্যাণ্ট, খদ্দরের ফতুয়া, মাথায় সাদা টুপি। গান্ধি ক্যাপ। হাতে হাতে ছোট ছোট তেরঙা নিশান। লাল, সবুজ, সাদা। কে জানে তিন রঙের তাৎপর্য কী।

কিশোর বাহিনী তৈরী হচ্ছে, অধিনায়ক গঙ্গানন্দ। একদিন ওরা সারা শহর শোভাযাত্রা করে প্রদক্ষিণ করল। মুখে নতুন শেখা গান, বাহুমূলে ব্যাজ। নানা বয়সের ছেলে মেয়ে।

বাড়ীর জানালায় বসে শুভাশীষ দেখল।

কাচারির মাঠে ঘটা করে বিলিতি কাপড় পোড়ানো হ'ল সন্ধ্যা বেলা। তার আভায় সাদা রঙের পোষ্ট অফিসটাকেও মনে হতে লাগল ট্রেজারি বিল্ডিংয়ের মতো লাল।

—"বন্দেমাতরম !"

অসংখ্যের কণ্ঠে বাজছে নিঃশঙ্ক শঙ্খ। সেই সুরে শুভাশীষও সুর মিশিয়ে বলতে চাইল 'বন্দে মাতরম।' কিন্তু ভাল করে গলা ফুটলনা। ভাঙা গলার লজ্জা নিয়ে বাড়ি ফিরে এলো।

মা বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিলেন।—ওদিকে অতো আলো কিসের রে ?

—জানোনা, আজ বিলিতি কাপড় পুড়ছে যে। আকাশ শুদ্ধ লাল হয়ে গেছে। আচ্ছা মা—

মা তাকাতেই শুভাশীষ ভয়ে ভয়ে বলল, আমি সুতো কাটব ? চরকায় নয়, তকলিতে ? এতে তো আর ভয় নেই,—ঘরে বসে ? সবাই তো কাটছে।

না। মুখের ওপর নিষেধের নির্বিকার দরজা বন্ধ হয়ে গেল যেন। সুতো কাটতেও মার আপত্তি ? সবাই তো কাটছে। কংগ্রেস অফিস

থেকে দিচ্ছে তুলো আর তকলি। যারা পায়নি, তারাও একটা তামার পয়সা ফুটো করে সাইকেলের শিক দিয়ে তকলি বানিয়েছে। পেঁজা তুলো কণা উড়ছে সর্বত্র। হাতে হাতে সুতো কাটতে কাটতে ছেলেরা রাস্তায় চলছে।

মা আস্তে আস্তে বললেন, ও-সব হুজুগে কাজ নেই। এই সুতো কাটা নিয়ে এ-বাড়িতে কত কেলেঙ্কারি দেখলাম। এ-বাড়িতে একবার সুতোকাটার ধুম পড়ে গিয়েছিল, তোর মনে নেই ?

মনে আছে বৈকি। বাবা মেয়েদের নিয়ে যে স্বদেশি আসর খুলে-ছিলেন, মা সেই কথাই বলছেন। একজন ছাত্রী ছিল সরমাদি, আরেকজন চারু।

আশ্চর্য, মার মনের ঝুলি থেকে একটি স্মৃতির কানাকড়িও কি কখনো হারায় না !

আস্তে আস্তে শুভাশীষ কেমন দল ছাড়া হয়ে পড়ছে, সে বুঝতে পারছে নিজেও।

সমবয়সী সকলের সঙ্গে শুভাশীষের যেন মিল নেই। একা একা ঘোরে। রেল স্টেশনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গাড়ির আসা যাওয়া দেখে।

কখনো কোন ছেলের বাড়ি গেছেও যদি, গিয়ে পায় নি। কোথায় গেছে পরিমল ? ওমা, জানো না, আজ আফিমের দোকানের সামনে জোর পিকেটিং হচ্ছে যে। স্কুলের ছেলেরা কেমন এই দুপুরের রৌদ্র তুচ্ছ করে বাজারের সদর রাস্তায় শুয়ে আছে দেখে এসো।

কোথায় গেছে অসিত। তাও জানো না, স্বদেশি নুন ফিরি করতে গেছে বাড়ি বাড়ি।

স্বদেশি নুন। মিছিল করে বেরিয়ে বাড়ি বাড়ি বিক্রী করেছিলেন নেতারা। এ-নুন ট্যাক্সো না দিয়েই পৌঁচেছে ঘরে ঘরে। সরকারী

ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে সমুদ্রসৈকতে তৈরি এই ক'টি কণা তীর্থরেণুর মতো পবিত্র।

মেয়েরা কিনলেন হাতের চুড়ি খুলে, গলার হার দিয়ে, কানের, নাকের প্রকোষ্ঠের সব আভরণের বিনিময়ে—এক ছটাক নুন। নিয়ে খেলেন না। মাথায় ঠেকিয়ে তুলে রেখে দিলেন।

সব বাড়িবাড়ি ওঁরা গেছেন। শুভাশীষ অনেক কষ্টে গোটা দুই টাকা জুগিয়েছিল। সদর দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিল, ওঁরা কখন আসেন।

কিন্তু কেউ এলেন না। সামনের রাস্তা দিয়ে আরো সামনে এগিয়ে গেলেন। শুভাশীষদের বাসার দিকে তাকালেনও না। আস্তে আস্তে টাকা দু'টিকে মুঠোর ভেতর শক্ত করে ধরে শুভাশীষ আবার বাড়ির ভেতর ফিরে এলো।

—আমাদের বাসায় ওরা এলো না কেন, মা?

—কী জানি কেন। মা বললেন, বোধহয় আমাদের ভাঙা ঘর দোরের চেহারা দেখে ফিরে গেল। তাছাড়া, একটু থেমে নম্রকণ্ঠে মা আবার বললেন, সত্যিই তো, আমার তো কোন গহনা নেই যে ওই লবণ কিনতে পারি!

শুধু একজন ছিল এই আন্দোলনের বাইরে। ননী। শুভাশীষের মতো তারও দৈনন্দিন জীবন বাঁধা অভ্যাসের বাঁধা পথে চলছে।

দু'জনে মিলে লাসকাটা ঘরের পেছনে কোন কোন বিকেলে বসে সূর্যাস্ত দেখে। ননী বললে, আমরা কেন স্বদেশী করব বাবা। আমরা খৃষ্টান। পঞ্চম জর্জ যা, আমরাও তাই। একটু থেমে বললে, ওরা যে পয়সা ফুটো করে, তকলি বানায়, সেটা কি ভাল। পঞ্চম জর্জের মাথা ফুটো হচ্ছে না? গবর্ণমেণ্ট ওদের ধরে ধরে ফাঁসি দেবে দেখিস।

আরো খবর শোনা যায় ননীর কাছে। কলকাতায় খবর গেছে

এখানে বিলিতি কাপড় পোড়ানো হচ্ছে। সেখান থেকে রিভলভারি পকেটে সার্জেণ্ট আসছে আর বন্দুক কাঁধে গোরা সৈন্ত। সব ঠাণ্ডা করে দেবে একদিনে।

এরি মধ্যে একদিন আশ্চর্য ভাবে সরমাদির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

বিকেলের দিকে স্টেশনের দিকে বেড়াতে গিয়েছিল। ওভার ব্রীজের নিচে দিয়ে শেষ বেলার ডাক গাড়ি হুস হুস করে এসে ধীরে ধীরে থামলো। জানালা দিয়ে বেরিয়ে থাকা একখানা মুখ দেখে প্রথমেই মনে খটকা লেগেছিল, তারপর সেই জানালা থেকেই একখানা হাত বেরিয়ে এসে ইঙ্গিতে ওকে ডাকতেই, সন্দেহ রইল না।

সরমাদি।

শুভ্র খদ্দরের থানে আগাগোড়া আবৃত করে বসে আছেন। শুধু আধখানা মুখ খোলা। তিনবছর আগেও দেখেছে, আজও দেখল। রূপ তেমনি আছে সরমাদির। কিন্তু এই প্রথম শুভাশীষ আবিষ্কার করল রূপেরও রকমফের আছে। এ-রূপ ঝর্ণার মত তরল ঝর্ঝর নয়, দীঘির মতো প্রশান্ত। আরো একটু ফর্সা হয়েছেন বুঝি সরমাদি,—নাকি সেটা শাদা কাপড়ের আভা। চঞ্চল চোখের সৌন্দর্য শুভাশীষ দেখেছে, কিন্তু এই স্থিরায়ত নয়নের শান্তির তুলনা নেই।

চরকা কাটছিলেন সরমাদি। আরো চারপাঁচটি মহিলা ছিলেন আশে-পাশের বেঞ্চ জুড়ে।

—শুভাশীষ না? এতবড় হয়ে গেছ এরি মধ্যে?

জেলাসদরে যাচ্ছেন সরমাদিরা। সেখানে মহিলাদের সংগঠনমূলক কী একটা কাজের ভার পড়েছে ওঁদের ওপরে।

—তারপর? সরমাদি বললেন, তোমাদের এখানকার খবর বলো। আন্দোলন চলছে তো।

—খুব মারধোর, ধরপাকড় হচ্ছে, সরমাদি।

—সে-তো হবেই। কাজ কেমন এগোচ্ছে বলো। তুমি? শুভাশীষের পরণের খাকি প্যাণ্ট আর টুইলের শার্টের ওপর দিয়ে একবার চোখ বুলিয়ে সরমাদি বললেন, তুমি যোগ দাওনি?

মাথা আপনা থেকেই নীচু হয়ে পড়ল শুভাশীষের।—না সরমাদি।

সূতো কাটা বন্ধ করে সরমাদি কিছুক্ষণ ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন অবাক হয়ে।—বলো কি। তোমার চেয়ে কম বয়সী কত ছেলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে হাসিমুখে,—আর ষোল সতেরো বছর বয়সের ছেলে হয়েও তুমি লক্ষ্মী হয়ে বসে আছ? কত বড় লোকের ছেলে তুমি—

যে-কথাটি জিজ্ঞাসা করবে করবে ভেবেও সঙ্কোচে বলতে পারেনি, সেই কথাটা শুভাশীষ এই সুযোগে পাড়ল।—বাবা কোথায় সরমাদি।

—ওমা জান না? বড়বাজার সত্যাগ্রহের প্রথম দিনেই তো দেবাশীষদা গ্রেপ্তার হয়েছিলেন, তোমরা কিছু খবর পাওনি?

গাড়ি ছাড়ার ঘণ্টা পড়ল। মাথানীচু করে সরমাদিকে একটা প্রণাম করে প্লাটফর্মে নেমে দাঁড়ালো শুভাশীষ।

—থাক ভাই, থাক। ওর মাথায় একখানা হাত রেখে সরমাদি বললেন, চারু ভালো আছে?

গাড়ি ছেড়ে দিয়েছিল। ঘাড় কাৎ করে শুভাশীষ জানালে, আছে।

যতক্ষণ গাড়িখানা অদৃশ্য না হ'ল ততক্ষণ জানালা দিয়ে মুখ বার করে ছিলেন সরমাদি।

শুভাশীষ তারও পর অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল! সেই সরমাদি। কী না করেছেন একদিন, নতুন করে বেঁচে ওঠার আশায়। লুকিয়ে মাছ খেয়ে, ঘরে দরজা দিয়ে লাল চেলি কুঙ্কুম আলতা পরে, নেশাগ্রস্তের মত ভুল দেয়ালে মাথা ঠুকেছেন বারবার। নিভৃত বিলাস শয্যায় আহ্বান করে এনেছেন পরপুরুষকে। কোন শঙ্কা ছিলনা, সঙ্কোচ না। উগ্র

পানীয়ে মুখ ঠেকিয়ে বারবার ভেবেছেন এই বুঝি পেয়ে গেলাম সঞ্জীবনী। তারপর একদিন ঘরও ছাড়লেন।

এই ক বছরে এমন কী পেয়ে গেলেন সরমাদি, কী মন্ত্রে বোধন করলেন আপন সত্তার। লুকিয়ে পরা বেনারসী যা দিতে পারেনি, তাই পেয়ে গেলেন শুদ্ধ একখানি শুভ্র মোটা থানে? একদিন যেখান থেকে নিদ্রিত রাতে লুকিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন, আজ সেখান দিয়ে দিনের বেলা চলে যেতে পারলেন, জানালা দিয়ে নিঃসঙ্কোচে মুখ বাড়িয়ে দিয়ে।

অন্যমনস্কের মতো শুভাশীষ আস্তে আস্তে বাড়ি ফিরে এলো।

উনিশ

পরীক্ষার ফলাফল বেরুলে বরাবরই দেখা যেত শুভাশীষের নাম মাঝামাঝি জায়গায়। দশম কি একাদশ। সেবার টার্মিন্যাল পরীক্ষায় একেবারে প্রথম হ'ল। সকাল বেলা মা কোথায় বেরিয়েছিলেন। ফিরে এসে খবরটা জানালেন।

তুই ফাস্ট্ হয়েছিস খোকা। অনেক আগে হারানো উজ্জ্বলতা ফের ফিরে পেয়েছেন মা। শুভাশীষ জিজ্ঞাসা করল, তুমি কী করে জানলে।

সেকেণ্ড মাষ্টার মশায়ের বাড়ি গিয়েছিলাম যে। তিনিই ডেকে খবরটা দিলেন। এ কিন্তু আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। আয় ঠাকুরকে প্রণাম করি।

প্রণাম করবে কি, হাঁটুর ভেতর মুখ গুজে বসে রইল শুভাশীষ। কম নম্বর পাওয়াটা লজ্জার। ফেল করা তার চেয়েও। কিন্তু প্রথম হয়ে এ কোন্ লজ্জায় পড়ল আজ। এ মুখ দেখাবে কী করে।

মাকে সব কথা বলা যাবে না। ছেলের গর্বে তাঁর বুক এখন দশ হাত। ভেবেছেন শেষ সম্বলটুকু বাঁধা দিয়ে পড়ার খরচ যোগান

সার্থক হ'ল। এ ভুল শুধরে দিয়ে মার সামান্য সুখটুকুও শুভাশীষ কেড়ে নিতে পারবে না। কী করে মাকে বলবে সে প্রথম হয়েছে বটে, কিন্তু মোটে পাঁচজনের মধ্যে। এবার সব ছেলে স্কুল বয়কট করেছে। পাঁচজনই মাত্র পরীক্ষা দিয়েছিল।

পরীক্ষার ক'দিন স্কুলের ফটকের সমুখে শুয়ে পড়ে মহিলারা পিকেটিং করেছিলেন। অধিকাংশ ছেলেই আসেনি। যারা এসেছিল তারাও ইতস্তত করতে লাগল। হেডমাষ্টার মশাই কম্পাউণ্ডের ভেতর থেকে উৎসাহ দিলেন চলে এস তোমরা, কাম অন, বয়েজ।

ছেলেরা স্কুলের দিকে পিঠ ফেরায়। হেডমাষ্টার মশাই গর্জন করলেন, যারা পরীক্ষা দেবে না তাদের নাম খাতা থেকে কেটে দেবো আমি। ফ্রী স্টুডেণ্টশিপ, হাফ্ ফ্রী, সব বন্ধ হবে।

ছেলেরা সমস্বরে কলরোলে জবাব দিল বন্দে মাতরম। সেই মাথা উঁচু অবিনয়ের দিকের চেয়ে মাস্টার মশাই আর কিছু বলতে সাহস পেলেন না। একে একে সবাই ফিরে গেল।

গেল না শুধু এস্, ডি, ওর ছেলে প্রবীর, পুলিশ ইনসপেক্টরের ভাইপো আজিজ, সাব ডিপুটির বাড়ি খাওয়া পরার সুযোগ নিয়ে যে ছেলেটি ছিল, সেই বীরেশ, ননী, আর শুভাশীষ।

যাদের ডিঙিয়ে ওরা স্কুলে ঢুকলো, তাদের মধ্যে অনেকেই পাড়া সম্পর্কে মাসি পিশি। উকিল পাড়ার দিদিমাও ছিলেন। সত্তর বছরের বর্ষিয়সী মহিলা, সিনিয়র উকিল প্রভাস বাবুর মা।

ডিঙিয়ে যাবার সময় ছেলেদের পায়ের জুতোর ধুলো স্বেচ্ছা সেবিকাদের গায়ে ঝরে পড়ল।

এই পরীক্ষায় প্রথম হওয়ার লজ্জা শুভাশীষ লুকোবে কোথায়। হাঁটুতে লুকোন উটপাখি মুখ, কিন্তু কতক্ষণ। এ মুখ তুলতেই তো হবে। চোখ বুজেও দেখতে পেল সহপাঠিদের মুখে কুণ্ঠাহীন বিদ্রূপ, কৃপাণের

মতো বাঁকা ঠোঁট। শুনল অনর্গল গলার টিটকিরি। ওকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে একজন যেন বললে এই সেই। ফার্স্ট নয়। পয়লা ছাত্র। আর সবাই এক সঙ্গে বলে উঠল, পয়লা নম্বরের ভীরু। সেই ছেলেদের হাতে নিশান। এক তালে পা পড়ল ওদের, চলে গেল এক পথে। শুধু শুভাশীষ আলাদা আলাদা পথে বাড়ি ফিরে এলো। মাথা হেঁট, মুখ চুণ।

আবার দেখল নোটীশ বোর্ডে পাঁচটা নাম টাঙানো। এক এক করে ছেলেরা আসছে, আর থুথু ছিটিয়ে চলে যাচ্ছে। নোটিশটার শিরোনামায় লেখা ছিল উত্তীর্ণ ছাত্রদের নাম। একজন এসে ওপর দিয়ে আর একটা কাগজ সেঁটে দিয়ে গেল "বেইমানদের নাম"।

বেইমান। শুভাশীষ কি বেইমান? সমস্ত প্রতিবাদ উষ্ণ কয়েক ফোঁটা জল হয়ে চোখ থেকে চিবুকে, চিবুক থেকে হাঁটুতে ঝরে পড়তে লাগল।

মনে মনে, যেন সহপাঠিদের লক্ষ্য করে, শুভাশীষ বলতে লাগল, আমিও পাড়ি। আমিও পাড়ি। সব মাথা ছাড়িয়ে নির্ভয় নিশান তুলতে। সবার সঙ্গে না মিলিয়ে চলতে। দেবাশীষের ছেলে, সে কি অশঙ্ক কণ্ঠে উচ্চারণ করতে পারে না "বন্দেমাতরম?"

পারে। কিন্তু—।

সেই কিন্তুও রয়েছে "বন্দেমাতরম" ধ্বনির মধ্যে। মাকে বন্দনা করি। সেই মাকে? যিনি সুজলা, সুফলা? কিন্তু সেই মলয়জশীতলা শস্যশ্যামলা মার রূপ কিছুতেই শুভাশীষের ধারণায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। যেন একটা ভৌগলিক সংস্কার। মানচিত্রের রেখা সমষ্টি।

মার দুঃখ ঘোচাতে ত্রিংশকোটি কণ্ঠ কল কল নিনাদ করে ওঠে।

সুজলা নয়, সজলা মা বলতে যে রূপ শুভাশীষের মনে ভেসে ওঠে তিনি সর্বদাই অশ্রুমতী। জীবনের কাছে কিছুই পাননি, একে

একে সব গেছে। আয়ুর অর্ধেকটা খরচ হয়ে গেল, আজও মনের মত ঘর নিজের ঘর রচনা হ'ল না। স্বামীকে পারলেন না ধরে রাখতে। একজন বার বার ফাঁকি দিয়েছে, আর একজনকে প্রাণপণে আঁকড়ে আছেন।

মা যেন শেষ রাতের আকাশ। শুভাশীষ সেই আকাশের শেষ তারা।

সরমাদির সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা শুভাশীষ মাকে সেইদিনই বলেছিল। দেবাশীষ গ্রেপ্তার হয়েছেন, সে কথাও।

বলেই উৎসুক চোখে চেয়েছিল মার দিকে। কী বলেন শুনবে। কিছুই বললেন না। মিনিট দুই অন্য মনস্কের মতো চেয়ে রইলেন। তার পর হঠাৎ ধমক দিলেন, তুই লেখা পড়া কিছু করিস না। খালি বাইরে বাইরে ঘুরবি, তোকে নিয়ে কী করি বল তো?

হঠাৎ একদিন মা জিজ্ঞাসা করলেন, হ্যাঁরে, এত যে কাগজটাগজ দেখিস, খবর আছে কিছু?

—কী খবর, মা?

মা চট করে কোন জবাব দিতে পারলেন না। খানিক পরে আস্তে আস্তে বললেন, কবে এসব শেষ হবে?

—যত দিন স্বাধীনতা না আসে, মা।

স্বা ধী ন তা। স্বা ধী ন তা। মা ধীরে ধীরে পুনরুচ্চারণ করলেন, যেন শব্দটা চারটা অক্ষরের সমষ্টি মাত্র। একটু পরে আবার বললেন ততদিন,—ততদিন এই ধরপাকড় চলবে? যাদের ধরে রেখেছে, তাদের ছাড়বে না? মা বুঝি কৌশলে দেবাশীষের মুক্তির দিনটি জেনে নিতে চাইছেন।

একদিন বিকেলের গাড়িতে খবরের কাগজ এলোনা। কেন, জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে শুভাশীষ জানল, সব কাগজ বন্ধ। সরকার কি হুকুম দিয়েছিল। এরা সে হুকুম মেনে নেয়নি।

দেশের সঙ্গে ক্ষীণ বন্ধন সূত্রটি ছিন্ন হ'ল। হ'ল, তবে পুরোপুরি না। একটুখানি রইল।

"সত্যাগ্রহ সংবাদ। সাইক্লোস্টাইল যন্ত্রে ছাপা এক পৃষ্ঠা কাগজ তাতে সারা ভারতের খবর। ছাপা হয় গোপনে, ছড়ায় গোপনে। তাই নিয়েই কাড়াকাড়ি। ভোর বেলা কারা সেঁটে দিয়ে যায়, ট্রেজারি বিলডিঙে, জেলখানার দেয়ালে, ফৌজদারি আদালতে, ডাকঘরে, রেল ষ্টেশনে। রোদ ওঠে, লোকে হুড়মুড় করে ভীড় করে খবর পড়তে। ত্রিশকোটি মানুষের অশস্ত্র অভ্যুত্থানের রোজনামচা।

শাস্ত্রীদের অস্বস্তী লাগে। সঙ্গীন কাঁধে ট্রেজারি বারান্দাটা এপার ওপার করে। জঙ্গী কেতায় য়্যাবাউট টার্ণ করে। সন্দিগ্ধ চোখে তাকায়। হেঁকে উঠে, হঠ যাও সব হঠ যাও।

হটে অনেকে, অনেকে হটেও না। "সত্যাগ্রহ সংবাদের" প্রচার বন্ধ থাকে না। হাতে হাতে মুখে মুখে ছড়ায়। শহর থেকে গ্রামে গ্রাম থেকে প্রান্তরে। প্রান্তরের পরেও, বনরাজিনীলা দিগন্তের ওপারেও যদি কিছু থাকে, সেখানেও।

ইস্কুলে পড়শোনা এক রকম বন্ধ। ছাত্র কই যে পড়বে। মাষ্টার মশায়েরা আসেন, চাকরীর মায়ায়। নাম ডাকার পর নাম মাত্র বই খোলা হয়, পড়া এগোয় না। অনেকে তো রীতিমত ঝিমোন। কোন দিন বা আবদার হয়, আজ পড়ব না, গল্প বলুন স্যার।

অতুলবাবু নতুন এসেছেন। বি, টি, ইংরিজির শিক্ষক। গল্প? কী গল্প বলব।

ইতিহাসের।

ইতিহাসের কী গল্প বলব তোমাদের। কে জানে 'তোমাদের' কথাটায় প্রচ্ছন্ন কোন ঝোঁক থাকে কি না। চল্লিশটি ছেলের মধ্যে মাত্র সাত আটজন এসেছে। এই ক'জন তবু আসছে বলে ইস্কুল একেবারে বন্ধ হয়নি, মাস্টার মশায়দের চাকরী বজায় আছে, তবু অতুল বাবুর চোখে যথোচিত কৃতজ্ঞতা কই। কী আছে ওঁর দৃষ্টিতে? এই ক'টি ছাত্রের রাজভক্ত অভিভাবকদের প্রতি ঘৃণা? বশম্বদ এই ক'টি শিশুর প্রতি করুণা? হয়ত দু'টোই।

স্পষ্ট বোঝা যায়, রোজই এসে মাস্টার মশায়দের উৎসুক চোখ পড়ে প্রথম সারের বেঞ্চিতে, যেখানে বরাবর-বসে এসেছে, সতীশ, শশাঙ্ক, মহিম। পরীক্ষায় যারা বরাবর ফার্স্ট, সেকেণ্ড, থার্ড হ'ত। কোনবার এ, কোনবার ও। শুভাশীষের অভিমান হয়। সে যে এত খেটে খুটে প্রথম হ'ল, সেটা যেন এঁরা আমলেই আনতে চাইছেন না। এরও দিয়ে কাজ চালাতে হচ্ছে বটে, কিন্তু তাই বলে তাকে কি ক্রম বলে স্বীকার করবেন। শুভাশীষের দল যেন হঠাৎ বড়োমানুষের মতো। খাতির পায়, সম্মান না।

—ইতিহাসের কী গল্প বলব তোমাদের। ইংরিজি পড়াই, ইতিহাস কি ভালো মনে আছে। চশমার কাঁচ মুছতে মুছতে অতুল বাবু বলেন, তবু শুভাশীষের মনে হয়, আজ যদি প্রথম বেঞ্চের প্রথম আসনে সে না বসে যদি সতীশ বসত, তবে হয়ত মাস্টার মশায় গল্প বলতেন। ইতিহাসের ভুলে যাওয়া পাতাগুলো মেলে ধরতেন ছেলেদের সামনে। দেবাশীষের কথা মনে পড়ল। যে ক'দিন ছিলেন রোজ গল্প শোনাতে বসতেন ওকে। ইতালীর গল্প, আয়র্ল্যাণ্ডের; আমেরিকারও। বোস্টন-বন্দর থেকে চায়ের জাহাজ ফেরৎ যাওয়ার গল্প।

একদিন ক্লাশে এসে অতুল বাবু বললেন, আজ আর পড়াব না।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, সতীশকে কাল বেত মেরেছে থানায় নিয়ে। আবার চুপ। তবু সতীশ বণ্ড্ দেয়নি। বারবার চশমা খুললেন কাঁচ পরিষ্কার করবেন বলে। শুধু কাঁচ নয়, দু' একবার অতুল বাবু লুকিয়ে চোখও মুছে নিলেন কিনা বোঝা গেলনা।

ক্লাশ ছেড়ে যেতে যেতে বললেন, সতীশ হাসপাতালে আছে। ইচ্ছে করলে তোমরা দেখতে যেতে পারো।

দু' দিন পরে শোনা গেল অতুল বাবু গ্রেপ্তার হয়েছেন। বিস্ময়ের গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ল শহরে। অতুল বাবু তো সত্যাগ্রহী নন। নিরীহ স্কুল মাস্টার, এ-লাইনে এসেছিলেন অনেক আশা নিয়ে। উন্নতি করবেন বলে উদ্যমের সঙ্গে পড়ে বি, টি, পর্যন্ত পাশ করেছিলেন। তবে? চশমা-পরা এই ক্ষীণদৃষ্টি শিক্ষকের চোখেও কি তবে স্ফুলিঙ্গ ছিল?

ছিল বই কি। কিন্তু অতুল বাবুর নিজেরও বুঝি তা জানা ছিলনা। প্রতিদিন সকালে উঠে বেড়ানোর অভ্যাস। সেদিনও বেরিয়েছিলেন। ফেরবার পথে লেবু কিনতে বাজারের পথে ঢুকলেন। দেখলেন মদের দোকানের সমুখে তাঁর কয়েকটি ছাত্র। পিকেটিংয়ের প্রথম দল। দোকান খোলা হলেই শুয়ে পড়বে সমুখে, পথের ধুলোয়।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এসে পড়ল পুলিশ দল। অতুলবাবুও দাঁড়ালেন,— একটু দূরে। কিন্তু বেশিক্ষণ না। লাল পাগড়ি দেখেই ছেলেরা সমস্বরে বলল, বন্দেমাতরম। পুলিশগুলো ফিস ফিস করে কী বলাবলি করলে। তারপর বেলা যত চড়ল, উত্তেজনাও বাড়ল তত। ছেলেদের ধ্বনি আর থামেনা। অতুলবাবু তখনো দাঁড়িয়ে, দর্শক মাত্র।

তারপর দোকানের দরজা খুলল, ছেলেরা শুয়ে পড়ল মাটিতে। কনেষ্টবলেরা লাঠি হাতে একটু দূরে সার বেঁধে দাঁড়ালো। অতুলবাবু বুঝলেন আক্রমণের উপক্রমণিকা। নিরুপদ্রব শিক্ষকতার শান্তিপ্রিয়

শোণিতে আর শৃঙ্খলামানা মনে একটা ভয়ের স্রোত বয়ে গেল। তবু নড়লেন না। শেষ পর্যন্ত দেখবেন আজ।

তারপরেই শুরু হ'ল। তাকিয়ে দেখা যায়না, অতুলবাবু মুহূর্তের জন্যে চোখ বন্ধ করলেন। তারপর পা বাড়ালেন। ভেবেছিলেন বাসার দিকে যাবেন। কিন্তু কোথা থেকে কী হ'ল, নিজেও টের পেলেন না। অকস্মাৎ বুঝতে পারলেন তিনি এসে দাঁড়িয়েছেন উদ্যত লাঠিগুলোর ঠিক মুখে, ছাত্রদের আড়াল করে বুক পেতে দিয়েছেন। একটু পরে বোঝারও ক্ষমতা রইল না। পিঠের ওপর আঘাত পড়ল প্রথমে। তারপর কাঁধের ডান দিকে। হাঁটুর ওপর তৃতীয় আঘাতটা। বসে পড়লেন। তখনো দু'হাত প্রতিরোধের ভঙ্গিতে উঁচু। একটু পরেই অনুভব করলেন, কারা যেন তাঁকে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আরো একটু পরে দু'হাতে কড়ি পড়ল।

হাতকড়ি পরানো; অতুলবাবুকে ওরা পায়ে হাঁটিয়ে হাজতে নিয়ে গেল। হাঙ্গামায় চশমা ভেঙ্গে গিয়েছিল, অতুলবাবু দু' একবার হোঁচট খাচ্ছিলেন। রাস্তার দু' পাশে ভীড় জমে গেল। অতুলবাবুর ভ্রূক্ষেপ নেই। ওঁর চোখ সামনের দিকে; সেই অন্ধ চাউনি, যাতে পাতা দুটি খোলা থাকে, কিন্তু দেখা যায়না কিছুই।

পরদিন বিচার। শহরশুদ্ধ লোক ভেঙে পড়েছে আদালতে। কাঠ-গড়ায় আটজন ছাত্রের সঙ্গে অতুলবাবু। কপোল শীর্ণতর, একটু বা ফ্যাকাশে। কিন্তু চোখের এই দীপ্তি এতদিন ছিল কোথায়। দিনরাত পাঠ্য বইয়ের পাতায় গোঁজা থাকতো যে মাথা, সে সহসা এমন উন্নত হ'ল কী করে।

বিচিত্র বিচারের জেরাও বিচিত্র।

সরকারি উকিল একটি ছাত্রকে প্রশ্ন করলেন, নাম? উত্তর হ'ল সত্যাগ্রহী। ঠিকানা?—কংগ্রেস অফিস। দোষী কি নির্দোষ?—ইংরাজের বিচার মানিনা।

হুকুম হ'ল ছ'মাস জেল। সি ক্লাশ। সশ্রম। হাকিম হাঁকলেন, নেক্সট্।

নাম? সত্যাগ্রহী। ঠিকানা? কংগ্রেস অফিস।

এক প্রশ্ন। এক উত্তর। এক শাস্তি।

অতুলবাবুর পালা এল। তিনিও নিজের নাম বললেন না। তিনিও সত্যাগ্রহী। ইংরাজের বিচার মানেন না তিনিও। তাঁর শাস্তি হ'ল এক বছর। কেন না, তিনি তো আর অপরিণত বুদ্ধি ছাত্র নন। যা করেছেন নিজ দায়িত্বেই করেছেন।

সেদিন বিকেলে কাচারির মাঠে আবার সভা হ'ল। হাজার পাঁচেক লোক হ'ল সেই সভায়। শহরের সবাই তো বটেই, আশেপাশের গ্রাম থেকেও অনেকে এসেছে। মঞ্চের ওপর অতুল বাবুর একটি ফোটো। ফুলের মালায় একেবারে ঢেকে গেছে। প্রভাস বাবু, সিনিয়র উকিল—তিনিত প্র্যাকটিস ছেড়েছেন—জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিলেন। বললেন, আজ এক অতুলকে ওরা ধরে নিয়ে গেছে, তাতে কোন ক্ষতি হবেনা, যদি আপনাদের মধ্য থেকে হাজার অতুল এগিয়ে এসে তাঁর স্থান পূর্ণ করেন। তাঁর ত্যাগের আদর্শ ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ুক। তাঁর সাহস বুকে বুকে জ্বলে উঠুক।

সভায় অতুল বাবুর স্ত্রীও এসেছিলেন। শুভাশীষ তাঁকে সেই প্রথম দেখল। আকণ্ঠ ঘোমটা, বোধহয় রাজনৈতিক মীটিংয়ে আসা ওঁর এই প্রথম। প্রভাস বাবুর অনুরোধে তিনিও দু' কথা বলতে উঠতে বাধ্য হলেন। ঘোমটা টেনে নিলেন কপাল পর্যন্ত, আড়ষ্টস্বরে কী বললেন—শুভাশীষ শুধু ঠোঁট নড়াই দেখল—তারপর হঠাৎ চেয়ারে ফের বসে পড়লেন।

সেই মুহূর্তে আকাশ ছেয়ে বৃষ্টি নামার মত চারধার থেকে হাততালি শুরু হ'ল। তারপরই তুমুল জয়ধ্বনি।

কার জয়? ভারত মাতার। আর কার? গান্ধিজীর। আর?

বিস্মিত শুভাশীষ শুনতে পেল, তৃতীয় জয়ধ্বনিটা অতুল বাবুর। দেশমাতৃকা আর দেশবরেণ্য নেতার ঠিক পরেই স্থান পেয়েছেন মফঃস্বল শহরের নিরীহ শিক্ষক।

সামান্য দুঃখবরণও তবে মানুষকে মহত্বের শিখরে প্রতিষ্ঠিত করে। সামান্য ভীরুতা, অন্তঃপুরে অবরোধও কি তেমনি তাকে লোকচক্ষে হেয় করে, বাড়ি ফিরতে ফিরতে বার বার নিজেকে প্রশ্ন করল শুভাশীষ।

মাঝরাত্রে রেল স্টেশন থেকে আবার ভেসে এলো তুমুল জয়ধ্বনি। অতুল মাস্টার আর ছাত্র ক'জন বুঝি চালান হ'ল জেলা সদরে।

এতদিন ধরপাকড় বেশি হয়নি। এবার নতুন কী হুকুম এল ওপর থেকে, ঘরে ঘরে খানাতল্লাসী, ঘরে ঘরে গ্রেপ্তার শুরু হ'ল। ইস্কুলে পড়ানো নেই। আদালতে মামলা নেই—সত্যাগ্রহীদের বিচার ছাড়া। সে বিচারও প্রায়ই একতরফা, জেলখানার ভেতরেই সপারিষদ হাকিম বসেন। সিনিয়র উকিলেরা হাত পা গুটিয়ে ঘরে বসেছেন। জুনিয়রেরা অনেকেই জেলে।

ভীড় যদি থাকে তো কংগ্রেস আফিসে। এত লোক জেলে গেল, তবু স্বেচ্ছাসেবকের নাম লেখাতে লোক আসছে কাতারে কাতারে। অনেকে আবার মফঃস্বলের কর্মী। নির্দেশ নিতে এসেছে। একটা রাত কাটিয়েই আবার অদৃশ্য হবে। গ্রামাঞ্চলে অনেক কাজ। চরকা, তুলো, তকলি,—কংগ্রেসের কাছে লোকের দাবির শেষ নেই। অনেকে আসে সুতো জমা দিতে। মিহি হয়নি সুতো এবারে? এতে একটা ধুতি বোনা হবে না? কতোটা সুতো লাগে একটা কাপড়ে। অনেক প্রশ্ন।

মাঝরাতে স্টেশনে তেমনি সোরগোল উঠে, ডিস্ট্রিক্ট জেলে বন্দীদের চালান দেবার সময়। আর কেউ না থাকে, ঘুমন্ত প্লাটফর্মে কুলিরা তো আছে। তাদের কণ্ঠের স্বতস্ফূর্তি রুখবে কে।

ঘুম ভেঙে চমকে ওঠে শুভাশীষ। সঙ্গে সঙ্গে মা টেনে নেন কাছে। শুভাশীষও সঙ্গে সঙ্গে আঁচলে মুখ লুকোয়। মাঝে মাঝে শুধু ভুল হয়ে যায়। নইলে সে তো ঠিকই করেছে, কোন কিছুতে কান দেয়না। ভালো করে লেখাপড়া করবে, কৃতী হবে। মার ইচ্ছাই তার ইচ্ছা। জোয়ারের তোড়ে দু'পাড় ক্ষয়ে ক্ষয়ে পড়ুক, শুভাশীষ পাড়ে বসে ঢেউ গুণবে।

এরই মধ্যে একদিন শুভাশীষদের চুপচাপ বাড়ীটা কণ্ঠস্বরে মুখরিত হয়ে উঠল।

এতদিন হয়ে গেল এখনো সেই সন্ধ্যাটির কথা শুভাশীষের হুবহু মনে আছে। কলকাতা থেকে বিকেলের গাড়িটা দেরী করে, সন্ধ্যারও পরে, এসেছিল। মা রান্নাঘরে। শুভাশীষ সবে আলো জ্বালিয়ে পড়তে বসার উদ্যোগ করছে। হঠাৎ অনুভব করল, দরজায় কে এসে দাঁড়িয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তাকালো, সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, মা, দেখে যাও দিদি এসেছে।

মা ছুটে এলেন। চারুর পেছনে ছেলে কোলে ঝি। ঝির পেছনে বাক্সবিছানা মাথায় মুটে। হাত বাড়িয়ে মা কোলে নিলেন ছেলেকে। তোর ছেলে এর মধ্যে এত বড় হয়েছে, চারু। সব কথা শিখেছে? বলিস কী। কী নাম রেখেছিস।

প্রাথমিক উচ্ছ্বাস কেটে যেতে চারু বলল, বাবাও এসেছেন, মা। বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন।

বাবা! মার মুখের সব রক্ত শুকিয়ে গেল। একটু পরে ভাঙা বাঁশির

মতো, গলা দিয়ে একটা ফ্যাসফেঁসে আওয়াজ বেরুলো শুধু। বাবা? তোর বাবা, চারু?

—বাবাই তো আমাকে নিয়ে এলেন।

ঠোঁট কামড়ে মা কী যেন চিন্তা করলেন।—ওকে জেল থেকে ছাড়ল কবে?

—দিন সাতেক আগে। ঠিক তখুনি দেবাশীষ ঘরে এসে ঢুকলেন। মার প্রশ্নের উত্তর নিজেই দিলেন।

দেবাশীষের প্রবেশ আর মার অন্তর্ধান, দু'টোই শুভাশীষের মনে স্পষ্ট আঁকা হয়ে আছে।

দেবাশীষ ঢুকতেই যাঁর মুখের পেশি কঠিন হয়ে গেল, মুখ ফিরিয়ে নিশ্চিত পায়ে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন, সেই মাকে শুভাশীষ চেনে। কিন্তু যে দেবাশীষ মাথা নীচু করে অনিশ্চিত ভাবে তাকাতে তাকাতে ঘরে এসে দাঁড়ালেন, তাঁকে?

এর আগে আরো একবার এসেছিলেন দেবাশীষ। দুর্যোগের রাত্রে ভিজতে ভিজতে এসে বলিষ্ঠ হাতে দরজায় আঘাত করেছিলেন। খদ্দরের ধুতির এখানে ওখানে ছেঁড়া। চোয়ালের হাড় উঁচু।

সেবারে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে এসেছিলেন। এবারেও তাই। কিন্তু দু'জন কি এক। যে চোখ দুটি অহরহ জ্বলত, সে দু'টি চোখ কোথায়। কোথায় গেল দীর্ঘ, কালো, অবিন্যস্ত চুল। জেলের কষ্ট? জেলখানায় ক'দিন বাস করলেই কি চুল এত পাকে, শুধু পাকে না, বিরলও হয়ে আসে? আর, দেবাশীষের গাল দু'টি বরাবরই ভাঙা-ভাঙা, কিন্তু এত রেখা এল কোথা থেকে। সময়ের মাকড়শা এই ক'বছরে অদৃশ্য হাতে জাল বুনেছে মুখের ওপরে।

প্রণাম করবে বলে মাথা নোয়ালে শুভাশীষ; দেবাশীষ তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। সেই স্পর্শ, শীর্ণ আঙুলে সেই স্নেহের আর্দ্রতা,

পাঁজরওঠা বুকে সেই তপ্ত অতৃপ্তি। কিন্তু দেবাশীষের হাত এমন কাঁপছে কেন। আগেতো এমন হ'ত না।

বাবার বুকে মুখ মিশিয়ে শুভাশীষ অনুভব করল, বাবা হঠাৎ যেন বড়ো বেশি বুড়ো হয়ে গেছেন।

মা ফের রান্নাঘরে গিয়ে বসেছিলেন। চারু ছেলে কোলে সেখানে এল।

—আয় চারু। মা একটা পিঁড়ি দিলেন।

চারু পা ছড়িয়ে বসল।—কী রাঁধছ, মা। আবার নতুন করে চাল চড়ালে বুঝি।

মা হাসলেন। এ সব প্রশ্নের জবাব দেবার প্রয়োজন নেই। উনুনের ধোঁয়ার দিকে অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন।

হঠাৎ চারু ডাকলে, মা! আচ্ছা তুমি কী বলো তো। দিন দিন বুদ্ধি শুদ্ধি সব কি লোপ পেয়ে যাচ্ছে? বাবা এতদিন পরে এলেন, আর তুমি তার সঙ্গে একটা কথাও বললে না।

বিয়ে হয়ে মার সমকক্ষ হয়েছে চারু। আগে গুরুজনদের সামনে মুখ খুলতো না যার, সে ধমক দিতেও শিখেছে।

—যা বুঝিস না চারু, তা নিয়ে কথা বলতে আসিস কেন।

জামার বোতাম ঢিলে করে দিয়ে চারু খোকাকে দুধ দিতে লাগল। আস্তে আস্তে বলল, তোমার যে শুধু মাথার ঠিক নেই তা নয়, মা। রাগে অন্ধ হয়ে চোখ দু'টিও খুইয়ে বসে আছ। দেখতে পাও না, বাবার চেহারা আধখানা হয়ে গেছে? কী মানুষ কী হয়ে গেছেন? ওঁকে এখন খুব যত্ন করা দরকার, নইলে—নইলে বেশিদিন বোধহয় বাঁচবেন না।

—একলা এসে উঠতে ভরসা পায়নি, তাই বুঝি তোর বাবা তোকে উকিল নিয়ে এসেছে, চারু?

মার কথায় কর্ণপাত না করে চারু বলে গেল,—জেল থেকে বেরিয়ে আমার ওখানে যখন গিয়ে উঠলেন, আমি তো চিনতেই পারিনি, হাড় বেরিয়ে পড়েছে, মাথার চুল পাকা, পাৎলা; একটু যেন কুঁজোও হয়ে গেছেন। বাবাকে কতো করে বললাম আমার ওখানে ক'দিন বিশ্রাম করতে। উনি কিছুতেই রাজি হলেন না। শেষে তোমার জামাই আমাকে ওঁর সঙ্গে দিয়ে দিলেন।

মা সম্মোহিতের মতো চেয়েছিলেন চারুর দিকে। যেন যে কথা বলছে, সে চারু নয়, অন্য কেউ। অসঙ্কোচে ছেলেকে স্তন দিতে দিতে পাকাপাকা কথা বলছে, একি চারু,—তাঁর মেয়ে চারু? এই তো সেদিন হ'ল ও; উঠোনের মাঝখানে আঁতুর ঘর তৈরি হয়েছিল। শেষ রাতে ঢুকলেন ওখানে। খুব কষ্ট পেয়েছিলেন সেবারে, মনে আছে। আর তেমনি বৃষ্টি। উঠোনে জল দাঁড়িয়ে গেল; তিনদিনেই নিয়ম বিসর্জন দিয়ে মেয়ে নিয়ে বড়ো ঘরের বারান্দায় এসেই উঠলেন। ছেলেবেলায় কী কাঁদতো চারু; সারারাত চোখের দু'পাতা এক করতে দিতোনা। চারু হাঁটতে শিখেছে দেরিতে, কথা বলতে শিখেছে দেরিতে। এমন কি মাঝে মাঝে ভয়ই হ'ত তাঁর—মেয়েটা বোবা না হয়। চারুর মাসিমা শোভাকে জিজ্ঞাসা করতেন, বোবা হবেনা কী বলিস? শোভা হেসে বলত, না দিদি, সে ভয় নেই। তোমার মেয়ের কান কেমন সজাগ দেখতে পাও না? জন্ম বোবা হলে তো কানে শুনতে পেত না। কথা ফুটল চারুর, হাসতেও শিখল, কিন্তু বোকাবোকা ভাব গেল না। সেই চারুরও বিয়ে হ'ল, ছেলে হ'ল, গিন্নি হয়ে ফিরে এল বাপের বাড়ি। এখন হঠাৎ চালাকের মতো কতো কথা বলছে চারু।

মা সব কথা জানতেন না, নইলে বুঝতে পারতেন, মানুষ চালাক হয় অবস্থার ফেরে। জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে লড়াইয়ের মতো, বাকে-

ঘর করতে হয়েছে আজ রোহিণী, কাল দু' দু'জন নার্সের সঙ্গে, অন্তত আত্মরক্ষার জন্যেও তার খানিকটা বুদ্ধি চাই বই কি।

ফুটন্ত হাঁড়িতে হাতা ডুবিয়ে মা গোটা কয়েক ভাত তুললেন। টিপে টিপে পরীক্ষা করলেন সিদ্ধ হয়েছে কিনা। তারপর হাঁড়ি নামিয়ে ফেন গালতে গালতে বললেন, তুই ছেলেমানুষ চারু। তোকে তোর বাবা ভুল বুঝিয়েছে। ও বিশ্রাম করতে আসেনি। শরীর সারাতে না। আমাদের টানেও না। এবারেও আমাদের একটা কোন সর্বনাশ করে যাবে ঠিক করে এসেছে।

—বাবা তো আমাদের কোন ক্ষতি করেন নি মা?

—করেন নি? মা হাসলেন, তোর তো মনে থাকা উচিত চারু, তুই তো তখন নেহাৎ ছোট ছিলি না?

আভাসে ইঙ্গিতে কথা বলে চারু শ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। হঠাৎ জোর দিয়ে বলল, তোমার মনে যদি সরমাদির কথাটা থাকে মা, নেহাৎ ভুল ধারণা। সব কথা এবার বাবার কাছে শুনেছি। সরমাদিকে উনি নিয়ে যাননি, ট্রেনে দু'জনের হঠাৎ দেখা হয়েছিল। মিছিমিছি মনে একটা সন্দেহ পুষে নিজেও কষ্ট পাও, অন্যকেও দাও।

মিছিমিছি সন্দেহ? কড়ায় তেল ঢালতে ঢালতে বিভা ভাবলেন, মেয়েকে সব কথা বলা যায়না, নইলে বুঝিয়ে দিতেন এ-সন্দেহ মিথ্যে প্রমাণ হলে তাঁর চেয়ে কেউ সুখী হ'তনা। স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক কোথায় গিয়ে পৌঁছলে বাপের হয়ে মেয়েকে মার কাছে কথা বলতে হয়।

দেবাশীষকে কতটুকু চেনে চারু। বিভা দেখছেন পোনেরো বছর বয়স থেকে। দীর্ঘ বিবাহিত জীবনের দিকে আজ পেছন ফিরে তাকালে একটানা ব্যর্থতাই চোখে পড়ে; সীমাহীন সৈকত, মাঝে মাঝে বালির ওপর চাপ-চাপ রক্ত জমে আছে।

মৃদুস্বরে, কতকটা আপনমনে, বিভা বললেন, তুই জানিসনা চারু।

চারু জানেনা বিভার কৈশোরের সেই উপবাসখিন্ন যজ্ঞধূমারুণ দিনটির কথা। তখনো মনের সব ইচ্ছা ভালো করে রূপ নেয়নি। দুটি শীর্ণ হাতে দেবাশীষকে বাঁধতে গিয়েছিলেন। পারেননি। বিয়ের একমাসের মধ্যে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল দেবাশীষ। কত চিঠি লিখেছিলেন বাবা, কত লোক দিয়ে খবর করিয়েছিলেন, কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।

আবার যখন এসে উদয় হ'ল দেবাশীষ, বিভার বয়স তখন আঠার। শরীরে তখন পরিণতি এসেছে, মনের কামনার রূপ আর অস্পষ্ট নয়। এত অভিমান জমে ছিল মনে, এত অভিযোগ মনের স্তরে স্তরে, কিন্তু স্বামিসান্নিধ্যের উত্তেজনায় সব কথা ভুল হয়ে গেল। একটি রোমশ বলিষ্ঠ বুকে ভিজে চোখ রেখে আস্তে আস্তে শুধু বলেছিল, ভালো ছিলে?

ভালো? ভালো মন্দ জানেনা দেবাশীষ, তবে ছিল। কানপুরে প্লেগ রোগীর তত্ত্বাবধানে, উত্তরবঙ্গের বন্যাত্রাণে, হরিপুরের মেলায় তীর্থযাত্রীদের স্বেচ্ছাসেবায়। অনেক দেশ, অনেক মানুষ। কঠোর শ্রমে পুষ্টতর পেশি, মলিনতর রঙ। বিভা সেবায়, অনুরাগে সব ক্লান্তি মুছে দিতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু কাকে। কয়েকমাস না যেতে আবার পালালো দেবাশীষ। যৌবনমধ্যাহ্নের উৎসবের দীপটি জ্বলে উঠতে না উঠতেই নিবে গেল। চারু কোলে এল; তাই। নইলে কী নিয়ে বিভা ভুলতেন সেই গ্লানি। তারপর আবার এসেছিল দেবাশীষ। আবার যখন চলে গেল, তখন বিস্ময় ছিলনা, আঘাত ছিল। এবারেও দেবাশীষ ক্ষণদাম্পত্যের অভিজ্ঞান রেখে গেল: শুভাশীষ।

তারপর ধীরে ধীরে রক্তের সাড়া ক্ষীণ হয়ে এল, আশা আকাঙ্ক্ষা, বেদনা সব কিছুর বোধ স্তিমিত হ'ল। তবু যতবার দেবাশীষ ফিরে এসেছে, ততবারই উৎসুক দু'টি বাহুতে স্পন্দন লেগেছে। আশা হয়েছে

দীর্ঘ পথচারীর শেষে এতদিনে বুঝি শ্রান্তি এসেছে দেবাশীষের ; যাযাবর মন গৃহমুখী হয়েছে। বেশি কিছু তো চাননি বিভা ; সব কামনার ডাল-পালা ছেঁটে নিজের ন্যূনতম আশাটুকু রেখেছিলেন : তাঁর ছেলে, তাঁর মেয়ে, তাঁর স্বামীকে নিয়ে ছোট একটি সংসার।

আবার এলো অসহযোগ আন্দোলন। দেবাশীষ নিরুদ্দেশ হ'ল।

জেলখানা আর বাইরের জগৎ ; বাইরের জগৎ আর জেলখানা—দেবাশীষের সমস্ত জীবন এই শাদাকালো দাবার ছকে আঁকা। মাঝে মাঝে ফিরিয়ে নিতে এসেছে।

সে সমস্তই তো অতীত, ইতিহাস। আজ তো আর এসব ভেবে কাজ নেই। যে সর্বনাশা বয়স বিভাকে বারবার সব আঘাত-অপমান ভুলিয়েছে, সে বয়স কবে বিদায় নিয়েছে। আজ এই অবসন্ন অপরাহ্ণে দেবাশীষকে দেবার কিছু নেই, ওর কাছ থেকে নেবার কিছু নেই। জীবনের বাকিটুকুর যে পরিকল্পনা বিভার মনে, তাতে দেবাশীষের কোন স্থান নেই। আবেদন নেই, তাই আঘাতও নেই। না আবাহন, না বিসর্জন।

বাল্যে পিতা, যৌবনে স্বামী। বিভার দুটোই কেটেছে বাবার আশ্রয়ে। শেষ বয়সের ভরসা শুভাশীষ। ওকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে সস্নেহে সিঞ্চনে। ও যেন পূর্বপুরুষের সর্বনাশা ঘরছাড়ার ডাকের উত্তরাধিকার না পায়।

ডাল তরকারি বাটিতে সাজাতে সাজাতে বিভা চাপা স্বরে বললেন, আজ ও কেন এসেছে জানিস।

চারু জিজ্ঞাসু চোখে তাকালো। বিভা বললেন, আমার সঙ্গে জীবনভোর শত্রুতা ; ওর সাধ এখনো মেটেনি। তাই ফুরসুৎ পেতে না পেতে শুভাশীষকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে এসেছে।

—ছিনিয়ে নিতে, মা?

—ছিনিয়ে নিতে। বিভা দৃঢ়স্বরে বললেন। নইলে, তুই কি মনে করিস ও স্নেহের টানে এসেছে? স্নেহ, মায়া, ভালবাসা—এসব ওর রক্তে নেই চারু। চারধারে স্বদেশির গোলমাল চলেছে; রোজ ধরপাকড়। আমি কত কষ্টে শুভাশীষকে এ-সব থেকে দূরে রেখেছি, সে যদি তুই জানতিস। ও শুভাশীষকে এর মধ্যে টেনে নামাতে এসেছে।

কিন্তু তা হবেনা, বিভা অস্বাভাবিক ঝোঁক দিয়ে বললেন,—ওকে এই বাজি জিততে দেবোনা।

সামনে বইয়ের পাতা খোলা, কিন্তু শুভাশীষের মন নেই। সেও বিমূঢ় হয়ে গেছে দেবাশীষের এই হঠাৎ এসে পড়ায়। বিছানার ওপর দেবাশীষ চোখ বুঁজে শুয়ে, শুভাশীষ মাঝে মাঝে আড়চোখে চেয়ে দেখছে। কেন এসেছেন,—মার এই প্রশ্নটা ওর মনেও! অকস্মাৎ শুভাশীষের মনে হ'ল, বাবা নিজের ইচ্ছায় আসেননি, ওঁকে কংগ্রেস থেকে পাঠিয়েছে এখানে। এই ছোট মফঃস্বল সহরে নেতা নেই। দেবাশীষ সেই শূন্য স্থান পূরণ করবেন। পিকেটিং-এ নেতৃত্ব করবেন, সভায় বক্তৃতা দেবেন, —প্রভাসবাবুরা যেমন দিতেন।

বই বন্ধ করে শুভাশীষ বিছানায় চলে এলো। ফিস ফিস করে ডাকলো, বাবা!

দেবাশীষ চোখ মেললেন।

—এখানে রোজ কী ভীষণ পিকেটিং হয় জানো বাবা? আর লাঠি-চার্জ। আমি দেখেছি। আচ্ছা, লাঠি খেয়েও ওরা ফিরে মারে না কেন। জেলে ধরে নিয়ে যায় সবাইকে এক সঙ্গে। তুমি যখন জেলে ছিলে বাবা, ওরা তোমাকে খুব কষ্ট দিতো, মারতো? এখানে সব ছেলের ফ্ল্যাগ দিয়ে তৈরি ব্যাজ আছে, আমাকে তুমি কিনে

দেবে? এখানে রোজ মীটিং হয়, জানো? কাল তুমি আর আমি যাবো।

—খোকা!

দরজার আড়াল থেকে বিভার গলা শুনে শুভাশীষের মুখ শুকিয়ে গেল।

থমথমে মেঘমুখ দেখেই অনুমান করেছিল বর্ষা আসন্ন। কিন্তু মা শুধু বললেন, করছিলি কী। সামনে পরীক্ষা মনে নেই।

অভিমানে কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে এল শুভাশীষের। বলল; অনেক দেরি, মা। একটুখানি গল্প, করব না?

না।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে শুভাশীষ স্বপ্ন দেখল, একটা নৌকায় শুধু সে আর তার বাবা। আদিগন্ত ঢেউ, দু'টি টলমল অস্তিত্ব; জল সাঁতরে সাঁতরে ক্লান্ত দৃষ্টি ডাঙ্গা খুঁজে না পেয়ে কত দূরে গিয়ে ঘুরে মরে ঠিক নেই। হাল ধরে কে স্থির বসে আছেন, এত যে স্রোত তবু কাঁপছে না, কিন্তু শুভাশীষের বুক দুরু দুরুর শেষ নেই। যতবার চেঁচিয়ে ডাকতে চেষ্টা করল "বাবা," ততবার ব্যর্থ হল, কণ্ঠনালী ছিঁড়ে অস্পষ্ট একটা গোঙানি বেরুলো শুধু।

মা ঠেলে দিলেন ওকে। কী হল কী হল খোকা। অমন করছিস কেন। জল খাবি?

জল খেয়ে আবার শুয়ে পড়ল শুভাশীষ। আচ্ছন্ন গলায় শুধু জিজ্ঞাসা করল, রাত ভোর হতে কত বাকি মা।

—অনেক। তুই ঘুমো দিকি।

অনেকক্ষণ চুপ করে পড়ে রইল শুভাশীষ। তবু কি ঘুম এল। বিমূঢ়তা কেটে গিয়ে এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে স্বপ্ন নয়। অনেক আগে

হারানো একটি ভোরের স্মৃতিই অনেক বছরের উজান ঠেলে ভেসে উঠেছে মনে। সেদিন দেবাশীষের শেখানো গীতার শ্লোক ক'টি মনে মনে আবৃত্তি করতে চেষ্টা করল :

পশ্যামি দেবাংস্তব দেবদেহে—

তারপর আর কিছুতেই মনে এল না।

তারপর এই বর্তমানের আধঘুম দুধধবল তরলতার ওপর ধীরে ধীরে পুরণো দিনের একটি সর পড়ল। সেবার এসে যে ক'টা দিন ছিল দেবাশীষ, তার প্রতি মুহূর্ত মনে পড়ল একে একে। ভাবতে ভাবতে ঘুমের মাকড়শা শেষ জালটুকুও ছিঁড়ে দিয়ে পালিয়ে গেল, উত্তেজিত একটা অস্বস্তি মোচার খোলায় ভাসানো মৃত প্রদীপের মত পুরনো দিনের উজানে অনিশ্চিত গতিতে এগোতে লাগল।

অনেকক্ষণ প্রতীক্ষা করে ছিল শুভাশীষ। জানত এক্ষুণি বাবা উঠে আসবেন। তিনটি টোকা দিয়ে নির্ভুল ইশারায় ডাকবেন, খোকা উঠে আয়।

তারপর, এই লোহা রাতের আকাশে সীসেভোরের রঙ ধরবার আগেই একখানি নৌকো ভাসবে।

অনেকক্ষণ, অনেকক্ষণ কেটে গেল। ওদিক থেকে কোন সাড়া এলনা। কখন ঘুম এসেছিল ঠিক নেই। চারুর ছেলের কান্নায় ঘুম ভেঙে গেল।

ছেলে কোলে চারু ঠিক শিয়রে দাঁড়িয়ে। বলল, তোর কী ঘুম খোকা। সেই কখন থেকে ডাকছি হুঁশই নেই? ওকে একটু কোলে নিবি ভাই? আমি কাপড় কেচে আসি।

উঠে বসল শুভাশীষ। চোখ কচলাতে কচলাতে বলল; বাবা কোথায় দিদি?

ওদিকের খাটটার দিকে আঙুল দেখিয়ে চারু, বলল, ওই যে।

মশারি ফেলা আছে দেখছিস না? বাবা এখনও ঘুম থেকে ওঠেনই নি।

ঘুম থেকেই ওঠেননি, এত বেলা হয়ে গেছে, তবু? পূবের দরজা ভেজানো, তবু চাটাইয়ের ফাঁক দিয়ে দিয়ে সারা ঘরে আলোর ছিটে পড়েছে, এখনও বাবা ঘুমুচ্ছেন দেখে শুভাশীষের অবাক লাগল। মনের কোনে স্বপ্নের সেই নৌকো তখনও নোঙর করা ছিল, সেটা এতক্ষণে দড়ি ছিঁড়ে যেন অকস্মাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। আরোহী ছাড়াই।

দেবাশীষ উঠল আরও এক ঘণ্টা পরে। বিছানায় শুয়ে শুয়েই ফরমাস করল, কই চারু আমার চা কই। খোকা একটু মাজন এনে দে।

মাজন ছিলনা, শুভাশীষ ছোট একটা ডাল এনে দিল। সেটা নাড়াচাড়া করে দেবাশীষ বললেন, ওরে বাবা, এযে দাঁতন। বাঁধান দাত, একি সহ্য হবে।

মশারিটা নিজের হাতেই তুলে ফেলেছেন বাবা। মুখের হাঁ যথাসম্ভব বড় করে আলগা দাঁতের পাটি মাড়িতে সেট করছেন।

এতক্ষণে, এই দিনের আলোয়, স্পষ্ট দেখতে পেল শুভাশীষ। গলিত দন্তই শুধু নয়, এচিং ছবির মত মুখের রেখাই নয়, আরও নিচে, রোমশ বুকের নিচে, থলথলে তলপেটে একটু ভুঁড়ির আভাস।

স্থূল তৃপ্তি, শ্লথ ক্লান্তি। এর নামই কি বয়স।

তবু, প্লেটে চা ঢেলে দেবাশীষ যখন একটু একটু করে চুমুক দিচ্ছেন, শুভাশীষ ফিরে এল।

দেবাশীষ ভুল বুঝলেন, বললেন, একটু খাবি?

শুভাশীষ বললে, না।

তারপর; এদিক ওদিক তাকিয়ে জামার ভাঁজ থেকে বার করল ছোট্ট একটু কাগজ।

"সত্যাগ্রহ সংবাদ"। অন্য কোন পত্রপত্রিকা নেই, সাইক্লোস্টাইলে ছাপা এই একপৃষ্ঠা কাগজেই সারা ভারত প্রতিবিম্বিত।

দেবাশীষ কাগজখানা টেনে নিলেন। এপিট ওপিট চোখ বুলিয়ে আবার ফেরৎ দিলেন। একবার শুধু নিস্পৃহ স্বরে বললেন, তুই এ কোথায় পেলি।

এক সঙ্গে সব কথা বলতে গিয়ে শুভাশীষের অবস্থা ওলটানো বোতলের গলার মত হল। মনে মনে একটা সোৎসাহ বিবরণী তৈরি করেছিল, কিন্তু যতবার শুরু করতে চেষ্টা করল, ততবার দৃষ্টি ঘুরে ঘুরে পড়ল নাভিকেন্দ্রিক বর্তুল ভুঁড়িটির ওপর।

শেষ পর্যন্ত তবু না বলে পারল না। কাল সন্ধ্যাবেলাকার অসমাপ্ত কথা দিয়েই শুরু করল।—এখানে রোজ পিকেটিং হয়, জান বাবা?

ঠিক সেই মুহূর্তে শব্দ করে খুলে গেল দরজা। চকিত দেবাশীষ আর শুভাশীষ দুজনেই ফিরে তাকাল। মা। হয়ত আড়ালেই ছিলেন, কিম্বা রান্নাঘরে। আগুনে তাতা মুখখানা টকটকে লাল, এলোচুল গিঁট করে বাঁধা, সিঁথি আর কপালের সীমান্ত ঘামে ভিজেভিজে।

ছেলের দিকে তাকিয়ে বিভা স্পষ্টস্বরে বললেন, খোকা বাইরে যা। আর, যে মুহূর্তে চৌকাটের বাইরে পা দিল শুভাশীষ, অমনি ক্ষোভে আক্রোশে কান্নায় ফেটে পড়ল তাঁর গলা: কেন, কেন তুমি এসেছ?

এই চারটি শব্দ উচ্চারণ করতেই বার কয়েক গলা কেঁপে গেল, দরজার আড়ালে শুভাশীষের পা-দুটোও কাঁপছে। তবু দাঁড়াল, চৌকাট ধরে, বেড়ায় ঠেস দিয়ে।

কেন, কেন তুমি এসেছ।

চাপা স্বর, তবু তীব্র। রুষ্ট, তবু কান্নাক্ত।

কেন বার বার আস তুমি। কেন, কেন?

আড়াল থেকে শুভাশীষ কল্পনা করতে চাইল দেবাশীষের মুখখানা, কিন্তু দেখল নাভিমূলের পাকা চুলটি ছাড়া আর কিছু মনে পড়ল না।

—তুমি ভুল করেছ বিভা। অনেকক্ষণ পরে দেবাশীষের কুণ্ঠিত গলা শোনা গেল, চারু তোমাকে কিছু বলেনি ?

মা হয়ত শুনতেই পেলেন না। দ্রুত বলে গেলেন, তোমার তো দেশ আছে, সেই দেশের ত্রিশ কোটি ছেলে আছে, কিন্তু আমার তো মোটে ওই একটি। তোমার পায়ে পড়ি,—বলতে বলতে কণ্ঠ রুদ্ধ হল বিভার, তবু কান্নার প্রবাহের নিচে ডুব সাঁতারু স্বর শোনা গেল, তোমার পায়ে পড়ি ওকে ছিনিয়ে নিও না। তুমি মানুষ না। তোমার মায়া নেই, মমতা নেই, নইলে বুঝিয়ে বলতাম। কত কষ্টে খোকাকে মানুষ করছি আমি। ও যদি বড় হয়—

দেবাশীষ বাধা দিয়ে বললেন, আমিও তাই চাই বিভা। তুমি এখন উত্তেজিত। নইলে সব তোমাকে বুঝিয়ে বলতাম। চারু সব জানে ; ওকে জিজ্ঞাসা কর, বলবে।

টাকা ধার নিয়ে শোধ দেয়নি, তবু আবার চাইছে। মার চোখে সেই পাওনাদারের অবিশ্বাস। বললেন, চারুর দরকার নেই। তোমার মুখেই শুনব।

ভেবেছিল চলে আসবে। সব তো শোনা হল, আর কেন। তবু দাঁড়িয়েই রইল, কৌতূহল এমন।

দেবাশীষ বলছেন, দেশ বড়, কিন্তু তার তো আলাদা কোন রূপ নেই। নিজেকে ঘিরে ছোট ছোট রক্তসম্পর্কিত যে পরিবার, দেশ ত তারই সমষ্টি। পরিবারকে ভাল না বাসলে দেশকে ভালবাসা যায়না বিভা। আমি তাই নিচে থেকে গড়ব। গোড়া থেকে শুরু করব।

গোড়া থেকে ? মা যেন চমকে উঠলেন।

হ্যাঁ গোড়া থেকে। দেরি হয়ে গেছে, হয়ত একটু বেশি দেরিই।

তবু সময় আছে। চারুর ওখানে গিয়েছিলাম। জামাইয়ের সঙ্গে খোলাখুলি অনেক আলোচনা হল। আপাতত ওখানেই বসবাস করব স্থির হয়েছে। চাকরি একটা মোটামুটি ঠিক করে এসেছি।

—একেবারে ঠিক ?

—বাসাও। থানার কোয়ার্টারের কাছে। জামাইই সব ঠিক করে দিয়েছে। শুভাশীষ ওখানকার স্কুলে পড়তে পারবে। হাই তুলে দেবাশীষ বললেন, সারা জীবন অনেক ত ছুটোছুটি করলাম। আর পারিনা। এবার একটু বিশ্রাম চাই। আশ্রয়। শান্তি। বিভা, তুমিও ত এই চেয়েছিলে।

আমি ? শুভাশীষ মার ঈষৎকম্প্র কণ্ঠ শুনতে পেল : বোধহয় এই চেয়েছিলাম।

তবে আমাকে একটা শেষ সুযোগ দাও, বাবা বললেন।

কোন কারণ নেই, তবু দরজার বাইরে চোখ দুটো জলে ভেসে গেল শুভাশীষের। অনেক কষ্টে, দাঁতে ঠোঁট গেঁথে, আত্মসংবরণ করল. আড়ষ্ট মুঠির মধ্যে সত্যাগ্রহ বুলেটিনটা মুচড়ে গেছে, যাক। শুভাশীষ জানে এ-কাগজ বাবাকে কোনদিন দেখান যাবেনা। প্রয়োজনও হবেনা।

সেদিন বিকেল থেকেই বাসা ভাঙার আয়োজন শুরু হয়ে গেল। তক্তপোষের তলা থেকে বেরুলো পুরনো তোরং, বিভার বিয়ের সময়কার। কাঠের সিন্দুকটা, ডালায় উঁই ধরে এসেছে, সেটা ধরে টানতেই মরচেপড়া কবজায় একটা ক্ষীণ আর্তনাদ উঠল। সামান্য ফাঁক পেতেই সারি সারি আরশোলা বেরিয়ে পড়ল, দু'একটা হেঁটে গেল পায়ের ওপর, দু'একটা শুভাশীষের হাতে ঠেকল। শুভাশীষের গায়ে কাঁটা দিল, চোখ বুঁজল, নাসারন্ধ্র বন্ধ করল বৃদ্ধা আর তর্জনী দিয়ে।

পঁচিশ বছরের পুরনো গন্ধে ঘর ভরে গেছে।

দেবাশীষ ধমক দিলেন, খোকা করছিস কী। ভাল করে তুলে ধর। ভেতরে কী-কী আছে দেখি!

কী আর থাকবে। পুরনো অপ্রয়োজনীয় কিছু বাসন. কাঁসাপেতলের ওপর সবুজ দাগ, অব্যবহারের। কিছু শ্বেতপাথরের বাসন, দাদু অনেক বছর আগে আগ্রা না মোরাদাবাদ থেকে কিনে এনেছিলেন। পূজোর সরঞ্জাম, পঞ্চপ্রদীপ, কোশাকুসি, তামার টাট, রক্তচন্দনের কাঠ।

আরো কী আছে ভাল করে দেখবার জন্যে দেবাশীষ ডালাটা ধরে টানলেন, আবার দাঁতে দাঁত ঘষা রুষ্ট আপত্তি উঠল। সিন্দুকটা রেহাই চাইছে। পঁচিশ বছর একাসনে থেকে এ-ঘরের মাটির সঙ্গে এক হয়ে গেছে, তলাটা পচে গলে মিশে গেছে কবে, এ-বাড়ির মানুষ কোনদিন তার খোঁজ নিতে আসেনি, বয়সের শিরা সর্বাঙ্গে ফুটে উঠেছে বল্মীকের রেখায় রেখায়। আজ যদি এ-বাড়ির মানুষের চলে যাবার সময় এসে থাকে, চলে যাক, কিন্তু ওকে নিয়ে যেন টানাটানি না করে। কটা দিন বা আয়ু আর, একটু একটু করে সারা শরীর ঝুর ঝুর করবে, মাটি আবার মাটি হবে। কিন্তু সে-কটা দিন একটু শান্তি চায় এই কাঠের সিন্দুকটা।

বিরক্তিসূচক একটা শব্দ উচ্চারণ করে দেবাশীষ বললেন, কিচ্ছু নেই।

পুরনো কৌটো, শিশি বোতল, সব চারু জড়ো করল একে একে। লেবেল উঠে গেছে, তবু বোঝা যায় কোনটা কিসের। একটা রবিনসন বার্লির টিন—চারুর যেবার খুব অসুখ করেছিল সেই বছরটাকে ফিরিয়ে নিয়ে এল। ছোট একটা কৌটো, জমানো দুধের, নিরঞ্জন কাকা একবার কলকাতা থেকে আসবার সময় এনেছিলেন। পাওয়া গেল সোডা ভাঙা চাবি, ডি, গুপ্তর খালি বোতল, গন্ধতেলের শিশি।

এটাতে কি ছিল? কাসুন্দি। এটা? কুলের আচার। এটা?

কোনটা দেবাশীষ মুছে আবার রেখে দিলেন, কোনটা ছুঁড়ে দিলেন। বাজে জিনিস যত।

একটা জীর্ণ খুঁটির গায়ে সিঁদুরের টানাটানা কয়েকটা রেখার দিকে শুভাশীষ চেয়ে রইল। এতদিন আলমারিটায় ঢাকা ছিল, সেটা সরিয়ে নিতে বেরিয়ে পড়েছে। শুভাশীষের মনে পড়লনা ওই রেখাগুলো ওখানে কে এঁকেছিল, কবে। ফিস ফিস করে জিজ্ঞাসা করল চারুকে।

চারু কপালের ঘাম মুছে বলল, তোর মনে নেই? ও-তো ছোটমাসিমার বিয়ের সময়কার বসুধারার চিহ্ন।

শুভাশীষ বলল, ও। মনে পড়েছে। সিদুঁরের কাঁপা কাঁপা দাগ তার চোখে আর নিষ্প্রভ রেখামাত্র নেই, লেলিহান শিখা হয়ে উঠেছে। তার আড়ালে শুভাশীষ একটি বিষণ্নসুন্দর আসন্নমৃত্যু মেয়ের মুখচ্ছবিও যেন দেখতে পেল: ছোট মাসিমা একটু একটু করে পুড়ছেন।

বড় তক্তপোষটায় টান পড়ল সবশেষে। পায়ার জোড়ে জোড়ে শব্দ হল, এতকাল ধরে গোপনে গোপনে মাকড়শা জাল বুনেছিল, সেই সূক্ষ্ম—অতি সূক্ষ্ম তন্তু জড়িয়ে গেল শুভাশীষের দু'হাতে। মুছে ফেলতে গেল শুভাশীষ, থমকে দাঁড়াল। মাকড়শার জাল তবু চোখে দেখা যায়, ছেঁড়াও যায় সহজে; কিন্তু অসংখ্য অদৃশ্য তন্তু দিয়ে তাকে বেঁধে রেখেছে এখানকার স্যাঁতসেঁতে মাটি, তাদের ছোঁয়া যায় না, ছেঁড়া যায় না, সেই নিষ্ঠুর জটিল জালে মন মাছির মত অসহায় বন্দী হয়ে আছে।

হাত কাটল কোথাকার কাচে। নিচু হয়ে কুড়োতে যেতেই জীর্ণ ফ্রেমে একটা ছবি উঠে এল। ঝাপসা হয়ে এসেছে মুখগুলো, তবু শুভাশীষ চিনতে পারল। ছোটমাসিমার বিয়ের পর তোলা গ্রুপ ফটো। এটাও নিরঞ্জনকাকা তুলেছিলেন।

তক্তপোষের নিচে, খুঁটিটার গোড়া ঘেঁষে, মাটি তুলেছে ইঁদুর; ঠিক পায়ের কাছেই একটা গর্ত হাঁ হয়ে আছে। চারু ডাকল, 'খোকা সরে আয়। ওর ভেতর কী আছে, ঠিক নেই।'

তবু শুভাশীষ, আচ্ছন্ন, অন্যমনস্ক, দাঁড়িয়ে রইল। আজ আর ভয়

নেই। যারা পায়ে হাঁটে আর যারা বুকে হাঁটে, এই দুই জীব এত কাল কাছাকাছি থেকেও অবিশ্বাস করেছে পরস্পরকে : ঘৃণা, ভয়। আজ যাবার প্রাক্কালে কোথা থেকে আশ্বাস পেয়েছে শুভাশীষ, মাটির নিচেকার প্রাণীর সঙ্গে ওপরের জীবের অলিখিত একটা সন্ধি হয়ে গেছে।

লক্ষ্মীর পটের ঝুল ঝেড়ে একটা পুঁটুলীতে বাঁধল চারু। দেবাশীষ বললেন, মিছিমিছি ওজন বাড়াচ্ছিস। আট-আনা দিলে অমন পট সব জায়গায় পাওয়া যাবে।

এই পট? লক্ষ্মীর আসল ছবি ঝাপসা হয়ে গেছে কবে, কিন্তু প্রতি-দিন যত্ন করে মা একটি করে সিঁদুর ফোঁটা পরিয়েছেন। অনিশ্চিত কণ্ঠে সংস্কৃত উচ্চারণ করেছেন, 'যথা ত্বং সুস্থিরা কৃষ্ণে, তথা ভব ময়ি স্থিরা।' সেই তিল তিল অর্চনায় তিলোত্তমা এই চপলাকে আর কোন হাটে আট আনায় কিনতে পাবে দেবাশীষ?

পরদিন সকালে বাজারে গিয়ে দেবাশীষ জনকয় খদ্দের জোগাড় করে আনল। তক্তপোষ দেখে তারা নাক সিঁটকাল। ইস একেবারে ঘুন-ঝরঝরে হয়ে গেছে।

আলমারির ডালার কবজায় মরচে। এটা বদলাতে হবে। টুলগুলোর পায়া ঢিলঢিলে, মেরামতে বিস্তর খরচ।

সর্বসাকুল্যে দাম স্থির হল ত্রিশ টাকা। দেবাশীষ খুঁৎ খুঁৎ করল, শেষ পর্যন্ত রাজী হল বত্রিশে।

ঠেলা গাড়ি বাইরেই ছিল। একে একে উঠাল সব,—তক্তপোষ, টেবিল, টুল, আলনা। ক্যানেস্তারা থেকে টুকরো টিনের কৌটো যত ছিল।

ওদের বিদায় করে দিয়ে দেবাশীষ ডাকল বিভাকে।

—তোমরাও তৈরি হয়ে নাও। কাল বিকেলের গাড়ি। আমি জামাইকে টেলিগ্রাম করে দিয়ে আসি। সে স্টেশনে গাড়ি রাখবে।

বিভা বললেন, আচ্ছা।

কিন্তু বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে হৃৎস্পন্দ দ্রুততর হল এই ছোট শহরটার। শুভাশীষকে কী কিনতে দেবাশীষ পাঠিয়েছিল বাজারে। হঠাৎ দেখল, ওর চোখের ওপর দোকানীরা ঝপাঝপ দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করছে। ফিস ফিস কথা, অন্তঃসলিলা উত্তেজনা।

কী হয়েছে, শুভাশীষ জিজ্ঞাসা করল একজনকে। সে জবাব দিলনা, ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিল গাছে লটকান একটা বিজ্ঞপ্তি।

শুভাশীষ এগিয়ে গিয়ে পড়ল।

সত্যাগ্রহ সংবাদ। বিশ্বস্তসূত্রে খবর পাওয়া গেছে, করাদী নামক গণ্ডগ্রামে মহাত্মাজী গ্রেপ্তার হয়েছেন।

আরো কী-কী লেখা ছিল। সব পড়বার সুযোগ হলনা, ছুটতে ছুটতে একজন এসে বলল, পালাও শীগগির। পুলিশ আসছে। জোর করে দোকান খোলা রাখবে। হরতাল পণ্ড করবে লাঠির ঘায়ে।

সেই মুহূর্তে সব ফিসফাস নিমেষে স্তব্ধ হয়ে গেল, প্রবল, প্রচণ্ড, সমবেত কণ্ঠে উচ্চারিত হল, বন্দেমাতরম্।

শাদা টুপি স্বেচ্ছাসেবকেরা মিছিল করে এগিয়ে আসছে। কিন্তু লালপাগড়িরাও এসে পড়ল যে।

মহাত্মা গান্ধিজিকি জয়।

—স্বাধীন ভারতকি—

জয়ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হতে হতে মিলিয়ে গেল।—তার আগেই লালপাগড়িরা হিংস্র বিকট, অন্ধ ঝাঁপ দিয়েছে শান্ত শুভ্র শিরস্ত্রাণের ঢেউয়ে। তারপর কিছুক্ষণ শুভাশীষের চোখের সমুখে সব কিছু কেমন ঝাপসা হয়ে গেল। একটু দূরেই দাঁড়িয়েছিল। ঠক ঠক লাঠির প্রতিধ্বনি শুনল দুটো ঠকঠক হাঁটুতে। চোখ বুঁজেও সে কাঁপুনি গেলনা।

সেকালে পুলিশের, অন্তত মফঃস্বল পুলিশের, গাড়ি ছিলনা। গ্রেপ্তার করে বন্দীদের হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হত। একদল গেল, তাদের মুখের বন্দেমাতরম্ ধ্বনি অনেক দূর থেকে ক্ষীণ, ক্ষীণতর হয়ে এল।

ততক্ষণে ছুটতে ছুটতে শুভাশীষ বাড়ী ফিরে এসেছে।

হলুদ-হাত আঁচলে মুছেছিলেন, সেই আঁচল দিয়ে মা তখন চোখ মুছছেন। বললেন, খোকা এতক্ষণে এলি তুই। শুনলাম বাজারের ওদিকে খুব গোলমাল শুরু হয়েছে—

—হ্যাঁ মা। মহাত্মা গান্ধী গ্রেপ্তার হয়েছেন। আজ হরতাল। সব শুদ্ধ কুড়ি-পঁচিশ জনকে ধরে নিয়ে গেল।

দেবাশীষের বুকের ব্যথা বেড়েছিল। তবু সে বাইরে এল। কী হয়েছে বললি, গান্ধিজী গ্রেপ্তার?

হ্যাঁ, বাবা।

ধ্বক করে জ্বলে উঠল দেবাশীষের চোখের মনি দু'টি। মুহূর্তমাত্র। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নিবে গেল। বলল, চলে এসে ভাল করেছিস। আজ অনেক গোলমাল হবে। তা ছাড়া বাঁধা-ছাঁদার কাজ পড়ে আছে। তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে লেগে পড়।

—আজ খাব না, বাবা।

বুকের যন্ত্রণায় এমনি বিকৃত দেবাশীষের মুখ; আরো যেন ছোট হয়ে গেল। —খাবিনা?

—না। পারবনা। আজ আমাকে খেতে বলবেন না আপনি।

চারু বলল, ঢং। দেবাশীষ বললেন, আচ্ছা বেশ। মার শান্ত কালো চোখ দুটি আরো দুর্বোধ্য, অতল হ'ল। কিছু বললেন না।

দুপুরের দিকে গোলমাল আরো বাড়ল। শোনা গেল বাজারে লাঠি চার্জ হয়েছে আরো দু'বার। দু'জন হাসপাতালে একজন মর-মর।

কাপড়ের একটা দোকান ভেঙে কারা বিলিতি কাপড়ের স্তূপে আগুন ধরিয়ে দিতে গিয়েছিল, পুলিশের দাপট সেখানেই বেশি।

স্কুলের ঘণ্টা বার বার বেজে বেজে ঘা খেয়ে খেয়ে মিলিয়ে গেল। কোন ছাত্র সেদিন ক্লাসে গেলনা।

গোলমাল হল কাচারি পাড়াতেই বেশি। সুরকি পথের ওপর শুয়ে পড়ে পিকেটিং করছিল মেয়েরা, আশ্চর্য, তার মধ্যে আজ সার্কেল অফিসারের স্ত্রী প্রীতিও ছিল। তাকে তো চেনেন না সরকারি উকিল প্রসন্ন মজুমদার। ডিঙিয়েই চলে গেছেন। শুধু তাই নয়, শাসক শ্রেণীর তরফ থেকে ওঁর সঙ্গে হাফসোল লাগানো ডার্বি জুতো দিয়ে একটা ঠোকরও দিয়ে যেতে ভোলেন নি।

খবর পেয়েই মেয়েরা বেরিয়ে এসেছে দলে দলে। ছেয়ে গেছে আদালতের বটতলা। সার্কেল অফিসার ছুটেছেন এস্‌ডিও-র বাংলোয়। না, স্ত্রীর অপমানের প্রতিকার চাইতে নয়। গলবস্ত্র হয়ে হুজুরকে বলতে গেছেন তাঁর স্ত্রীও যে এজিটেটরদের মধ্যে ছিল, এ-কথা ঘুণাক্ষরেও যেন সদরে না যায়।

হুজুরের সেদিকে কান নেই। তিনি সকাল থেকে সমানে তার পাঠাচ্ছেন সদরে। আরো পুলিশ চাই। সম্ভব হয় তো ফৌজ।

কেননা, লাঠি দিয়ে মাথা ফাটালেও বুকের জোর কমেনা স্বদেশি-ওয়ালাদের। সেই বুকে বিঁধতে পারে একমাত্র গুলি।

ফৌজ নয়, দুপুরের গাড়িতে সদর থেকে এল সার্জেণ্ট। চামড়া শাদা, এদের দৃষ্টি আরো ভাবলেশহীন নির্মম। কোমরবন্ধে আগ্নেয়াস্ত্র।

বুকের ব্যথায় সারা দুপুর বিছানায় ছটফট করল, দেবাশীষ। বলতে থাকল, তাই তো এমন জানলে—

তিনটের গাড়িতে এলের সরমাদি। সেও কম বিস্ময় নয়। এতদিন

কোথায় ছিলেন, সদরে, নাকি গ্রামে গ্রামে; পায়ে হেঁটে, নৌকোয়, গরুর গাড়িতে সমস্ত জেলাটা ঘুরেছেন। গড়ে তুলেছেন সত্যাগ্রহ। এ-জেলায় এবার একটাও তালগাছ কাটা হয়নি, সগর্বে বললেন।

—কিন্তু, জামাইবাবু, আপনি?

—আমি, আমি—দেবাশীষ একটু থতমত খেল, ঠিক ঠিক জবাব দিতে পারল না, বুকে হাত চেপে বিছানায় কাৎ হয়ে শুল।

জবাবের অপেক্ষাও করল না সরমা। একটা হাতপাখা টেনে নিয়ে বলল, ভালই হয়েছে, আপনাকে পাওয়া গেল। ভগবানই জুটিয়ে দেন। এখানকার আন্দোলনটাকে সংঘবদ্ধ করে তুলুন তো জামাইবাবু। লাঠির ঘায়ে, বুকের তলায় বিদ্রোহের ফণা যেন পিশে না যায়।

একটা কাশির দমক সামলে দেবাশীষ বলল, আমি, আমি কি পারব।

পারবেন।

বিভা পাশেই দাঁড়িয়ে, তবু সরমা সংকোচ করল না, দেবাশীষের শীর্ণ হাতখানায় আশ্বাসগাঢ় একটা চাপ দিয়ে বলল, পারবেন। আপনি পারবেন না, একি একটা কথা হল।

আস্তে আস্তে হাতখানা ছাড়িয়ে নিল দেবাশীষ, অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল, না, সরমা আমি আর পারবনা। আমি একেবারে ফুরিয়ে এসেছি, দেখতে পাওনা। শরীর জীর্ণ, বুকে কাশি, শিরদাঁড়ায় ব্যথা, সোজা হয়ে দাঁড়াতে পর্যন্ত পারিনা।

সে-তো আপনার শরীর। কিন্তু, মন?

দেবাশীষ ক্লান্ত হাসল।—মন আর শরীর কি আলাদা সরমা। এ-দুটোর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা শুধু স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের পুঁথির নয়। তা-ছাড়া, আমরা এখান থেকে চলেও যাচ্ছি।

এ কি সৈনিকের মত কথা হল, জামাইবাবু। আপনার চোখে একদিন আগুন জ্বলত। সে-আগুন কই।'

—নিবে গেছে। আগুন তো চোখে জ্বলে না। জ্বলে ভেতরে, মনে। চোখের জানালায় শুধু তার জ্যোতি দেখা যায়। ঘরের আলো নিবলে জানালা তো অন্ধকার হবেই সরমা।

যে নিয়ে দেবাশীষ আবার বলল, একটু আগে সৈনিকের কথা বলছিলে। কিন্তু সব সৈনিক তো দুর্গ অবধি পৌছয় না। অনেকে ঘায়েল হয়, পিছিয়ে পড়ে, পথে প্রান্তরে মরে পড়ে থাকে। আমাকেও তেমনি একজন মৃত সৈনিক মনে করে নাও। তারপর দুর্গজয় সারা হলে না-হয় ফিরে এসে একটা স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি করে দিও।

দুপুরের দিকে ছাত্র শোভাযাত্রার ওপর গুলি চলল। রেলওয়ে ইয়ার্ডে একটানা শান্টিঙের আওয়াজ, মালগাড়িতে গাড়িতে অবিশ্রাম ঠোকাঠুকি। কিন্তু সব ছাপিয়ে থেকে থেকে ভেসে এল গুরুগুরু ধ্বনি। থম থম স্তব্ধতা। শহরের বিদ্রোহী আত্মা রক্তে কাদায় লুণ্ঠিত।

সরমা হাত দুটি সংকল্পে মুঠিবদ্ধ করল। বলে উঠল, আমি যাই।

সারা দুপুর সেদিন পাড়ায় পাড়ায় ঘুরল সরমা। ঘর্মাক্ত শরীরে ফিরে এল বিকেলে। ক্ষোভে দাঁতে পীড়ন করল ঠোঁট। বলল, হলনা।

শহরে একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারী হয়েছে। যে বাসাতেই গেছে সরমা, দেখেছে দুয়ার বন্ধ। একটা চাপা ভয়, কালোডানা আতঙ্ক। নইলে মনে তেমনি আছে বিষশিষ ঘৃণা। কিন্তু সেব শিষকে শিখা করতে হবে। দুঃখকে স্পর্ধা।

সরমা বলল, মিছিল বের করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু একটিও ছেলে পেলাম না। মানুষ যে ক'টি ছিল, সব জেলে কিম্বা হাসপাতালে। বাকি সব ক'টি—আঙুল দিয়ে শুভাশীষকে দেখিয়ে সরমা বলল,—এর মত স্তন্যপায়ী জীব।

চকিতে একটা চকমকি জ্বলে উঠল বিভার চোখে, বেদনায় অপমানে শুভাশীষ কালো হয়ে গেল।

বিভা বললেন, মিছিল বের করে কি হবে। কিছু না। লাভ-লোকসানের হিসাবের খাতায় কিছুনা। শুধু সমবেত একটা প্রতিবাদ।

সরমা ক্ষোভের সঙ্গে বলল, ছেলেরা জখম হয়েছে, কিন্তু মেয়েদের যদি পেতাম। স্বদেশিযুগের জহর ব্রত তো এই।

বিভা বললেন, কিন্তু মেয়েরা কি পারবে।

পারবেনা? বিস্ময়ে বিস্ফারিত হল সরমার চোখ। নিজেদের শক্তি নিজেই জানেননা বিভাদি। শাস্ত্রের কল্পনাই দেখুন না। পুরুষেরা শিব-শব। মেয়েরা প্রাণ, প্রেরণা। পুরুষেরা শুয়ে পড়ুক মেয়েরা থামবেনা, এগিয়ে যাবে, ফের টেনে তুলবে পুরুষদেরই। আজ সার্কেল অফিসারের স্ত্রী প্রীতির ঘটনা শুনলাম। কিন্তু একটা ঘটনামাত্র নয়। এমন অনেক প্রীতি আছে প্রতি ঘরে। আজ ঘরে আছে, কাল বেরিয়ে পড়বে।

—তাদের ওপরেও তো গুলি চলবে? বিভা সন্দিগ্ধ প্রশ্ন করলেন।

—চলুক। রক্তগঙ্গা বয়ে যাক। মাটি নরম হবে। সেই কাদায় শাসনের চাকা বসে যাবে।

এতদিন পরে শুভাশীষের মনে হচ্ছে সরমাদির সেদিনকার কথার অনেকটাই ছিল উচ্ছ্বাস, কবিত্ব, কল্পনা। সেদিন কিন্তু তা মনে হয়নি। মার আঁচল ধরে দাঁড়িয়ে শুনছিল শুভাশীষ। ওর হাতের মুঠি কঠিন হয়ে উঠছিল।

একটু পরে বাইরে কয়েকটি মেয়ের গলার সাড়া পাওয়া গেল। উঁকি দিয়ে দেখে সরমা বলল, ওমা, রুচি যে।

শুধু রুচিদি নয়, সঙ্গে পাড়ার গুটিকয় খৃষ্টান মেয়েও আছে।

সরমাদি এগিয়ে এসে রুচিদির হাত ধরে বললেন, কী ভাই।

বলতে গিয়ে রুচিদির মুখ রক্তিম হয়ে উঠল, বললেন, আমরা আজকের মিছিলে যোগ দিতে চাই।

—তোমরা ?

—আমরা বড়দিনের উৎসবের মহলা দিচ্ছিলাম, শুনলাম আপনি আসবেন। গান থামিয়ে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছিলাম। কই, আপনি আমাদের ওখানে এলেন না তো।

সরমাদির কণ্ঠ আবেগে রুদ্ধ হয়ে গেছে। বাড়ি বাড়ি ঘুরে খালি হাতে ফিরেছে সে, তখন কি জানত উপেক্ষিত কোন পাড়ায় তার জন্যে অপ্রত্যাশিত মুষ্টি ভিক্ষা পূর্ণ হয়ে আছে।

রুচিদি বললেন, এই যে মেয়েটি, এর নাম উষা, এর নাম নীতা, এ সুহাস।

উষার দিদি হাসপাতালের নার্স। আজ দুপুরে দিদিকে খাবার পৌঁছে দিতে গিয়ে উষা হাসপাতালের দৃশ্য দেখে এসেছে। মুমূর্ষুর অন্তিমশ্বাস, আহতের কাতরোক্তি। উষা স্থির থাকতে পারেনি, দু'হাত মুখ ঢেকে ফিরে এসেছে। সব বলেছে রুচিকে। সঙ্গে সঙ্গে মহলা বন্ধ করেছে রুচি। বিলিতি সুর থাক। ফিরিঙ্গি জনসনের পিয়ানোয় স্বদেশি গৎ বাজুক।

সরমা বলল, কিন্তু মিছিল তো বেরুবে না ভাই।

—কেন ?

—একশো চুয়াল্লিশ জারী হয়েছে জানো ? আর একটি মেয়েও তো আসেনি।

—আমরা তো আছি।

সরমা এক মুহূর্ত চুপ করে কী ভাবল। বলল, বেশ। তোমাদের নিয়েই বেরুব আমি।

আর সময় নেই। বেলা পড়ে এসেছে। সেই স্তিমিত বিকেলটি এখনো শুভাশীষের স্মৃতির চূড়ায় সোনার টোপরটি হয়ে আছে। কেননা

মুহূর্তেই যার একটিমাত্র আচরণে তার জীবনের সবচেয়ে পবিত্র, সবচেয়ে দুর্বোধ্য বিস্ময়টি মুখে মনে কণ্ঠকিত হয়ে উঠেছিল।

আঁচলে কোমর জড়িয়ে নিলেন সরমাদি। মার দিকে চেয়ে বিষণ্ণ-হেসে বললেন, যাই বিভাদি। হয়ত আর শীগগির দেখা হবেনা। থেমে আবার বললেন, কে জানে, আজ কী হয়। হয়ত এ-জন্মে না।

দাঁড়াও।

এতক্ষণ একটা কথাও বলেনি বিভা। শুধু শুনছিলেন। সজল মেঘের অন্তর থেকে এতক্ষণে একটি গম্ভীর কণ্ঠ ধ্বনিত হয়ে উঠল। —দাঁড়াও।

শুভাশীষের হাত থেকে আঁচলটাকে ছাড়িয়ে নিলেন বিভা। সেই হাতখানা আস্তে আস্তে সরমার হাতে তুলে দিলেন।—শুভাশীষও তোমার সঙ্গে যাবে সরমা।

সমস্ত শরীর প্রথমে আড়ষ্ট হয়ে গেল শুভাশীষের, তারপর শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ বইতে শুরু করল। সরমার চোখে পলক পড়লনা।

—কিন্তু বিভাদি, আমরা তো আর নাও ফিরতে পারি।

নিস্তরঙ্গ কণ্ঠে বিভা বললেন, জানি।

দেবাশীষ তখনো চোখ বুঁজে শুয়েছিলেন। পায়ে নরম হাতের স্পর্শ পেতেই ধড়মড় করে উঠে বাস বললেন, একি।

আমি মিছিলে যাচ্ছি, মিটিং-এ যাচ্ছি বাবা।

মিছিলে যাচ্ছি, মিটিং-এ যাচ্ছি? কান দুটোকে যেন বিশ্বাস হলনা দেবাশীষের। চোখ দু'টো রগড়ে পরিষ্কার করে নিতে হল। তারপর সহসা দেবাশীষ বলে উঠলেন, না না। সেকি। সে কী করে হয়। তোর মা—

—আমি—আমি অনুমতি দিয়েছি। বিভা ধীর পায়ে ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন। তুমি আশীর্বাদ কর।